বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড্
১, শংকর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬
বিক্রয়কেন্দ্র
২১১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শাখা :
৪৪, জনস্টন গঞ্জ
এলাহাবাদ-৩
১০, চৌহাট্টা
পাটনা-৪

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে জানকীনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, প্রাইভেট লিমিটেড ১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কালিদাসের ভাষায় বলা যায়, আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মনে সংস্কৃত ব্যাকরণের নীরসতা ও কাঠিন্য যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, তাহাকে একবার মন হইতে অপসারিত করিয়া এই ভাষা ও সাহিত্যে প্রবেশ করিলে জ্ঞানের ও রসের বিশাল ভান্ডার ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয়। সংস্কৃতের প্রতি পৃথিবী-ব্যাপী শ্রদ্ধা ও আদরের ইহাই অন্যতম কারণ। সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাপকতা ও গভীরতায় মহাসমুদ্রেরই তুল্য। এই সাহিত্যসমুদ্রের উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার যতটুকু বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়াছি ততটুকুর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি ব্যতীত যে সংস্কৃত সাহিত্যে অগণিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা জনসাধারণের ধারণাতীত। এই সাহিত্যের কাল্পনিক ইহবিমুখতা ইহার প্রতি তাহাদের বীতস্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবকগণও যে ধরিত্রীর বক্ষে জীবন ধারণের উপযোগী জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করিতেন, তাহা সাধারণ্যে জ্ঞাপন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান জগতে যে জড়বিজ্ঞান মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ভোগবিলাসের নানা উপকরণ প্রস্তুতিতে সহায়তা করিতেছে তাহা বেশ কিছু পরিমাণে যে প্রাচীন ভারতেও বিদিত ছিল, এই গ্রন্থ তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। জড়বিজ্ঞান সেকালে ভারতে বিদিত ছিল—ইহাদ্বারা অবশ্য এই বুঝায় না যে, এই সকল বিজ্ঞান বর্তমান যুগের ন্যায় উন্নত ছিল। তবে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সেকালের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কোন দেশের সমকালীন বিজ্ঞানিগণ অপেক্ষা কম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং, পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার পর্যালোচনা অপরিহার্য। ভারতীয় বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। কোন কোন পণ্ডিত বিশেষ কোন বিজ্ঞানে ভারতের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ভারতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহার কিয়দংশ এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পশুপক্ষীর পালন প্রণালী বর্তমান যুগে একটি বিজ্ঞান। এই সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় যে

সকল গ্রন্থ আছে, উহাদের বিষয়বস্তুর একটি বিবরণ ইহাতে আছে। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের গ্রন্থ অতি বিস্তৃত ও পান্ডিত্যপূর্ণ। অল্প পরিসরে ভারতীয় সংগীতের একটি রূপরেখা এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। পত্র ও দলিল দস্তাবেজের লিখনপদ্ধতি সম্বন্ধেও যে রীতিমত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা একটি অধ্যায়ে করা হইয়াছে। বর্তমান যুগের নারী-প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে 'নারীর দান' অধ্যায়টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতীয় সমাজ নারীকে সর্বপ্রকার অধিকারে বঞ্চিত করে নাই অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে 'অধঃকৃত' হইলেও 'তনূনপাৎ'-এর শিখা চিরকালই ঊর্ধ্বগামী। সাহিত্যানুরাগ যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার গন্ডীতে সীমায়িত হয় না তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধ ও মুসলমানগণের অবদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে। ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্য যে সুদূর প্রাচ্য এমন কি প্রতীচ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং তত্তদ্দেশীয় সাহিত্যের উপর স্বীয় প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে 'বহির্ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব' শীর্ষক অধ্যায়ে।

উল্লিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে ব্যাকরণ ও নাট্যশাস্ত্র—এই দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা কেন করা হইল তাহার একটু কৈফিয়ৎ আবশ্যক। বেদাঙ্গ সমূহের মধ্যে ব্যাকরণ শীর্ষস্থানের অধিকারী। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যে কোন প্রকার আলোচনায় ব্যাকরণের সাহায্য পদে পদে আবশ্যক। তাহা ছাড়া, এই শাস্ত্রে ভারতীয় প্রতিভা পৃথিবীময় প্রশংসিত। নাট্যশাস্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। নাট্যগ্রন্থের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর আলোচনায়ই এই শাস্ত্র পর্যবসিত নহে; রঙ্গালয়, দর্শকমন্ডলী প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণনা এই শাস্ত্রের অন্তর্গত ও চিত্তাকর্ষক। এই সকল কারণে এই দুইটি বিষয়কেও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

দেবভাষায় লিপিবদ্ধ সমস্ত কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করিবার প্রবণতা এখন আর নাই। সর্ব বিষয়েই প্রকৃত তথ্য নিরূপণের প্রয়াস বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা দেশে বিদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকিলে যুগোপযোগী সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করা যায় না। সুতরাং, সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিষয়ে গবেষণাপদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া এই গ্রন্থ সমাপিত করা হইল।

ভারতের বিশাল জ্ঞানভান্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও ঈদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিসরে সম্ভবপর নহে। সুতরাং, গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে রসায়ন-

শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থের আলোচ্য শাস্ত্রাদিতে প্রযুক্ত যে সকল পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য অবশ্যজ্ঞাতব্য, 'শব্দকোষে' উহাদের সঙ্কলন করা হইয়াছে এবং সংক্ষেপে উহাদেব অর্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত সকল বিষয়েই গ্রন্থকারের অধিকার নাই। সুতরাং, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সাহায্য তাহাকে লইতে হইয়াছে। 'উদ্ভিদ্‌বিদ্যা' অংশে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক স্বর্গত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় মূল্যবান্ উপদেশ দান করিয়াছেন। 'সঙ্গীতশাস্ত্র' নামক অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রখ্যাত সঙ্গীততত্ত্ববিৎ শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন এবং সস্নেহ উপদেশ দান করিয়াছেন। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির বয়সে নবীন কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত শিবদাস চৌধুরী মহাশয় কতক গ্রন্থের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থরচনার পথ অনেক পরিমাণে সুগম করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় লেখককে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই লেখকের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। দার্জিলিং গভর্ণমেন্ট কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত ভূদেব চৌধুরী প্রকাশকের সঙ্গে গ্রন্থকারের সংযোগ ঘটাইয়াছেন। এইজন্য তিনি গ্রন্থকারের ধন্যবাদার্হ। বুক্‌ল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রীযুত জানকী বসু বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি সহৃদয় পাঠক লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে লেখক উপকৃত হইবে। এই গ্রন্থ পাঠে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি পাঠকের মনে কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলেও লেখক স্বীয় শ্রম সার্থক মনে করিবে।

দার্জিলিং,
পৌষ-সংক্রান্তি,
১৩৬৬।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ব্যাকরণ

বর্তমানে 'ব্যাকরণ' নামটি শুনিলেই বিদ্যার্থিগণ ভয়াতুর হইয়া পড়ে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তথাকথিত ব্যাকরণ-বিভীষিকার জন্য তাঁহারাও এই ভাষা শিক্ষায় নিরস্ত হইয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতে এমন সময় ছিল যখন ব্যাকরণ বিদ্যাভ্যাসের প্রথম সোপানস্বরূপ বিবেচিত হইত। ইহা শুধু একটি বেদাঙ্গই নহে, ইহাই প্রধান বেদাঙ্গ১। আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদকে উত্তমরূপে বুঝিবার জন্যই এই শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'মহাভাষ্য'কার পতঞ্জলি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন সংক্ষেপে অনবদ্যভাবে বলিয়াছেন—রক্ষোহাগম-লঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্। তাঁহার মতে ব্যাকরণের প্রয়োজন পঞ্চবিধ—(১) রক্ষা—বেদের রক্ষা; অর্থাৎ স্বর ও বর্ণ প্রভৃতির সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা বেদের মূল শব্দরাশির রক্ষা,

(২) ঊহ—প্রয়োজন অনুসারে বেদমন্ত্রের লিঙ্গ ও বিভক্তির পরিবর্তন,

(৩) আগম—ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ,

(৪) লঘু—অল্পায়াসে শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ,

(৫) অসন্দেহ—সন্দেহনিরসন।২

আদিতে বেদের অঙ্গ স্বরূপে৩ গণ্য হইলেও পরবর্তী কালে এই শাস্ত্র সর্বশাস্ত্রেরই সোপান স্বরূপ পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ, ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে দর্শন, অলঙ্কার, স্মৃতি প্রভৃতি কোন শাস্ত্রেই প্রবেশাধিকার

১। ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
পাণিনীয় শিক্ষা।

২. যেমন, 'স্থূলপৃষতী' শব্দটি তৎপুরুষ সমাস (স্থূলা চাসৌ পৃষতী চেতি) বা বহুব্রীহি সমাস (স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ) হইতে পারে। স্বরের দ্বারা সমাস নির্ধারণ করিতে হইবে; কিন্তু ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না হইলে স্বরজ্ঞান হয় না।

৩. এখানে বলা প্রয়োজন যে, পণ্ডিতগণ পাণিনির ব্যাকরণকেই বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন, অন্য কোন ব্যাকরণকে নহে। বেদাঙ্গ সমূহের প্রসঙ্গে ভাট্টদীপিকার প্রভাবলীতে বলা হইয়াছে—
ব্যাকরণমষ্টাধ্যায়াত্মকং......পাণিনিনা প্রণীতম্।
কৌমারাদি ব্যাকরণানি ন বৈদাঙ্গং লৌকিকপদমাত্র
সাধুত্বব্যাখ্যানপরত্বাৎ। (পৃঃ ৪৪, নির্ণয়সাগর প্রেস্ সং)

জন্মে না। প্রসিদ্ধ আলংকারিক আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্।

এই শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল খৃষ্ট যুগেরও বহুকাল পূর্বে। ঋগ্-বেদের কোন কোন মন্ত্রেই ভাষা সম্বন্ধে আর্যগণের চিন্তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাং আ বিবেশ॥
৪/৫৮/৩

পতঞ্জলি ইহাকে ব্যাকরণের পক্ষে প্রযোজ্য বলিয়া ধরিয়াছেন। চারিটি শৃঙ্গ অর্থ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার শব্দ। তিনটি পদ অর্থ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল। দুইটি 'শীর্ষ' (মস্তক) বুঝাইতেছে নিত্য ও কার্য নামে দ্বিবিধ শব্দকে। সপ্ত হস্ত সাতটি বিভক্তিরই সূচক। শেষ দুই চরণের অর্থ এই যে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠে ও মস্তকে আবদ্ধ শব্দস্বরূপ মহান্ দেব মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। মীমাংসকগণের মতে এই মন্ত্রের ঈদৃশ অর্থ পতঞ্জলির স্বকপোল-কল্পিত।

যাহা হউক, প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজনে উদ্ভূত 'ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ-সমূহে শিক্ষা (phonetics) এবং ব্যাকরণের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগুলির রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। তবে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি প্রাক্-বুদ্ধ যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

ঋক্‌সংহিতাব পদপাঠে ব্যাকরণের নানা বিষয়ের সহিত রচয়িতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পরিস্ফুট। ইহাতে সন্ধি, স্বরপ্রক্রিয়া, সমাস, উপসর্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে পদপাঠ-প্রণেতার জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। পদপাঠ শাকল্যের রচিত বলিয়া মনে করা হয়। পাণিনি তাঁহার 'অষ্টাধ্যায়ী'তে সম্ভবতঃ এই শাকল্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শাকল্যের আবির্ভাবকাল অনির্ণেয়।

'প্রাতিশাখ্য' নামক গ্রন্থগুলিতে ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বর্তমানে প্রাপ্ত 'প্রাতিশাখ্য'গুলি পাণিনি-যুগের পরবর্তী; পাণিনির পূর্বেও ঈদৃশ গ্রন্থ নিশ্চয়ই ছিল, যদিও তাহাদের নাম ও রচনাকাল অজ্ঞাত।[১]

যাস্কের 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থ প্রধানতঃ কোষজাতীয় গ্রন্থ হইলেও ব্যাকরণ-সংক্রান্ত অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। যাস্ক পাণিনি-

১. দ্রঃ S. K. Belvalkar : *Systems of Sanskrit Grammar*, পৃঃ ৫।

পূর্ব যুগের লেখক, সন্দেহ নাই; কিন্তু, কত পূর্বের তাহা অনির্ণেয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইঁহার কাল খৃঃ পূঃ ৯ম হইতে ৮ম শতকের মধ্যে।১

যাস্ক এবং পাণিনির মধ্যবর্তী কালে রচিত কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু, পাণিনির পূর্বেও যে বহু প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 'অষ্টাধ্যায়ী'তেই রহিয়াছে। পাণিনি প্রায় চৌষট্টিজন পূর্বাচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান শাকটায়ন, ভারদ্বাজ, স্ফোটায়ন, শাকল্য, আপিশলি, গার্গ্য, গালব, সেনক, কাশ্যপ, চক্রবর্মণ প্রভৃতি। পণ্ডিতসমাজে পরম্পরাগত কতক শ্লোকে২ মাহেশ বা মাহেশ্বর নামক একটি ব্যাকরণের উল্লেখ আছে; কিন্তু এই নামের কোন ব্যাকরণ বা তাহার টীকাটিপ্পনী কিছুই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যাকরণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ধারণা ভ্রান্ত। আবার, কাহারও কাহারও মতে, ইহা যে একসময়ে ছিল তাহা সুনিশ্চিত। পাণিনি চতুর্দশটি মাহেশ্বর সূত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। "জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ" এই উক্তি হইতে মনে হয়, আদিব্যাকরণকে মহেশ, মহেশ্বর বা শঙ্করের নামের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ মাহেশ নামে কোন ব্যাকরণ ছিল না। পাণিনি অনেক পূর্বাচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, মহেশ নামে কাহারও উল্লেখ করেন নাই। 'কথাসরিৎসাগর'এ কথিত আছে যে, ব্যাকরণে পাণিনি সম্প্রদায় ঐন্দ্রসম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজকও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ বলিয়াছেন যে, 'কলাপব্যাকরণ' 'ঐন্দ্রব্যাকরণে'র অনুগামী। ভাগুরি, কাশকৃৎস্ন ও ব্যাড়ি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণকে পাণিনির পূর্ববর্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পাণিনি ও তাঁহার সম্প্রদায়

ব্যাকরণগগনে পাণিনি প্রদীপ্ত ভাস্কর। অসংখ্য বৈয়াকরণ-তারকা তাঁহার প্রখর যশকিরণে ম্লান হইয়া গিয়াছে; কালের নিকষ-পাষাণে পাণিনি-রত্ন যে অনপনেয় রেখা অঙ্কিত করিয়াছে, যুগযুগান্তরের ব্যবধানও

১. ঐ, পৃঃ ৭।

২. যথা—

(১) সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে
তদর্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে
কুশাগ্রবিন্দুং পতিতং হি পাণিনৌ॥

(২) যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিংপদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥

তাঁহাকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই। পাণিনির অদ্ভুত গ্রন্থ ভারতীয় প্রতিভার মূক সাক্ষী। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত অপর একখানি ব্যাকরণ আজও পাওয়া যায় নাই। পাণিনির কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের পরবর্তী কালের লেখক নহেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহারা একমত। 'মহাভাষ্য'কার পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' বলিয়াছেন, পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী। পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে শালাতুর নামক স্থানে তাঁহার পূর্বপুরুষের বাস ছিল বলিয়া তাঁহাকে 'শালাতুরীয়' বলা হইয়াছে। 'পঞ্চতন্ত্রে'র সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, পাণিনি সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

'অষ্টাধ্যায়ী' আটটি অধ্যায়ে লিখিত। প্রত্যেক অধ্যায় চারিটি পাদে (section) বিভক্ত—মোট সূত্রসংখ্যা প্রায় চারি সহস্র। এই ব্যাকরণটির উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কারক, সমাসাদি প্রকরণ ভাগ নাই। কতকগুলি সংজ্ঞা, প্রত্যাহার ও পারিভাষিক সঙ্কেতের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত১ সূত্রে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সাহায্যে অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্ প্রভৃতি ১৪টি 'মাহেশ্বরসূত্র' গ্রন্থারম্ভে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ সমষ্টির নানারূপ পবিবৃত্তি এবং সংযোগের (permutation and combination) সাহায্যে অচ্, হল্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যাহার প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইগুলির সাহায্যে সূত্রগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হইযাছে। পাণিনি কর্তৃক অবলম্বিত অপব একটি প্রণালীও সূত্র-সংক্ষেপের সহায়তা কবিয়াছে। ইহা 'অধিকার-সূত্র'। কোন একটি বিষযে একটি অধিকারসূত্র (leading rule) রচনা করিযা পাণিনি তাহার পবে ক্রমে অনেক সূত্র রচনা করিয়াছেন; এই সূত্রগুলিতে পূর্বসূত্রের অনুবৃত্তি রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে অধিকার-সূত্রেব অনুবৃত্তি পববর্তী কয়েকটি সূত্রকে অতিক্রম করিয়া তৎপববর্তী সূত্রে প্রযোজ্য হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যাপারেব নাম 'মণ্ডূকপ্লুতি' অর্থাৎ ভেক-লম্ফ।২ পাণিনির ব্যাকরণের অপর দুইটি কৌশল উল্লেখযোগ্য। "বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্" এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, যদি দুইটি সূত্র পরস্পরবিরোধী হয়, তাহা হইলে পববর্তী সূত্রটি বলবৎ হইবে। "পূর্বত্রাসিদ্ধম্" সূত্রদ্বাবা পাণিনি

১. দুই বর্ণ বিশিষ্ট সূত্রই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, যথা—অ অ ৮/৪/৬৮। বৃহদাকাব সূত্রও যে নাই তাহা নহে। 'অচুব বিচতুব' প্রভৃতি সূত্রটিতে (৫/৪/৭৭) শব্দসংখ্যা পঁচিশ।

২. নিম্নলিখিত শ্লোকে চারিপ্রকাব অধিকাবের উল্লেখ আছে—

গোযূথঃ সিংহদৃষ্টিশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিবেব চ।
গঙ্গাস্রোতঃ প্রবাহশ্চ অধিকারশ্চতুর্বিধঃ॥

বুঝাইতে চাহেন যে, প্রথম সাত অধ্যায় ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদের পক্ষে অবশিষ্ট তিন পাদের সূত্রসমূহ অসিদ্ধ[১]; এই তিন পাদের মধ্যেও পূর্ব পূর্ব সূত্রের প্রতি পর পর সূত্র অসিদ্ধ।

'অষ্টাধ্যায়ী'কে ত্রিমুনিব্যাকরণ[২] বলা হয়। পাণিনি সূত্রগুলির রচয়িতা। তাঁহার পরে কাত্যায়ন কতকগুলি অতিরিক্ত সূত্র রচনা করেন; এই-গুলির নাম 'বার্তিক'। তৎকালে সংস্কৃত ছিল কথ্যভাষা এবং ক্রমোন্নতিশীল। এই জীবন্ত গতিশীল ভাষার প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ অতিরিক্ত সূত্রগুলির প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল[৩]। ইঁহাদের পরে আবির্ভাব হইল পতঞ্জলির। তিনি 'অষ্টাধ্যায়ী'র যে ভাষ্য রচনা করিলেন, তাহারই নাম হইল 'মহাভাষ্য'; ইহাতে পতঞ্জলি যে শুধু সূত্রগুলির ব্যাখ্যাই করিলেন তাহা নহে, অনেক-গুলি বার্তিকের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি যুক্তিবলে অস্বীকার করিলেন এবং সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রতিযুক্তির সাহায্যে 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিবার জন্য যোগ-বিভাগ প্রভৃতি কৌশলের অবতারণা করিলেন। এই পতঞ্জলি যোগসূত্রকার পতঞ্জলি হইতে অভিন্ন কিনা সেই সম্বন্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলির জন্যই এই গ্রন্থকে বলা হয় ত্রিমুনিব্যাকরণ। কাত্যায়ন স্থলে মতান্তরে বররুচির নামও পাওয়া যায়[৪]। গোণিকাপুত্র ও গোনর্দীয়—পতঞ্জলির এই দুইটি নামান্তরও দেখা যায়। সাধারণতঃ কাত্যায়নকে খৃঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতকের এবং পতঞ্জলিকে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের লোক বলিয়া মনে করা হয়।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'কে অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(ক) 'অষ্টাধ্যায়ী'র টীকা,
(খ) উক্ত টীকার টীকা,
(গ) টীকার টীকার টীকা,
(ঘ) 'অষ্টাধ্যায়ী'-অবলম্বনে রচিত ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ,
(ঙ) সংক্ষিপ্তসার।

১. সপাদসপ্তাধ্যায়ীং প্রতি ত্রিপাদী অসিদ্ধা,
ত্রিপাদ্যামপি পূর্বং প্রতি পরং শাস্ত্রমসিদ্ধংস্যাৎ।

২. প্রাচীনকালে শকটি-শাকটায়ন কৃত গ্রন্থকে এই নামে অভিহিত করা হইত। (দ্রঃ—গুরুপদ হালদার—ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭)।

৩. "উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তিকারি তু বার্তিকম্"—পাণিনি কর্তৃক যাহা উক্ত, অনুক্ত বা দুরুক্ত, বার্তিক তাহাকে সম্যক্ ব্যক্ত করে।

৪. বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্।
পাণিনিং সূত্রকারং চ প্রণতোঽস্মি মুনিত্রয়ম্ ॥
কাহারও কাহারও মতে, কাত্যায়নেরই নামান্তর বররুচি।

(ক) অষ্টাধ্যায়ীর টীকা

টীকাসমূহের মধ্যে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা সুবিদিত। ইহা 'অষ্টাধ্যায়ী'রই ন্যায় আটটি অধ্যায়ে এবং প্রতি অধ্যায় চারিটি পাদে বিভক্ত, কিন্তু প্রতিটি পাদ কতকগুলি 'আহ্নিক'এ বিভক্ত।

'কাশিকা' 'অষ্টাধ্যায়ী'র অপর একখানি বিখ্যাত টীকা। ইহাতে 'অষ্টাধ্যায়ী'র ক্রমানুসারে প্রতিটি সূত্রের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ আছে। ইহাতে ব্যাখ্যা অতি সরল অথচ সংক্ষিপ্ত।

সাধারণতঃ 'কাশিকা'কে বামন-জয়াদিত্যের রচনা বলিয়া মনে করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন, বামন ও জয়াদিত্য এক ব্যক্তিরই নামের দুইটি অংশমাত্র, কাহারও মতে, ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। চৈনিক পরিব্রজক ইৎসিং-এর সাক্ষ্য যদি গ্রহণীয় হয, তাহা হইলে 'বৃত্তি-সূত্র' (=কাশিকা) কাশ্মীরের জয়াদিত্য রচিত এবং ইঁহার কাল খৃঃ সপ্তম শতক। মাঘের 'শিশুপাল-বধ'এর দ্বিতীয় সর্গের ১১২ শ্লোকে 'অনুৎসূত্রপদন্যাসা' প্রভৃতিতে যদি 'কাশিকা'র টীকা 'ন্যাস'এর উল্লেখ কবির অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'কাশিকা'কার নিশ্চয়ই আঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বেকার লোক, কারণ, ন্যাস-রচয়িতা জিনেন্দ্রবুদ্ধি আঃ খৃঃ অষ্টম শতকের লেখক[১]।

'ভাষাবৃত্তি' বা 'লঘুবৃত্তি' নামক 'অষ্টাধ্যায়ী'র টীকাটি প্রাঞ্জল অথচ সংক্ষিপ্ত। ইহাতে বৈদিক সূত্র ভিন্ন অপর সমস্ত সূত্রেরই ব্যাখ্যা আছে। ইহার রচয়িতা পুরুষোত্তম। 'ভাষাবৃত্তি'র টীকাকার সৃষ্টিধরের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষোত্তম বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সমকালীন। সুতরাং, পুরুষোত্তমের জীবনকাল খৃঃ দ্বাদশ শতকে কোন সময়ে হইয়া থাকিবে। টীকার প্রারম্ভিক শ্লোকে বুদ্ধের প্রতি অভিবাদন, কতক উদাহরণে বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ, বৈদিক অংশের সূত্রসমূহের ব্যাখ্যার অভাব প্রভৃতি হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, পুরুষোত্তম বৌদ্ধ ছিলেন। 'ভাষাবৃত্তি'তে 'অষ্টাধ্যায়ী'র ৬/২/১১০ সূত্রের ব্যাখ্যায় পদ্মাবতী (=আধুনিক কালের পদ্মা) নদীর উল্লেখ, বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'এর পার্থক্যের প্রতি লেখকের ঔদাসীন্য প্রভৃতি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পুরুষোত্তম বাঙ্গালী ছিলেন।

ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় টীকা। ইহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, ভট্টোজিই সর্বপ্রথম 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রসমূহকে কারক, সমাসাদি প্রকরণে বিভক্ত করিয়া এই দুরূহ ব্যাকরণে সাধারণের প্রবেশলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

ভট্টোজির পিতার নাম লক্ষ্মীধর এবং তাঁহার গুরু ছিলেন শেষকৃষ্ণ। ভট্টোজির জীবনকাল খৃঃ সপ্তদশ শতকে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

---

১. দ্রঃ A. B. Keith. *A Hist of Skt. Lit.*, পৃঃ ১২৪।

ভর্তৃহরি 'অষ্টাধ্যায়ী'র যে বৃত্তি প্রণয়ন করেন তাহার নাম 'ভাগবৃত্তি'। উক্ত প্রখ্যাত টীকাগুলি ছাড়াও ভট্টোজির 'শব্দকৌস্তুভ', অন্নম্‌ভট্টের "মিতাক্ষরা' এবং অতি আধুনিক কালে দেবেন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত 'প্রভা' প্রভৃতি টীকাও আছে। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত শরণদেব রচিত 'দুর্ঘটবৃত্তি'তে সন্দিগ্ধ প্রয়োগের শুদ্ধি বিচার ও স্থানে স্থানে কিছু কিছু সূত্রব্যাখ্যাও আছে।

(খ) উক্ত টীকার টীকা

এই জাতীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইযাছিল। এইগুলিব মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়টিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে ভর্তৃহরি 'মহাভাষ্যদীপিকা' নামক মহাভাষ্য-ব্যাখ্যা ও ভাষ্যতাৎপর্য অবলম্বনে 'বাক্যপদীয়' রচনা করেন।

কৈয়ট-রচিত 'প্রদীপ' মহাভাষ্যের প্রসিদ্ধ টীকা। প্রদীপকার সম্ভবতঃ খৃঃ একাদশ শতকের লেখক।

'কাশিকার দুইটি টীকা আছে—(১) জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'কাশিকাবিবরণ-পঞ্জিকা' বা 'ন্যাস' ও (২) হরদত্তের 'পদমঞ্জরী'। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত লেখকদ্বয়ের কাল যথাক্রমে খৃঃ অষ্টম ও দ্বাদশ শতক।

'ভাষাবৃত্তি'র টীকা 'ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি'; ইহা সৃষ্টিধর-রচিত।

'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র টীকাগুলি নিম্নলিখিতরূপঃ—

(১) জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্ববোধিনী',

(২) জয়কৃষ্ণের 'সুবোধিনী' (শুধু স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক প্রকরণ),

(৩) নাগেশের[১] 'শব্দেন্দুশেখর',

(৪) ভট্টোজি-কৃত 'বালমনোরমা' ও 'প্রৌঢ়মনোরমা'।

এইগুলি ছাড়াও 'সিদ্ধান্তরত্নাকর' ও 'সিদ্ধান্তকৌমুদীবিলাস' নামে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র অপর দুইটি অপ্রসিদ্ধ টীকাও আছে।

'শব্দকৌস্তুভে'র টীকা দুইটি—

(১) নাগেশের 'বিষমা' ও (২) বৈদ্যনাথ বা বালম্ভট্ট পায়গুণ্ডের 'প্রভা'।

(গ) টীকার টীকার টীকা

'প্রদীপে'র টীকা 'প্রদীপোদ্দ্যোত', বা 'উদ্দ্যোত'; ইহা নাগেশ-রচিত। ঈশ্বরানন্দ-রচিত 'ভাষ্যপ্রদীপবিবরণ' নামে প্রদীপের অপর একখানি টীকাও আছে।

প্রৌঢ়মনোরমার টীকা দুইটি—

(১) জগন্নাথের 'মনোরমাকুচমর্দিনী' ও (২) হরিদীক্ষিতের 'শব্দরত্ন'।

১. ইঁহাকে কোন কোন পরবর্তী লেখক 'নাগোজিভট্ট' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

'শব্দেন্দুশেখরে'র টীকা অনেকগুলি ঃ—

(১) 'চিদস্থিমালা' (বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে),
(২) 'চন্দ্রকলা' বা 'ভৈরবী' (ভৈরব মিশ্র),
(৩) 'বিষমী' (রাঘবেন্দ্র গুরু),
(৪) 'অভিনবচন্দ্রিকা' (বিশ্বনাথ দণ্ডিভট্ট),
(৫) 'জ্যোৎস্না' (উদয়ঙ্কর পাঠক),
(৬) 'বিজয়া' (শিবনারায়ণ),
(৭) 'জটাজুট' (বালশাস্ত্রী),
(৮) 'বরবর্ণিনী' (গুরুপ্রসাদ),
(৯) 'তিলক' বা 'ভট্টি' (সদাশিব),
(১০) 'শঙ্করী',
(১১) 'শ্রীধরী',
(১২) 'নাগেশোক্তিপ্রকাশিকা'।

(ঘ) অষ্টাধ্যায়ী-অবলম্বনে ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ

বিমল সরস্বতীর (খৃঃ চতুর্দশ শতক) 'রূপমালা' এইজাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রসমূহকে সর্বপ্রথমে প্রকরণে বিভক্ত করা হয়। 'প্রৌঢ়মনোরমা'য় ভট্টোজি এই গ্রন্থের প্রতি নিজের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

মাধবাচার্যের (খৃঃ ১৪শ শতক) 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি' 'অষ্টাধ্যায়ী'-অবলম্বনে রচিত।

রামচন্দ্রের 'প্রক্রিয়া-কৌমুদী' (খৃঃ পঞ্চদশ শতক) এই শ্রেণীর অপর একটি সুবিদিত গ্রন্থ। ইহাকেই 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র আদর্শ বলিয়া মনে করা হয়। ইহার উপরে রচিত বহু টীকা হইতে মনে হয়, ইহা একসময়ে বহু-অধীত গ্রন্থ ছিল। ইহার টীকাগুলির মধ্যে প্রধান বিট্ঠলাচার্যের 'প্রসাদ' (খৃঃ ষোড়শ শতক) ও শেষকৃষ্ণের 'প্রক্রিয়াপ্রকাশ' (খৃঃ সপ্তদশ শতক)।

(ঙ) সংক্ষিপ্তসার

এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র সংক্ষিপ্তরূপ বরদরাজ-রচিত 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী', 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' ও 'সারসিদ্ধান্তকৌমুদী'। পাণিনির ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলি যাহাতে সহজে সাধারণ পাঠকের আয়ত্ত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে প্রধান 'রূপাবলী' ও 'সমাসচক্র'।

চান্দ্র সম্প্রদায়

চন্দ্রগোমী নামক এক বৈয়াকরণ 'চান্দ্রব্যাকরণ' রচনা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতগণের মতে, ইনি খৃঃ পঞ্চম শতকের লেখক ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। জার্মাণ পণ্ডিত লিবিশ (Liebich) বহু শ্রম স্বীকার করিয়া 'চান্দ্রব্যাকরণ'টিকে বিলুপ্তির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যাকরণ পাঠে মনে হয়, ইহার রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল পাণিনির ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করা। চন্দ্রগোমী পাণিনির স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক প্রকরণ বর্জন করিয়াছেন, একটি প্রত্যাহার কমাইয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, পাণিনির সূত্রে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। চন্দ্রগোমীর স্বরচিত সূত্রসংখ্যা চল্লিশেরও কম। তাঁহার মোট সূত্রসংখ্যা ৩১০০; পাণিনির সূত্রসংখ্যা প্রায় ৪০০০। 'চান্দ্রব্যাকবণ' ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, প্রতি অধ্যায়ে চারিটি পদ বা section আছে। এই ব্যাকরণকে 'অসংজ্ঞক' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে সম্ভবতঃ দুইটি কারণে—(১) ইহাতে পৃথক্‌ভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই, (২) পাণিনি যে সব সূত্রে 'সংজ্ঞা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই সংজ্ঞার পরিবর্তে গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন 'নাম' শব্দটি।

এই ব্যাকরণেব 'বৃত্তি' চন্দ্রগোমী স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু টীকাটিপ্পনীও ইহার উপবে রচিত হইয়াছিল। তিব্বতী ভাষায় ইহাব অনুবাদ হইয়াছিল এবং সুদূব সিংহলেও এই ব্যাকরণের পঠনপাঠন একসময়ে প্রচলিত ছিল। ভারতে, কাশ্মীরে ও নেপালে ইহার পঠনপাঠন ব্যাপকভাবে হইত।

বহুলপ্রচারিত এই ব্যাকরণটির পঠন পাঠন পববর্তী যুগে ভারতে লুপ্ত হইয়া গেল কেন ? সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওযার জন্যই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী লেখকের রচনাটিকেও লোকে ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়াছিল। ইহার জনপ্রিয় না হওয়াব অপর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, ইহাতে রচয়িতার তেমন কোন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সিংহলে কিন্তু 'চান্দ্র-ব্যাকরণ' অতি ব্যাপকভাবে পঠিত হইত এবং আঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সিংহলীয় কাশ্যপ 'বালাববোধ' নামে 'চান্দ্রব্যাকরণে'র একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন; ইহা অনেক পরিমাণে বরদরাজের 'লঘুসিদ্ধান্ত-কৌমুদী'র ন্যায়।

কাতন্ত্র সম্প্রদায়

দীর্ঘকাল হইতেই বাংলাদেশে 'কাতন্ত্র ব্যাকরণ'এর পঠনপাঠন প্রচলিত আছে। কালক্রমে, এই দেশে পাণিনির ব্যাকরণের আলোচনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাণিনির সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটে; কিন্তু, চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত পাঠশালা-গুলিতে ব্যাকরণ বলিতে 'কাতন্ত্রব্যাকরণ'ই সাধারণতঃ লোকে বুঝিয়া থাকে।

খৃঃ ১৫-১৬শ শতকে এই দেশে 'কাতন্ত্রে'র বহু পরিশিষ্ট এবং টীকা রচিত হইয়াছিল। এই লেখকগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ—(১) কবিরাজ, (২) কুলচন্দ্র, (৩) শ্রীপতি ও (৪) ত্রিলোচন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে যাঁহারা 'কাতন্ত্র' অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা অধিকাংশ বৈদ্যকুলজাত।

কাশ্মীরেও এই ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বহু শতাব্দী যাবৎ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বর্তমানে কাশ্মীরের জনপ্রিয় ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি 'কাতন্ত্র' অবলম্বনে রচিত।

এখন প্রশ্ন এই—'অষ্টাধ্যায়ী'র ন্যায় গ্রন্থের পরিবর্তে এই গ্রন্থের প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইল কেন? 'কাতন্ত্রে'র রচনা-প্রণালী ও অন্যান্য নানা-কারণে মনে হয় যে, অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে জ্ঞানপিপাসু জনসাধারণকে ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্যই এই গ্রন্থের প্রণয়ন করা হইয়াছিল। 'কাতন্ত্র' শব্দটির অর্থ 'ঈষৎতন্ত্র' বা ক্ষুদ্র গ্রন্থ। একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, অল্পবুদ্ধি, শাস্ত্রান্তরপাঠে নিরত, আলস্যপরায়ণ ও কৃষিবাণিজ্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের 'ক্ষিপ্রং প্রবোধার্থম্' 'কাতন্ত্রে'র রচনা হইয়াছিল[১]। এই ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের রাজা সাতবাহন কোন সময়ে তাঁহার রাণীর সঙ্গে জলকেলি করিতেছিলেন। তখন রাণী বলিয়াছিলেন, 'মোদকং[২] দেহি রাজন্'—হে রাজন্, জল দিও না। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ রাজা 'মোদক' শব্দের ঈপ্সিত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া রাণীকে কতক মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন। ইহাতে তিনি রাণীর উপহাসাস্পদ হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিলেন। তখন তিনি রাজ্যস্থিত সমস্ত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারিবেন। সর্ববর্মা নামক পণ্ডিত নাকি ছয় মাসের মধ্যেই রাজাকে ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ববর্মা কার্তিকেয় বা কুমারের অনুগ্রহে তাঁহার বাহন কলাপী[৩] মারফৎ সূত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই, এই ব্যাকরণকে কৌমার বা কালাপ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

পরবর্তী কালে বেদ-পাঠের প্রতি লোকের ঔদাসীন্য বা অবহেলাও সম্ভবতঃ পাণিনির ব্যাকরণের পঠনপাঠনের অন্যতম অন্তরায়; ইহা বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কোন সময়ে

১. দ্রঃ Belvalkar : *Systems of Sanskrit Grammar*, পৃঃ ৮২।
২. মা+উদকম্।
৩. ময়ূর।

এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল[১]। ইহার প্রাচীনতম টীকা দুর্গসিংহ-রচিত বৃত্তি; দুর্গসিংহকে খৃঃ অষ্টম শতকের লেখক বলিয়া মনে করা হয়[২]। এই বৃত্তির উপরও অনেক টীকা রচিত হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বর্ধমান-রচিত 'কাতন্ত্রবিস্তর' (আঃ খৃঃ ১১শ শতক) ও ত্রিলোচনদাসের 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা'। বৃত্তির টীকাগুলিরও আবার টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণের মতে অধুনা-প্রাপ্ত 'কাতন্ত্রব্যাকরণে' প্রক্ষিপ্ত অংশ অনেক পরিমাণে আছে। সর্ববর্মার নামে প্রচলিত সূত্রপাঠের চারিটি অংশ —(১) সন্ধিপ্রকরণ, (২) নামপ্রকরণ, (৩) আখ্যাতপ্রকরণ ও (৪) কৃৎপ্রকরণ। দুর্গসিংহের সাক্ষ্য[৩] ও অন্যান্য কারণে মনে হয়, কৃৎপ্রকরণটি অন্য ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। নিপাতপাদ, স্ত্রীপ্রত্যয়পাদ ও উণাদিপাদ সর্ববর্মার রচিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, দুর্গসিংহের বৃত্তিতে এই বিষয়গুলি নাই। 'কাতন্ত্র-ব্যাকরণে'র বঙ্গদেশীয় এবং কাশ্মীরী রূপের মধ্যে বিস্তর মতভেদ হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থে পরবর্তী লেখকের রচনাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অল্পায়াসে দুরূহ ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্যই কাতন্ত্রের সৃষ্টি। ইহার রচয়িতা 'অষ্টাধ্যায়ী'র পদ্ধতিকে কিরূপে সহজ করিলেন দেখা যাউক। সর্ববর্মা স্বীয় গ্রন্থকে সরল করিতে যাইয়া পাণিনির প্রত্যাহারগুলিকে বর্জন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বৈদিকী প্রক্রিয়াকে 'কাতন্ত্রে'র বিষয়ীভূত করেন নাই। 'অষ্টাধ্যায়ী'র পদ্ধতিতে সর্ব-বর্মা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করিলেন 'কাতন্ত্র'কে সন্ধি, নাম প্রভৃতি প্রকরণে বিভক্ত করিয়া। এই সরলীকরণের ফলে, পাণিনির প্রায় ৪,০০০ সূত্রের স্থলে সর্ববর্মা প্রায় ৮৫৫টি[৪] মাত্র সূত্র রচনা করিলেন।

বোপদেব-সম্প্রদায়

'মুগ্ধবোধ' নামক ব্যাকরণের প্রণেতা বোপদেব। কাহারও মতে ইনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; কেহ কেহ মনে করেন, বোপদেব ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। তাঁহার পিতার নাম ভিষক্ কেশব ও অধ্যাপকের নাম ধনেশ্বর। বোপদেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি খৃঃ ৭ম-৮ম শতকের লেখক; কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের লোক। কথিত আছে, বোপদেব 'মুগ্ধবোধ' ভিন্ন ব্যাকরণ[৫]

১ দ্রঃ *Systems of Sanskrit Grammar*, পৃঃ ৮৩।
২. ঐ, পৃঃ ৮৮।
৩. সিদ্ধিগ্রহণাৎ **ভিন্নকর্তৃকত্বান্মঙ্গলার্থম্।**
৪. সন্দিগ্ধ কৃৎপ্রকরণের সূত্র লইয়া ১৪০০।
৫. অন্যান্য ব্যাকরণ-গ্রন্থের নাম—ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ, কবি-কল্পদ্রুম ইত্যাদি।

এবং ধর্মশাস্ত্রাদি সম্বন্ধেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী এই যে, 'শ্রীমদ্ভাগবত' বোপদেব-প্রণীত।

বোপদেবের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত জড়বুদ্ধি ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতেন এবং অপর সকলে তাঁহাকে উপহাস করিত। ইহাতে মর্মাহত হইয়া তিনি একদিন একটি জলাশয়ের তীরে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে, জলের কাছে একটি পাথরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পাথরটি দীর্ঘকাল লোকের ব্যবহারে অনেক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। বালক বোপদেব ইহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, পাথরের ন্যায় কঠিন দ্রব্যও যদি অনবরত ব্যবহারে ক্ষয় পায় তাহা হইলে তাঁহার মস্তিষ্ককে অনবরত চালিত করিলে তাহাতে বুদ্ধির বিকাশ নিশ্চয়ই হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে থাকিলেন। ফলে তিনি অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া সুধীসমাজে 'ভূনাগেন্দ্র', 'ভূবৃহস্পতি' প্রভৃতি আখ্যায় সম্মানিত হইলেন।

'মুগ্ধবোধ' নামটিই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিচায়ক—মুগ্ধানাং বালানাং অল্পবুদ্ধীনাং বা বোধঃ; অর্থাৎ, যাহাতে কোমলমতি বালকের এবং অল্পবুদ্ধি লোকের ব্যুৎপত্তি জন্মে। 'কাতন্ত্রে'র ন্যায়, ইহারও মূল উদ্দেশ্য পাণিনির ব্যাকরণের সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্তীকরণ। মুগ্ধবোধের সূত্রসংখ্যা ১২০০। সংক্ষেপে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে গিয়া বোপদেব পাণিনির প্রত্যাহারসমূহে কতক পরিবর্তন করিয়াছেন। 'বহুলং ব্রহ্মণি'—এই একটি মাত্র সূত্রে তিনি বৈদিক প্রকরণ সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। স্বর-প্রক্রিয়া তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছেন। অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, উদাহরণসমূহে বোপদেব হরি, হর প্রভৃতি দেবদেবীর নাম যথাসম্ভব প্রয়োগ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সবর্ণ সন্ধিতে তাঁহার উদাহরণগুলি এইরূপ—মুরারি, লক্ষ্মীশ, বিষ্ণূৎসব, ইত্যাদি। বোপদেবের সংজ্ঞাশব্দ ও পাণিনির সংজ্ঞাশব্দগুলির মধ্যে অনেক প্রভেদ। যেমন, পাণিনির ধাতু ও বৃদ্ধি বোপদেবের যথাক্রমে ধু ও বৃ। বোপদেবের 'সমাহার'গুলি পাণিনির 'প্রত্যাহার'সমূহ হইতে স্বতন্ত্র।

'মুগ্ধবোধে'র পঠনপাঠন যে একসময়ে খুবই প্রচলিত ছিল, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, ভট্টোজি দীক্ষিত স্বীয় 'মনোরমা' গ্রন্থে বোপদেবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, 'মুগ্ধবোধে'র মত অতি যত্নে তিনি খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। দুরূহ 'অষ্টাধ্যায়ী'র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক্রমশঃই সর্বত্র, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, হ্রাস পাইতে থাকিল। ফলে খৃঃ সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া 'মুগ্ধবোধ' বঙ্গদেশে অতি যত্নে অধীত হইয়া আসিতেছে।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের ন্যায়, 'মুগ্ধবোধের'ও বহু টীকাটিপ্পনী এবং সংক্ষিপ্তসার রচিত হইয়াছিল; ইহাও বোপদেবের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার অন্যতম নির্দেশক। টীকাগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ রাম তর্কবাগীশ-কৃত টীকা। আধুনিক যুগেও বাংলাদেশে 'মুগ্ধবোধে'র অনেক টীকা রচিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করিতে যাইয়া বোপদেব অনেক বিষয় বর্জন করিয়াছিলেন। সেইজন্য পরবর্তী কালে তাঁহার মতানুবর্তী বৈয়াকরণগণ পরিশিষ্টস্বরূপ কতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই পরিশিষ্টকার তিনজন—নন্দকিশোর ভট্ট, কাশীশ্বর ও রাম তর্কবাগীশ।

'মুগ্ধবোধে'র আনুষঙ্গিক (accessory) গ্রন্থও কিছু রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'পরিভাষাবৃত্তি' ও রাম তর্কবাগীশের উণাদিকোষ।

সারস্বত-সম্প্রদায়

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সম্প্রদায়েব অভ্যুত্থান হইয়াছিল খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি কোন কালে এবং মুসলমান শাসকগণের অনুপ্রেরণায়। অল্পায়াসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে সম্ভবতঃ 'সারস্বত-ব্যাকবণ' রচিত হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন খিল্‌জি, সালেমশাহ্ ও জাহাঙ্গীর এই ব্যাকরণ অধ্যয়নে লোককে উৎসাহিত করিতেন। উদয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু রাজারাও সারস্বত ব্যাকরণের ব্যাপক পঠনপাঠনে সহায়তা করিতেন[১]। একসময়ে এই ব্যাকরণের বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভট্টোজির 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং বরদরাজ-কৃত সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি রচিত হওয়ার পরে, ক্রমশঃ ইহার প্রতি লোকে হতাদব হইয়া পড়ে। সারস্বত-ব্যাকরণের ইতিহাসে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এক সময়ে মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। পুনরায়, বৃটিশ শাসকের শাসনকার্যের প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ অবলম্বনেই Wilkins কর্তৃক সর্বপ্রথম ইঙ্গ-সংস্কৃত (Anglo-Sanskrit) ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে বিহার ও বারাণসী ভিন্ন অন্যত্র এই ব্যাকরণের চর্চা বিরল।

'সারস্বত-প্রক্রিয়া' প্রণেতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিম্বদন্তী এই যে, এই 'প্রক্রিয়া'র বার্তিক-রচয়িতা অনুভূতিস্বরূপাচার্যই দেবী সরস্বতীর নিকট হইতে সূত্রগুলি পাইয়াছিলেন। কিন্তু, এই ব্যাকরণের টীকাকার ক্ষেমেন্দ্র ও অমৃতভারতীর সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, নরেন্দ্র নামে কোন ব্যক্তি 'মূল সারস্বত-প্রক্রিয়া'র প্রণেতা।

এই ব্যাকরণেরও বহু টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। টীকাকারগণের

১. Belvalkar : *Systems of Sanskrit Grammar*, পৃঃ ৯৩।

মধ্যে প্রধান পুঞ্জরাজ (গিয়াসউদ্দিনের মন্ত্রী), অমৃতভারতী ও ক্ষেমেন্দ্র[১]।

সারস্বত-ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক গ্রন্থ এবং সংক্ষিপ্তসারও অনেক রচিত হইয়াছিল। আনুষঙ্গিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হর্ষকীর্তির 'ধাতুপাঠ'। কল্যাণসরস্বতীর 'লঘুসারস্বত' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্তসার।

এখন আলোচনা করা প্রয়োজন—কি কারণে এই ব্যাকরণ এত জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ, তৎকালে প্রচলিত স্বল্পাকার ব্যাকরণগুলির তুলনায় ইহার আকার ছিল ক্ষুদ্রতম; সারস্বতের সূত্রসংখ্যা মাত্র ৭০০। দ্বিতীয়তঃ, প্রাঞ্জলতাও ইহার একটি বৈশিষ্ট্য। সারস্বতের প্রত্যাহারসমূহে 'ইৎ' বর্ণের প্রয়োগ করা হয় নাই; ইহাতে প্রযুক্ত সংজ্ঞাশব্দগুলি স্বীয় পরিচয় বহন করে, উহাদের জন্য পৃথক সংজ্ঞাপ্রকরণের প্রয়োজন হয় নাই। এই ব্যাকরণে প্রকরণ অনুযায়ী সূত্রগুলিকে সাজান হইয়াছে এবং সূত্রের ভাষা এত সহজে বোধগম্য হয় যে, তাহার জন্য কোন পরিভাষার আবশ্যকতা হয় নাই। বৈদিক-প্রকরণ ও স্বরপ্রক্রিয়া ইহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হইয়াছে এবং উণাদি-প্রকরণ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-সম্প্রদায়

হেমচন্দ্র ছিলেন জৈন ভিক্ষু। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল খৃঃ একাদশ শতকের শেষভাগে, দাক্ষিণাত্যের আহ্মেদাবাদ নামক স্থানে।

তাঁহার রচিত ব্যাকরণের নাম 'শব্দানুশাসন'[২]। 'অষ্টাধ্যায়ী'র ন্যায় ইহাও আটটি অধ্যায়ে রচিত; প্রতি অধ্যায় চারিটি পাদে সম্পূর্ণ এবং মোট সূত্রসংখ্যা ৪,৫০০। অষ্টম অধ্যায়টিতে শুধু প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র নিজেই 'শব্দানুশাসন-বৃহদ্‌বিবৃতি' নামে স্বীয় ব্যাকরণের একখানি টীকা রচনা করেন। এই বিবৃতির আবার টীকাটিপ্পনী আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান 'বৃহদ্বিবৃতি-ঢুণ্ঢিকা'। ইহার রচয়িতা কে তাহা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না।

হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের অনেক সংক্ষিপ্তসারও রচিত হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) বিনয়বিজয়গণির 'হৈমলঘুপ্রক্রিয়া' এবং (২) মেঘবিজয়ের 'হৈমকৌমুদী' বা 'চন্দ্রপ্রভা'।

'হৈমধাতুপাঠ', 'গণপাঠ' প্রভৃতি নামে হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক অনেক গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র পরবর্তী কালে শুধু ব্যাকরণের জন্যই খ্যাতিলাভ করেন নাই।

১. কাশ্মীরী ক্ষেমেন্দ্র হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।
২. সম্পূর্ণনাম—সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধস্বোপজ্ঞশব্দানুশাসন।

ব্যাকরণের সূত্রসমূহের উদাহরণস্বরূপ তিনি 'দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্য' নামে একটি কাব্যগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ পরবর্তী যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, হেমচন্দ্র স্বীয় ব্যাকরণে উল্লেখ-যোগ্য কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি জৈন ছিলেন বলিয়া হয়ত তাঁহার গ্রন্থ ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবার, জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যেও পূর্ববর্তী জৈনেন্দ্র ও শাকটায়নের গ্রন্থের প্রতি-যোগিতায় হেমচন্দ্রের গ্রন্থ খুব উচ্চস্তরের বলিয়া গণ্য হয় নাই।

উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলি ছাড়াও, অপর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জৈনেন্দ্র সম্প্রদায়ের প্রথম গ্রন্থ 'জৈনেন্দ্রব্যাকরণ'। কিম্বদন্তী এই যে, জিন বা মহাবীর এই ব্যাকরণের রচয়িতা; কিন্তু, আধুনিক পণ্ডিতগণ নানা প্রমাণবলে স্থির করিয়াছেন যে, দেবনন্দী বা পূজ্যপাদ নামে এক ব্যক্তি এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল খৃঃ পঞ্চম শতকে[১]। ব্যাকরণটি দীর্ঘ ও হ্রস্ব—এই দুই রূপে পাওয়া যায়। ইহাতে পাণিনির ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তীকরণ হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকারের কোন মৌলিকতার পরিচয় নাই।

শাকটায়ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শাকটায়ন। যাস্কের 'নিরুক্ত' ও পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে যে শাকটায়নের উল্লেখ আছে, ইনি সেই শাকটায়ন নহেন। এই শাকটায়নের জীবনকাল সম্ভবতঃ খৃঃ অষ্টম শতক। ইঁহার গ্রন্থের নাম 'শব্দানুশাসন'। ইহার টীকাটিপ্পনী বহু; মনে হয়, এককালে এই গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে 'অষ্টাধ্যায়ী' ও 'চান্দ্র' প্রভৃতি ব্যাকরণগ্রন্থ হইতে অনেক অংশ নেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থকার সংক্ষেপে ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন।

জৌমর সম্প্রদায়ের বিখ্যাত লেখক জুমরনন্দীর নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ক্রমদীশ্বর এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এবং জুমরনন্দী তাঁহার পরবর্তী লেখক। ক্রমদীশ্বরের রচিত ব্যাকরণ 'সংক্ষিপ্তসার'। নাম হইতেই ইহার স্বরূপ কতকটা বুঝা যায়; ইহাতে সংক্ষেপে 'অষ্টাধ্যায়ী'র সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে ইহার পঠনপাঠন আধুনিক কালেও প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কাহারও মতে বোপদেবের পূর্ববর্তী এবং কাহারও মতে বোপদেবের অব্যবহিত পরবর্তী।

১. দ্রষ্টব্য :—Belvalkar : *Systems of Sanskrit Grammar*, পৃঃ ৬৪-৬৫।

সৌপদ্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পদ্মনাভভট্ট ছিলেন মৈথিল ব্রাহ্মণ; তাঁহার জীবনকাল ছিল সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দশ শতকের কোন সময়ে। 'সৌপদ্মব্যাকরণ' পাণিনির ব্যাকরণ অবলম্বনে রচিত। বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে ইহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত আছে।

ব্যাকরণের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের অভিনব চেষ্টার ফল বৈষ্ণবগণের রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি। ইহাদের মধ্যে প্রধান 'হরিনামামৃত' নামক গ্রন্থদ্বয়। চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সহচর রূপগোস্বামীর (খৃঃ ১৪শ শতক) 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এবং কীর্তি-কাহিনীর সাহায্যে সংজ্ঞা ও উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর 'হরিনামামৃত'ও প্রায় এই জাতীয় গ্রন্থ। ইঁহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং বাংলাদেশে এখনও ইহাদের কিছু কিছু চর্চা হইয়া থাকে।

শৈব সম্প্রদায়েরও ঈদৃশ গ্রন্থ আছে। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধ-প্রকাশ' নামক ব্যাকরণখানিতে শিব ও শিবশব্দের প্রতিশব্দের সাহায্যে অনেক বিষয় বুঝান হইয়াছে; যেমন শিবশব্দে তিনি স্বরবর্ণকে বুঝাইয়াছেন।

'চান্দ্র', 'কাতন্ত্র' ও 'মুগ্ধবোধ' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ছাড়া পাণিনির পরবর্তী অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিতে মৌলিকতার বিশেষ কোন পরিচয় নাই। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য 'অষ্টাধ্যায়ী'র সংক্ষিপ্তীকরণ। এই যুগে টীকা, টীকার টীকা ও তস্যাঃ টীকা রচনাতেই ছিল বৈয়াকরণদের উৎসাহ অধিকতর। 'প্রবোধচন্দ্রিকা', 'ভোজব্যাকরণ', 'কারিকাবলী' প্রভৃতি নিকৃষ্টতর বহু গ্রন্থ এই যুগে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহাদের নামের বেশী আর বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য নাই।

উণাদিসূত্রকার

ব্যাকরণে ক্রিয়ার সহিত সাধারণতঃ যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় আছে; এইগুলির নাম উণাদিপ্রত্যয়। পাণিনি এইগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বার্ত্তিককার কাত্যায়নকে উণাদিসূত্রের রচয়িতা বলিয়া মনে করেন; কাহারও কাহারও মতে, শাকটায়নই উণাদিসূত্রকার।

সংস্কৃতরচনাসমূহে ব্যাকরণের প্রভাব

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, ভারতের নানাস্থানে ব্যাকরণের বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ বিলুপ্তির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু, যে সমস্ত গ্রন্থ আমরা বর্তমানে পাইতেছি তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বিপুল ব্যাকরণশাস্ত্রের

ইতিহাস হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই শাস্ত্র সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারগণের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভট্টি ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ স্বীয় কাব্যে ব্যাকরণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন; ভট্টির 'রাবণবধ' বা ভট্টিকাব্যকে উদাহরণকাব্যই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু, প্রকৃত কাব্য যাঁহারা রচনা করিযাছিলেন, তাঁহাদেব অনেকেই স্বীয় ভাষাকে ব্যাকরণ শৃঙ্খলে নিগড়িত কবিয়া তাহাব স্বতঃস্ফূর্তি ক্ষুণ্ণ করেন নাই। স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও যে ব্যাকরণকে যথাযথভাবে মানিয়া না লইয়া কাব্য রচনা করিযাছিলেন, তাহার প্রমাণ পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক ঃ—

অপশব্দশতং মাঘে ভারবৌ তু শতত্রয়ম্।
কালিদাসে ন গণ্যন্তে কবিরেকো ধনঞ্জয়ঃ ॥

[প্রামাদিক শব্দের সংখ্যা মাঘের রচনায একশত, ভারবির কাব্যে তিন-শত, কালিদাসে অসংখ্য, ধনঞ্জযই একমাত্র কবি।]

গায়ক, নট, জ্যোতিষী প্রভৃতিরাও ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। সেইজন্যই এইরূপ উক্তি আছে ঃ—

বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমৃগাঃ ক্ব যান্তি সন্ত্রস্তাঃ।
জ্যোতির্নটবিটগায়কভিষগাননগহ্বরাণি যদি ন স্যুঃ ॥

[জ্যোতিষী, নট, বিট, গায়ক ও চিকিৎসকগণের মুখগহ্বর যদি না থাকিত, তাহা হইলে বৈয়াকবণরূপ কিরাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত অপশব্দরূপ হরিণগুলি কোথায় যাইত ?]

নাট্যশাস্ত্র[১]

বর্তমানকালে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক প্রভৃতি নানারূপ নাটকই রচিত হইয়া থাকে এবং কতকগুলি প্রচলিত প্রথা বা convention ছাড়া নাট্যকারগণকে বিশেষ কোন বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয় না। প্রাচীন ভারতেও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেশনের জন্য এবং রঙ্গালয়ে অভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তবিনোদনার্থে বহু নাট্যগ্রন্থ রচিত হইত।[২] কিন্তু, সেই যুগের নাট্যকারগণ নিরঙ্কুশ ছিলেন না; নাট্যগ্রন্থের বস্তু নির্বাচনে, নায়কের চরিত্রচিত্রণে, রসের অবতারণায়, এমন কি নাটকের আঙ্গিক সম্বন্ধেও, তাঁহাদিগকে নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ সযত্নে পালন করিতে হইত।

নাট্যশাস্ত্রের সূচনা ও গ্রন্থাবলী

অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাট্য-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই এই শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছিল। নাট্যালঙ্কার হইতেই কাব্যালঙ্কারের উৎপত্তি এবং নাট্যরস হইতেই কাব্যরসের উদ্ভব।[৩]

পরবর্তী কালের বিশাল নাট্যসাহিত্যের বীজ সম্ভবতঃ উপ্ত হইয়াছিল সুপ্রাচীন কালে, ঋগ্বেদের পুরূরবা-উর্বশী, যম-যমী প্রভৃতি সূক্তে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের (Dramaturgy) সূচনা যে কোন যুগে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে (আঃ খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতক) শিলালী ও কৃশাশ্বকৃত নটসূত্রের উল্লেখ[৪] হইতে মনে হয় পাণিনিরও পূর্ববর্তীকালে সূত্রাকারে নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল।

'নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থটিতে নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি আলোচিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রোক্ত এক কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, দেব-গণের তৃপ্ত্যর্থে ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং মর্ত্যলোকের জন্য ভরতমুনি কর্তৃক নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। নাট্য-শাস্ত্রকে পবিত্র এবং 'নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থকে অতি প্রামাণিক বলিয়া প্রতি-

১. বর্তমান প্রসঙ্গে এই শব্দটি আমরা সাধারণ অর্থে বুঝিব; অর্থাৎ, নাট্য-রচনা সম্বন্ধে বিধিনিষেধাত্মক গ্রন্থই এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, শুধু ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-গ্রন্থই নহে।

২. সংস্কৃত সাহিত্যে বিবিধ নাট্যগ্রন্থ ও নাট্যকারগণের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Keith: Sanskrit Drama.

৩. দ্রঃ—সুশীলকুমার দে, History of Sanskrit Poetics, I, পৃঃ ২১।

৪. ৪।৩।১১০-১১১।

পন্ন করাই কাহিনীটির উদ্দেশ্য; বস্তুতঃ, 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত। ইহার রচনাকালও নিশ্চিতভাবে জানা যায়না এবং এই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়; কেহ কেহ মনে করেন, এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকে, কেহ বা বলেন ইহার রচনা-কাল খৃঃ দ্বিতীয় শতকে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ইহার রচনা-কালের নিম্নতর সীমা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক এবং উচ্চতর সীমা সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্ম।১ 'নাট্যশাস্ত্রে'র যে সমস্ত বিভিন্ন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মূলের পাঠান্তর প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে; ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে গ্রন্থটির মধ্যে যুগে যুগে প্রক্ষিপ্ত অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনেক টীকাকারের নাম পাওয়া গেলেও একমাত্র অভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী' নামক টীকাই বর্তমানে পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্ত কাশ্মীরের লোক; তিনি খৃঃ ১০ম হইতে ১১শ শতকের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপ' বা 'দশরূপক' নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহাকে 'নাট্যশাস্ত্রে'র সংক্ষিপ্তরূপ বলা যায়। পরবর্তী কালে ইহার খ্যাতি 'নাট্যশাস্ত্র'কেও অতিক্রম করিয়াছিল। ধনঞ্জয় ধারারাজ মুঞ্জের সমসাময়িক (খৃঃ দশম শতক)।২ ধনঞ্জয়ের সমকালীন ধনিক 'দশরূপকে'র 'অবলোক' নামক একটি টীকা রচনা করেন।

সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দশ শতকে রচিত তিনটি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিদ্যানাথের 'প্রতাপরুদ্রীয়ে'র নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক অংশটি 'দশরূপকে'র ভিত্তিতেই লিখিত। বিদ্যানাথ-রচিত 'একাবলী' 'প্রতাপরুদ্রীয়' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ'। ইহার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা আছে। এই অংশটুকু অনেক পরিমাণে 'দশরূপক' অবলম্বনে রচিত হইলেও, বিশ্বনাথ 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন এবং এমন কিছু কিছু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন যাহা ধনঞ্জয় স্বীয় গ্রন্থের বিষয়ীভূত করেন নাই।

খৃঃ ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য রূপগোস্বামী 'নাটকচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বিশ্বনাথের সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু, বিশ্বনাথের গ্রন্থের সহিত তুলনায় তাঁহার গ্রন্থের কোন উৎকর্ষ দেখা যায় না।

খৃঃ সপ্তদশ শতকে লিখিত সুন্দরমিশ্রের 'নাট্যপ্রদীপ' 'দশরূপক' ও 'সাহিত্যদর্পণ' অবলম্বনে রচিত।

১. S. K. De : *History of Sanskrit Poetics, I,* পৃঃ ৩৬।
২. Keith : *Sanskrit Drama,* পৃঃ ২৯২।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক অনেক গ্রন্থের নাম বা পুঁথি পাওয়া যায়। কিন্তু, এই সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ নহে এবং ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার পরিচয় নাই।

নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু

এই শাস্ত্রে বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে; কোন কোন বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) নাট্যগ্রন্থ রচনার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ এবং (২) রঙ্গালয় ও অভিনয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী। প্রথমটিকে বলা যায় dramatic theory এবং দ্বিতীয়টি dramatic practice। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই দ্বিবিধ বিষয়ের খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কিন্তু, নাট্যসাহিত্য বলিতে কি বুঝায় তাহাই আমাদের সর্বপ্রথম বিচার্য।

নাট্যশাস্ত্রকারগণের মতে, অবস্থাবিশেষের অনুকরণের নামই নাট্য[১]। অবস্থার অনুকরণ চতুর্বিধ[২]—

(১) আঙ্গিক,
(২) সাত্ত্বিক
(৩) বাচিক,
(৪) আহার্য।

নাট্য ও কাব্যের প্রধান প্রভেদ এই যে, কাব্য 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে, কিন্তু নাট্য চক্ষুকর্ণকে যুগপৎ আনন্দ দান করিয়া দর্শকের মনে অলৌকিক রসের সঞ্চার করে।

নাট্য নৃত্য ও নৃত্ত হইতে পৃথক্। নৃত্য (mimetic art) ভাবব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গীবিশেষ এবং নৃত্ত (dance) তাললয়াশ্রয়ী[৩]। এই উভয়ের সহিত কথা ও গানের সংমিশ্রণে নাট্যের সৃষ্টি—ইহার সারবস্তু রস, অভিনয়-দর্শনে দর্শকের মনে এই রসেরই উদ্রেক হইয়া থাকে।

নাট্যশাস্ত্রে নাট্যসাহিত্যকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) রূপক, (২) উপরূপক। রূপক দশবিধ[৪] এবং উপরূপক অষ্টাদশ

১. লোকবৃত্তানুকরণ' নাট্যম্—'নাট্যশাস্ত্র' ১। ১০৯।
অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্—দশরূপক ১। ৭।
ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকার ঃ—সাহিত্যদর্পণ ৬। ৩।

২. নিম্নে নাট্যকলার প্রয়োগের আলোচনায় অভিনয় প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩. অন্যদ্ভাবাশ্রয়ংনৃত্যম্, নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্—দশরূপক ১। ৯।

৪. নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী, প্রহসন। (সাহিত্যদর্পণ ৬।৪)

প্রকার১। নটে রাম ও রাবণাদির চরিত্রের আরোপ করা হয় বলিয়া রূপকের এই নামকরণ হইয়াছে। নাট্যগ্রন্থমাত্রকেই দৃশ্যকাব্য বলা হয়, পদ্য ও গদ্য-সাহিত্যের নাম শ্রব্যকাব্য। এখানে বলা আবশ্যক যে, বাংলাভাষায় নাট্য-গ্রন্থমাত্রকেই 'নাটক' বলা হয়; কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে নাটক শুধু একপ্রকার নাট্য-রচনা।

নাট্যগ্রন্থরচনা সম্বন্ধে বিধিনিষেধ

বস্তু, নেতা ও রস—এই তিনটি নাট্যসৌধের প্রধান স্তম্ভ। ইহাদের বৈষম্য হেতুই প্রধানতঃ নাট্যসাহিত্যের গ্রন্থসমূহের স্বরূপগত প্রভেদ হইয়া থাকে।

বস্তু

বস্তু দ্বিবিধ--আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক বস্তুই নাট্য-গ্রন্থের উপজীব্য ঘটনা; ইহা সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রাসঙ্গিক বস্তু আধিকারিক বস্তুর সহিত প্রসঙ্গক্রমে সংশ্লিষ্ট এবং গ্রন্থের একদেশব্যাপী। 'শকুন্তল.' নাটকে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের প্রেম আধিকারিক বস্তু; রাজার মৃগয়া, দুর্বাসার অভিশাপ ও অঙ্গুরীয়-সংক্রান্ত ঘটনাবলী ঐ প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতির সহায়ক বলিয়া প্রাসঙ্গিক বস্তু। এই শেষোক্ত বস্তু দ্বিবিধ—পতাকা ও প্রকরী। পতাকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর; ইহা মূল বস্তুর সহায়ক বা সাময়িকভাবে পরিপন্থী। কখনও কখনও ইহা নাট্যগ্রন্থের সমাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে। প্রকরী ক্ষুদ্রতর এবং ইহাতে প্রধান চরিত্রসমূহের কোন অংশই গ্রহণ করিতে হয় না।

বস্তুর অগ্রগতির সহায়ক আরো তিনটি ব্যাপার আছে--(১) বীজ, (২) বিন্দু, (৩) কার্য। সংক্ষেপে উক্ত হইয়া যাহা পল্লবিত আকারে পরিণত হয়, তাহাই বীজ২। 'শকুন্তলা' নাটকে বৈখানস যখন রাজাকে বলিলেন যে, কণ্বমুনি কন্যা শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারে নিযুক্ত করিয়া উহার প্রতিকূল দৈবের শান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থে গিয়াছেন, তখনই বীজ উপ্ত হইল। ঘটনান্তরের দ্বারা মূল বস্তু ব্যাহত হইলে যাহাদ্বারা মূলসূত্রের পুনরুদ্ধার হয়, তাহাই বিন্দু৩। দ্বিতীয় অঙ্কে, মৃগয়া সম্বন্ধে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন এবং 'কৃত্যানাং ভিন্নদেশত্বাৎ' রাজার মনের দ্বৈধীভাব প্রভৃতিতে

১. নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপ, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, ভাণিকা। (সাহিত্যদর্পণ—৬।৫)

২. অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যৎ প্রসর্পতি—'নাট্যশাস্ত্র' ২১।২৩।

৩. প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্—ঐ ২১।২৪।

যখন নাটকের মূলসূত্র হারাইয়া গিয়াছিল, তখন রাজা বিদূষককে বলিলেন —অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি। আমরা মূলসূত্রকে ফিরিয়া পাইলাম; ইহাই বিন্দু। নাট্যগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিসমাপ্তিই কার্য; ইহাকেই বলা হয় dénouement বা catastrophe। পতাকা, প্রকরী, বীজ, বিন্দু ও কার্য—এই পাঁচটিকে বলা হয় অর্থপ্রকৃতি।

বস্তুর ক্রমপরিণতি পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে। যথা—(১) আরম্ভ, (২) যত্ন, (৩) প্রাপ্ত্যাশা, (৪) নিয়তাপ্তি ও (৫) ফলাগম। বস্তুর সূচনাই আরম্ভ: যত্নে হয় উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের চেষ্টা। প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থায় উদ্দিষ্ট বস্তু লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়; নিয়তাপ্তিতে উহার লাভের নিশ্চয়তা নায়কের মনে জন্মে এবং ফলাগমে ঈপ্সিত বস্তু লব্ধ হয়।

এই অবস্থাগুলি যখন ক্রমশঃ আসে, তখন ইহাদিগকে আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক বস্তুর সহিত যুক্ত রাখিবার জন্য যে পাঁচটি ব্যাপার আছে তাহাদিগকে বলা হয় সন্ধি; যথা—(১) মুখ, (২) প্রতিমুখ, (৩) গর্ভ, (৪) বিমর্শ বা অবমর্শ, (৫) উপসংহৃতি বা নির্বহণ।

বস্তুর উৎস অনুসারে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—প্রখ্যাত বা ঐতিহাসিক অথবা সর্বজনবিদিত, উৎপাদ্য বা কাল্পনিক এবং মিশ্র অর্থাৎ অংশতঃ ঐতিহাসিক, অংশতঃ কাল্পনিক।

সূচ্য ও দৃশ্যশ্রব্যভেদে আবার বস্তু দ্বিবিধ। যাহা কোন কারণে দর্শকগণকে শোনাইবার বা দেখাইবার অযোগ্য তাহা ইঙ্গিতে বা প্রকারান্তরে জ্ঞাপন করা হয়, ইহাই সূচ্যবস্তু। যাহা অংশতঃ দৃশ্য ও অংশতঃ শ্রব্য তাহাই দৃশ্যশ্রব্য। সূচ্য বস্তু বিষ্কম্ভক, চূলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার এবং প্রবেশক প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। এই পাঁচটির নাম অর্থোপক্ষেপক।

বস্তুর নিম্নলিখিতরূপ ভাগও হইয়া থাকে—সর্বশ্রাব্য বা প্রকাশ, অশ্রাব্য বা স্বগত এবং নিয়তশ্রাব্য। আধুনিক নাটক ও সংস্কৃত নাট্যরচনাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারগণ পাত্রপাত্রীর ভাষা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন। নায়ক ও অন্যান্য উচ্চতর চরিত্র সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিবেন এবং স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রকৃতভাষাভাষিণী হইবেন।

রচনার রসভেদে বৃত্তি (Style or mode of action) চতুর্বিধ—(১) শৃঙ্গারে কৈশিকী, (২) বীরে সাত্ত্বতী, (৩) রৌদ্র ও বীভৎস রসে আরভটী ও (৪) সর্বত্র ভারতী। কৈশিকী বৃত্তিতে পাত্র-পাত্রীরা শৃঙ্গাররসের অনুকূল নানাভাবের অভিনয় করে। সাত্ত্বতীতে রৌদ্র, বীর, ও অদ্ভুত রসের অনুকূল ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়। ভারতীবৃত্তিতে রচিত নাট্যাংশে শুধু সংস্কৃতভাষী পুরুষ-চরিত্র থাকে। আরভটীতে পাত্র-পাত্রীদের আচরণ হয় সাহস, দম্ভ ও মিথ্যাচরণ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

নাট্যবস্তু আরম্ভ করিবার পূর্বে 'নান্দী' নামক শ্লোকে দেব, দ্বিজ বা নৃপাদির স্তুতি এবং দর্শকবৃন্দের বা অভিনয়ের শুভকামনা করা হইবে। নান্দী-রচনা নাট্যকারের কর্তব্য নয়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা বর্তমানে যে শ্লোক পাই তাহা নান্দী নয়। ইহা বস্তুতঃ নাট্যাভিনয়ের পূর্বে করণীয় পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত রঙ্গাম্বার। তৎপর, প্রস্তাবনা বা আমুখে নাট্যকার নিজের নাম ও পরিচয় এবং গ্রন্থের নাম প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবেন। এই প্রস্তাবনা পঞ্চবিধ—উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক এবং অবলগিত।

দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু এবং দর্শকের ও পাঠকের বিরক্তি—, লজ্জা—বা ভীতি-কর কোন ব্যাপার নাট্যগ্রন্থের অঙ্কমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেনা।১

নাট্যরচনার প্রকারভেদে অঙ্ক-সংখ্যার ভেদ হইয়া থাকে; যেমন, নাটকে অঙ্কের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে পাঁচ এবং ঊর্ধ্বপক্ষে দশ। কোন কোন নাট্যগ্রন্থ একাঙ্ক; যেমন, ভাণাখ্য রূপক। নাট্যগ্রন্থের সমাপ্তিতে থাকিবে 'ভরত-বাক্য'; ইহার বিষয়বস্তু আশীর্বাদ বা প্রার্থনা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নাট্যগ্রন্থে নায়ক এবং উচ্চতর চরিত্রেরা সংস্কৃতে এবং নায়িকা ও নিম্নতর চরিত্রগুলি প্রাকৃতে কথা বলিবে।

বস্তু সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সংস্কৃতে নাট্যগ্রন্থ বিয়োগান্তক বা tragedy হইতে পারেনা, যদিও সাময়িক ভাবে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটিয়া করুণরস বা tragic interest সৃষ্ট হইতে পারে।

নেতা

নেতা বা নায়ক রূপকাদির প্রকারভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে; যেমন নাটকের নায়ক হইবেন প্রখ্যাতবংশ রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত,২ প্রতাপবান্ ও গুণবান্। তিনি দিব্যপুরুষ হইতে পারেন অথবা অংশতঃ দিব্য ও অংশতঃ অদিব্য হইতে পারেন৩। প্রকরণের নায়ক বিপ্র, অমাত্য বা বণিক্৪। নায়কের প্রধান সহায়কের নাম পীঠমর্দ; ইনি বাক্‌পটু, প্রভুভক্ত এবং পতাকার নায়ক। বিদূষক নায়কের নিত্যসহচর ও তাঁহার গোপন প্রেমের সহায়ক। প্রণয় সংঘটনে বিটও নায়কের সহায়ক।

নায়িকা ত্রিবিধা—স্বীয়াভার্যা, পরকীয়া বা সামান্য স্ত্রীলোক। তিনি নায়কের অনুরূপ গুণসম্পন্না হইবেন। সখী, দাসী, ধাত্রী, প্রতিবেশিনী প্রভৃতি নায়িকার সহচরী ও সহায়িকা।

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যদর্পণ' ৬।৭।

২. ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত—নায়ক এই চারিপ্রকার হইতে পারে।

৩. সাহিত্যদর্পণ ৬।৬।

৪. সাহিত্যদর্পণ ৬।২৫৩।

কোন কোন নাট্যগ্রন্থে প্রতিনায়ক থাকেন। তিনি হইবেন অর্থগৃধ্নু, কামোন্মত্ত এবং সর্বথা নিন্দিত চরিত্র। রাম যদি কোন নাটকের নায়ক হন, তাহা হইলে রাবণ প্রতিনায়ক হইতে পারেন।

রস

রূপকাদির প্রকারভেদে রসভেদ হইয়া থাকে। নাটকের অংগী বা প্রধান রস শৃংগার অথবা বীর এবং অন্য সর্বপ্রকার রস অংগস্বরূপ বা অপ্রধান; উপসংহারে অদ্ভুতরসের অবতারণা বিধেয়। শৃংগার দ্বিবিধ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগে নায়ক নায়িকা মিলিত থাকেন এবং বিপ্রলম্ভে তাহাদের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, বিপ্রলম্ভ শৃংগার নাট্যবস্তুর মধ্যে কোথাও থাকিলেও নাট্যবস্তু নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদে পর্যবসিত হইতে পারেনা; ইহাই বাংলা বা ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য প্রভেদ।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে গ্রীক্ প্রভাব

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, গ্রীক্দেশীয় নাটকের আদর্শেই ভারতীয় নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ যুক্তিই আছে১। এই মতের সমর্থকগণ ইহাও মনে করেন যে, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' Aristotle-এর নাট্যবিধানাবলী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। উভয় দেশের নাট্যবিধানের মধ্যে কীথ্ কতক সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন২। নিদর্শনস্বরূপ দুই একটি বিষয়ের কথা বলা যাইতেছে। নাটকে Unity of time এর নির্দেশ দিয়াছেন Aristotle। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রেও অনুরূপ বিধান দেখা যায়। গ্রীকমতে যাহা Unity of action তাহাও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে স্বীকৃত। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—নানেকদিনবর্ত্যকথয়া সম্প্রযোজিতঃ৩, অর্থাৎ, নাটকের কোন অংকে বর্ণিত ঘটনাবলীর ব্যাপ্তি এক দিনের অধিক হইবে না। গ্রীক্নাটকের প্রধান লক্ষণ যেমন Mimesis, সংস্কৃত রূপকের তেমন অনুকৃতি। গ্রীক্ নাটকে parasite-এর ওর সংস্কৃত রূপকে বিটের চরিত্র অনুরূপ।

উভয় দেশের নাট্যশাস্ত্রে উক্তপ্রকার এবং অন্যান্য কতক সাদৃশ্য থাকিলেও কোন্ দেশ উত্তমর্ণ ও কোন্ দেশ অধমর্ণ তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। উভয় দেশের প্রতিভা বিবেচনা করিলে গ্রীস্ ও ভারতে পরস্পরনিরপেক্ষ বিধিনিষেধগুলি গড়িয়া উঠা অসম্ভব মনে হয় না। কীথ্ যথার্থই

১. বিস্তৃত বিববণেব জন্য দ্রষ্টব্য Keith : *Sanskrit Drama,* পৃঃ ৫৭-৬৮।
২. Sanskrit Drama, পৃঃ ৩৫৫।
৩. সাহিত্যদর্পণ—৬।৭।

বলিয়াছেন যে, ভারত যদি গ্রীস্ হইতে নাট্যশাস্ত্রের কতক নিয়মাবলীর অনুকরণ করিয়াই থাকে, তাহা হইলে একটি কথা স্বীকার্য। ভারত গ্রীক্ বিধানের অন্ধ অনুকরণ করে নাই, স্বীয় প্রতিভার স্পর্শে এমন করিয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইয়াছে যে, অনুকরণের কোন চিহ্ন তাহাতে পাওয়া যায় না.

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব ও tragedyর অভাব

ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতির পরে যেমন ব্যাকরণশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তেমনই নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট হইবার পরে নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র রচনাকালের ঊর্ধ্বতর সীমা সাধারণতঃ খৃষ্টের জন্মের সমকালীন বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু, এক অশ্বঘোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নামক অসম্পূর্ণ নাট্যগ্রন্থ ছাড়া এই কালের পূর্বেকার কোন নাট্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সেইজন্য খৃষ্টপূর্ব যুগে আর কোন নাট্যরচনা ছিল না, একথা বলা যায় না। 'নাট্যশাস্ত্রে'র এক আখ্যানে দেখা যায়, এবয়ং ব্রহ্মা 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামে দুইটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। এই আখ্যানকে নিছক tradition বা পরম্পরাগত কিম্বদন্তী বলিয়া বর্জন করিলেও পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে (আঃ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক) নট-সূত্রের উল্লেখ এবং পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'র (আঃ খৃঃ পূঃ ২য় শতক) নানা প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব যুগেও অনেক নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে উহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র পরবর্তী যুগে রচিত সমস্ত নাট্যগ্রন্থেই ঐ শাস্ত্রের প্রবল প্রভাব লক্ষিত হয়। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালিদাস তাহার নাটকসমূহের বিষয়বস্তুর জন্য বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিলেও ঐ উপাখ্যানের জীর্ণ কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু, তিনিও নাট্যশাস্ত্রের যথেষ্ট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে খাঁটি tragedy বা বিচ্ছেদান্তক গ্রন্থ নাই তাহার মুখ্য কারণ নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন। ভারতবাসিগণের জীবনদর্শনও ইহার জন্য গৌণভাবে দায়ী। সংসারের নানা প্রতিকূল অবস্থায় পৌরুষ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ব্যর্থতায় জীবন পর্যবসিত হইলেও শির নত না করিয়া অন্তিম দশায় উপনীত হওয়া—ইহাই গ্রীক্ tragedyর মর্মকথা। কিন্তু, অদৃষ্টবাদী ভারতবাসী বিশ্বাস করিত যে, ইহজীবনের সমস্ত কার্যকলাপের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী; তাহার পূর্বজন্মে সে যেরূপ কাজ করিয়াছে, এই জন্মে সে সেরূপ ফলই ভোগ করিবে। অতএব কাহারও দুরবস্থার জন্য করুণার উদ্রেক হইলে অদৃষ্টের স্বাভাবিক গতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়।

ভাসের কতক নাটককে tragedy বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু, এই ধারণার সুদৃঢ় কোন ভিত্তি নাই। একথা সত্য যে, রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুর অভিনয় সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রের নিষেধ তিনি অনেক নাটকে মানেন নাই। কিন্তু, যাহাদের মৃত্যু দেখান হইয়াছে, তাহারা পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টিতে হেয় চরিত্রের লোক; তাহাদের মৃত্যু করুণ-রসের উদ্রেক করে না, বরং মনে আনন্দেরই সঞ্চার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাসের 'উরুভঙ্গে'র উল্লেখ করা যায়। ইহাতে দুর্যোধনের মৃতুকে ভারতবাসী ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় হিসাবেই মনে করিয়া থাকে।

নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবে সংস্কৃত নাট্য রচনার সহজ ও স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই শাস্ত্রকে প্রতিপদে মানিতে যাইয়া নাট্যকারের রচনাভঙ্গীর স্বাধীনতা খর্ব হইয়াছে এবং অনেক স্থানে, আধুনিক রুচিতে বিচার করিতে গেলে, বর্ণিত বিষয় কৃত্রিম বা অলৌকিক হইয়া পড়িয়াছে। যে ভবভূতি করুণ-রসের বিচিত্র অভিব্যক্তিতে অতুলনীয়, যাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যাহার 'ছায়া-সীতা' নামক নাট্যাংশটি নাট্য-কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশে 'উত্তররামচরিতে'র উপসংহারে অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় লইয়া উপজীব্য স্বাভাবিক বস্তুটিকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন; বাল্মীকি জনমদুঃখিনী সীতার লাঞ্ছনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে পাতালে শান্তির ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। কিন্তু, বস্তুকে মিলনে পর্যবসিত করার তাগিদে নিষ্করুণ স্বামীর সঙ্গে, যেমন করিয়াই হউক, ভবভূতি সীতার মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

নাট্যকলার প্রয়োগ

'নাট্যশাস্ত্রে' এবং নাট্যকলাবিষয়ক অপরাপর গ্রন্থে বা গ্রন্থাংশে নাট্য-কলার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে, ঐগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভাগ করিয়া লওয়া যায়ঃ—

(১) পূর্বরঙ্গ,
(২) অভিনয়,
(৩) রঙ্গালয়,
(৪) নটনটী,
(৫) দর্শকমণ্ডলী।

পূর্বরঙ্গ

নাট্যগ্রন্থের বিষয় অভিনীত হইবার পূর্বে যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাদের নাম পূর্বরঙ্গ। 'নাট্যশাস্ত্রে' এই সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী আছে। এই পূর্বরঙ্গের প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা প্রভৃতি

অনেক অঙ্গ। প্রত্যাহারে থাকে ঢাকের বাদ্যে অভিনেতব্য বিষয়ের ঘোষণা ও বাদিত্রবাদকদলের উপবেশনার্থ আসনের আস্তরণ। অবতরণে গায়ক ও বাদকগণ প্রবেশপূর্বক আসন গ্রহণ করেন। আরম্ভে বৃন্দগায়কগণ গান আরম্ভ করেন এবং আশ্রাবণাতে বাদকগণ বাদ্য আরম্ভ করেন। ভরত ('নাট্যশাস্ত্র' ৫/৮ প্রভৃতিতে) পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠানগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) 'অন্তর্যবনিকাঙ্গ' অর্থাৎ যেগুলি যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠেয়, এবং (২) 'বহির্যবনিকাঙ্গ' যেগুলি যবনিকার বাহিরে রঙ্গমঞ্চে নিষ্পাদ্য। তৎপরে হয় মঙ্গলাচরণ; ইহার নাম নান্দী, ইহাতে থাকে আশীর্বচন, দেব, দ্বিজ ও নৃপাদির স্তুতি প্রভৃতি।

এই বিস্তৃত পূর্বরঙ্গ যে কালক্রমে হ্রস্বায়িত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'নাট্যশাস্ত্রে'র যুগেই সম্ভবতঃ সকলে এত দীর্ঘ পূর্বরঙ্গের পক্ষপাতী ছিল না; কারণ, এই গ্রন্থেই একটি সংক্ষিপ্ত ও একটি বিস্তৃত পূর্বরঙ্গের বিধান লিপিবদ্ধ আছে। 'দশরূপকে' এত রকমের অনুষ্ঠানের বিধি নাই। 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথের উক্তি হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে এক নান্দী ভিন্ন পূর্বরঙ্গের অপর কোন অঙ্গের অনুষ্ঠানই হইত না[১]।

অভিনয়

'নাট্যশাস্ত্রে'র মতে, রঙ্গদ্বার নামক পূর্বরঙ্গের অঙ্গেই অভিনয়ের সূচনা হয়। ইহাতে প্রধান ব্যাপার সূত্রধার, বিদূষক ও পারিপার্শ্বিক ব্যক্তির কথোপকথন। অবশেষে, প্ররোচনা[২] নামক অঙ্গে নাট্যবস্তুর ঘোষণা করা হয়, সূত্রধার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন; পূর্বরঙ্গের এখানেই সমাপ্তি।

বর্তমান যুগে অভিনয়কে যথাসম্ভব বাস্তবরূপ দান করিবার ঔৎসুক্য যথেষ্ট। নাট্যশাস্ত্রাদিতে এই বিষয়ে বিশেষ কোন বিধান লক্ষিত হয় না; সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তি নটনটীর হাবভাব হইতেই স্বীয় সৌন্দর্যবুদ্ধির (aesthetic faculty) সাহায্যে অপ্রদর্শিত ব্যাপারগুলি বুঝিয়া লইতে পারিতেন; aesthetic pleasure অর্থাৎ চমৎকারিত্ব বা রসের উদ্বোধনই ছিল নাট্যবস্তুর উদ্দেশ্য, বস্তুনিষ্ঠতা নহে। কিন্তু একথা মনে করা ঠিক নহে যে, সে-যুগে বাস্তববোধের সহায়ক অভিনয়-সংক্রান্ত কোন দৃশ্য বা বস্তুই রঙ্গমঞ্চে দেখান হইত না। 'নাট্যশাস্ত্রে' এইরূপ জিনিসের নাম দেওয়া হইয়াছে 'পুস্ত'; পুস্ত ত্রিবিধ[৩]—

---

১. প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি।
তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে॥ (৬।১০)

২. নাট্যকার ও নাট্যবস্তুর প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের রুচি-উৎপাদন করা হয় বলিয়া এই অঙ্গের নাম প্ররোচনা।

৩. ২৩।৬।

(১) সন্ধিম—বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত এবং চর্ম বা বস্ত্রাবৃত,
(২) ব্যাজিম—যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাদি,
(৩) চেষ্টিম—পোষাকপরিচ্ছদ।

'মৃচ্ছকটিক'এ নিশ্চয়ই মাটির গাড়ী রঙ্গমঞ্চে দেখান হইত।

পূর্বে চতুর্বিধ অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে 'আঙ্গিক অভিনয়' বলিতে বুঝায় অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে নাট্যবস্তুর প্রতিপাদ্য বিষয়কে দর্শকের নিকট পরিস্ফুট করা। শুধু নটনটীগণের কথা দর্শকের শ্রোত্র-সুখকর হইতে পারে; কিন্তু, নাট্যের উদ্দেশ্য যুগপৎ শ্রোত্রসুখ ও নয়ন-তৃপ্তি। নয়ন-তৃপ্তির জন্য অঙ্গভঙ্গীর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। নাটকের কোন পাত্র বা পাত্রী শুধু বুলি আওড়াইয়া গেলে তাহা দর্শকের হৃদয়গ্রাহী হয় না। 'নাট্যশাস্ত্রে' (৮/১১) অঙ্গভঙ্গীসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—মুখজ, চেষ্টাকৃত ও শারীর। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার বহুবিধ ভাগ বিভাগ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে হস্তদ্বারা অভি-নয়ের নাম 'চেষ্টাকৃত অভিনয়'; ইহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—সংযুত অর্থাৎ হস্তদ্বয় একত্র করিয়া এবং অসংযুত বা একহস্তনিষ্পাদ্য। ইহাদের আবার অনেকপ্রকার ভাগ আছে।

বিভিন্ন শারীরিক অবস্থার প্রদর্শনের নাম 'সাত্ত্বিক অভিনয'। স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ও মূর্চ্ছা—এই আটটি শারীরিক ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়। যে অভিনয়ে এই ভাবগুলি প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই বলে সাত্ত্বিক অভিনয়।

যে প্রকার অভিনয়ে কথোপকথনের দ্বাবা নাটকীয় চরিত্রগুলির মনোভাব ব্যক্ত করা হয়, তাহার নাম বাচিক। নটনটী শুধু সাজসজ্জা বা অঙ্গভঙ্গী করিলেই নাট্যোক্ত চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত ভাব পরিস্ফুট হয় না—এই সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকারগণ সচেতন ছিলেন। তাহা ছাড়া, কথা না থাকিলে শ্রোত্রসুখকরত্ব রূপ নাটকের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। সেইজন্যই বাচিক অভিনয় সম্বন্ধে তাঁহারা নানারূপ বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাজসজ্জার সাহায্যে যে অভিনয় তাহাব নাম আহার্য, অর্থাৎ যাহা স্থনান্তর হইতে আহরণীয় বস্তুযোগে নিষ্পন্ন হয়১। এই বেশভূষাকে বলা হইত 'নেপথ্য'; ইহার প্রধান অঙ্গ ছিল—(১) পুস্ত, (২) অলঙ্কার ও (৩) অঙ্গরচনা। পুস্ত সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'অলঙ্কার' শব্দে 'নাট্যশাস্ত্রে' বুঝায় মালা, আভরণ, বস্ত্র প্রভৃতি। মুকুট কুণ্ডলাদি আভরণের

১. এই অর্থে 'আহার্য' শব্দটি ব্যবহৃত হইযাছে ভট্টিকাব্যে—আহার্যশোভাবহিতৈ রমাঙ্গৈঃ ইত্যাদি (২।১৪)।

অন্তর্গত। স্ত্রীলোকের নানারূপ কেশ ও বেশবিন্যাসের ব্যবস্থাও ছিল; নটনটীর বেশভূষা হইতে নাটকীয় চরিত্রের স্বরূপ দর্শকের নিকট অনেক পরিমাণে প্রতিভাত হইত। অংগরচনা বিভিন্ন প্রকার ছিল; পাত্রপাত্রীভেদে নানারূপ অংগরাগের ব্যবস্থা ছিল। শমশ্রুকর্ম বা নানাপ্রকার গোঁফদাড়ির বিন্যাস অংগরচনার অন্তর্গত। পাত্রভেদে বিভিন্নরূপে শমশ্রুবিন্যাস করা হইত। দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতির ভূমিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে মুখোস্‌ও পরিতে হইত।

অভিনয়ের উপযোগী কাল সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেখা যায় না। 'মালতীমাধব', 'কর্ণসুন্দরী' প্রভৃতি কয়েকটি নাট্যগ্রন্থ হইতে কীথ্‌ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তটি অভিনযের উপযোগী কাল বলিয়া বিবেচিত হইত।১

রংগালয়

আয়ত (rectangular) ও ত্রিকোণ নাট্যশালার উল্লেখ 'নাট্যশাস্ত্রে' আছে। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার বড়, মাঝারি বা ছোট হইতে পারে। রাজাদের উপযোগী রংগমন্ডপ ৬৪×৩২ হাত। ইহাতে রংগমঞ্চ বা রংগ-পীঠ (stage) থাকিবে এক পার্শ্বে এবং উহার প্রস্থ হইবে ৮ হাত। রংগ-পীঠের সমান দুইটি ভাগ, পশ্চাতের অংশ নেপথ্যগৃহ এবং সম্মুখভাগ রংগপীঠ। নেপথ্যগৃহ হইতে রংগপীঠে আসিবার দুইটি প্রবেশপথ; তাহাতে দুইটি পর্দা (screen) দেওয়া থাকিবে। পর্দাগুলির নাম পটী, অপটী, তিরস্করণী বা প্রতিসীরা। সম্ভবতঃ এই দুই পর্দার মধ্য-বর্তী স্থানে যন্ত্রবাদকগণের বসিবার স্থান ছিল। রংগমঞ্চের শেষ প্রান্তের নাম রংগশীর্ষ। দেবতার কণ্ঠস্বর বা কোলাহল প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার রংগমঞ্চে দেখান অসম্ভব বা অশোভন তাহারা নেপথ্যে অনুষ্ঠিত হইত। ছোটনাগপুরের রামগড় পর্বতে একটি গুহাকৃতি রংগালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 'নাট্যশাস্ত্র' অনুসারে রংগালয় হইবে দ্বিতল এবং গুহাকৃতি।

নটনটী

নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়কারীকে সাধারণতঃ 'নট বলা হয়। ইহাকে 'ভরত' নামেও অভিহিত করা হইত। নাটকান্তে 'ভরতবাক্য'টি ভরত বা নটগণ কর্তৃকই উক্ত হইত।

১. *Sanskrit Drama*, পৃঃ ৩৬৯।

প্রধান নটের নাম ছিল সূত্রধার[১] তিনিই রঙ্গাধ্যক্ষ বা stage-manager। নাট্যাচার্য হিসাবে ইহার কাজ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সেইজন্যই তাঁহাকে হইতে হইত সুশিক্ষিত, নাট্যপ্রয়োগে নিপুণ, কাম ও নীতি-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ।[২] বিদূষক, নাট্যকার, গায়ক, বাদক প্রভৃতি অনেক লোক সূত্রধারের সহায়ক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূত্রধারের ন্যায় গুণসম্পন্ন এক ব্যক্তি; ইঁহাকে বলা হইত 'পারিপার্শ্বিক'। সূত্রধারের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট অপর এক ব্যক্তিকে বলা হইত স্থাপক।[৩] ইঁহার কাজ ঠিক কি ছিল বলা কঠিন।

অধিকাংশ নাট্যগ্রন্থের প্রস্তাবনাতে নটীর সাক্ষাৎলাভ ঘটে। স্ত্রী-ভূমিকায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই অভিনয় করিতেন। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম যে ঘটিত, তাহারও প্রমাণ আছে।

নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ভাষা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে সমাজে নটনটীরা হেয় বলিয়া বিবেচিত হইত। নটদিগকে 'জায়াজীব[৪] বলিয়া অবজ্ঞা করা হইত। 'মনুসংহিতা' (৮।৩৬২), 'মহাভাষ্য' (৬-১-১৩) প্রভৃতিতে নটনটীদের প্রতি অবজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়। বারনারীরা অনেক সময়ে নটীর কাজ করিত। 'মৃচ্ছকটিকে' গণিকা বসন্তসেনাকে নাট্যকলায় নিপুণা দেখা যায়; তাহার গৃহে অনেক নারীই এই কলা শিক্ষা করিত। 'দশকুমারচরিতে' বারবণিতার গুণাবলীর মধ্যে দণ্ডী নাট্যকলা-কুশলতার উল্লেখ করিয়াছেন।

দর্শকমণ্ডলী

কোন নাটকের সার্থকতা শুধু রচনাকৌশল বা অভিনয়-নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করে না। ইহার জন্য সহৃদয় দর্শকমণ্ডলীরও প্রয়োজন; এই সম্বন্ধে 'নাট্যশাস্ত্র'কার সচেতন ছিলেন। তাঁহার মতে, প্রেক্ষকের বা সামাজিকের তীক্ষ্ণ বিবেচনাশক্তি ও নাটকে অভিনীত চরিত্রের ভাবকে স্বীয়ভাবের ন্যায় উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। প্রেক্ষকের এই সমস্ত ভাব হাস্য, অশ্রুপাত, করতালি, আসন হইতে অকস্মাৎ উত্থান প্রভৃতিতে ব্যক্ত হইবে। দর্শকগণের চিত্তে রসোদ্বোধনই যেমন অভিনয়ের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের মধ্যে রসোদ্রেকের বহিঃপ্রকাশেই তেমন ইহার সার্থকতার লক্ষণ। দর্শক সম্বন্ধে 'নাট্যশাস্ত্রোক্ত

১. সূত্রধাব অর্থাৎ যিনি সূত্র ধাবণ কবেন। নাট্যগ্রন্থে প্রযুক্ত এই শব্দটি হইতে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, পুতুল-নাচ হইতেই নাট্য-কলার উৎপত্তি। পুতুল-নাচে যে সুতা দিয়া পুতুলগুলি বাঁধা থাকিত, সেই সুতাটি যিনি ধারণ করিয়া পুতুল-গুলি চালাইতেন তাঁহার নাম সম্ভবতঃ ছিল সূত্রধাব।

২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'নাট্যশাস্ত্র'—৩৫।৪৫-৫০।

৩. কেহ কেহ মনে করেন, এই শব্দটিও পুতুল-নাচ হইতে আসিয়াছে। যিনি পুতুলগুলি স্থাপন করিতেন তিনিই স্থাপক।

৪. জায়া বা স্ত্রীর মর্যাদার বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন করে।

এই বিধান যে পরবর্তী কালে পালিত হইত, তাহার প্রমাণ কতক বিখ্যাত নাটকে পাওয়া যায়।১

রঙ্গালয়ে অভিনয়ের দোষগুণ বিচারের জন্য যে বিশেষজ্ঞগণের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, তাঁহাদিগকে বলা হইত 'প্রাশ্নিক'।

রঙ্গমণ্ডপে সভাপতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন; তাঁহার আদেশেই অভিনয়-কার্য সম্পন্ন হইত।

সাধারণ লোকজনের মধ্যে রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার কাহাদের ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, শূদ্র দর্শক প্রেক্ষাগৃহে থাকিতে পারিত। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক, নাস্তিক, মূর্খ এবং নীচ-জাতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে নিষেধ আছে২।

---

১. 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'র প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন,
"অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্।.......
আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

২. Keith: *Sanskrit Drama*,. পৃঃ ৩৭০-৩৭১।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

গাছপালা ও লতাগুল্মাদির সঙ্গে মানুষের পরিচয় আবহমান কালের। সভ্যতার আলোক লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উদ্ভিজ্জকে নিজের নানাপ্রকার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতও মানুষের প্রাণধারণের নানা উপকরণ উদ্ভিদ্‌-জগতে আবিষ্কার করিয়াছিল। উদ্ভিদ্‌ হইতে লব্ধ ঔষধের সাহায্যে রোগের প্রতিকার বৈদিক যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। কৃষিকার্যের প্রশংসায় বৈদিক ঋষি পঞ্চমুখ।[১] আর্যগণের বিশ্ববিশ্রুত সভ্যতা অরণ্যের আশ্রমাঙ্কেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। গাছপালার ঋণ আর্য ঋষি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন[২]।

পরবর্তী কালের কাব্যনাটকাদিতে প্রাকৃতিক বর্ণনায় এবং মানবজীবনের সহিত প্রকৃতির নিবিড় যোগের কল্পনায় উদ্ভিদ্‌ জগতের স্থান প্রধান। বৃক্ষাদির প্রাণস্পন্দনও প্রাচীন ভারতবাসী অনুভব করিয়াছিল; ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় 'মনুসংহিতা'য়[৩] (আঃ ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ)। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র (১০।৯৭।২১) হইতে মনে হয়, বৈদিক যুগেও আর্যগণের নিকট এই রহস্য অজ্ঞাত ছিল না। 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বে (১৮৪ অধ্যায়ে) অনুরূপ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। তবে আয়ুর্বেদ, কৃষিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রাদিতে এই বিজ্ঞানের নানা শাখার সহিত ভারতবাসীর পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃক্ষায়ুর্বেদ, বনস্পতিবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্তর্গত বিষয়সমূহকেই সূচিত করে। বিবিধ লতাগুল্ম ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ভেষজবিদ্যা নামেও অভিহিত হইত। নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশসমূহ[৪] হইতে প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(গ্রন্থগুলির নাম কালানুক্রমে লিখিত)

---

১. দ্রঃ—গিরিজা মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ—Genesis and Development of plant sciences in Ancient India (Proceedings of the 13th. All India Oriental Conference, 1946).

২. শতং বো অবং ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ।
অধাশতক্রত্বা যূয়মিবং মে অগদং কৃত॥ ঋগ্বেদ ১০।৯৭।২।
ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরূপ ব্রুবে॥ ঐ—১০।৯৭।৪।

৩. ১।৪৯—অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।

৪. শুধু প্রধান গ্রন্থগুলির নামই লিখিত হইল। গ্রন্থসমূহের যে যে অংশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটিমাত্র স্থান নির্দেশিত হইল।

ঋগ্বেদ (আঃ খৃষ্টপূর্ব ২৫০০-২০০০)

১০।৯৭।১৫, ২১; ১০।১১৭; ১০।১৪৫ ইত্যাদি।

অথর্ববেদ (আঃ ২০০০-১৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ)

২।৮।৩; ৮।৭; ১০।৭।৩৮; ১১।৬।১০ ইত্যাদি।

উপনিষদ্‌-যুগ (আঃ খৃষ্টপূর্ব ১০০০-৬০০)

বৃহদারণ্যক—৩।৯; ৪।৬।১।

ছান্দোগ্য—১।১।২; ৬।১২।১, ২।

মহাভারত (বর্তমানরূপ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে১)

শান্তিপর্ব (১৮৪ অধ্যায়)

পুরাণ (প্রাচীন পুরাণগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত২)

অগ্নিপুরাণ—অধ্যায় ১৩, ৭০,১৯৪,২৪৬, ২৪৮ ২৮১, ২৮২।

পদ্মপুরাণ—অধ্যায় ২৬।

মৎস্যপুরাণ—অধ্যায় ৫৯, ১৫৪, ২২৭। ৯১-৯৫, ২৫৫, ২৫৬।

বরাহপুরাণ—গোকর্ণমাহাত্ম্য।

বিষ্ণুপুরাণ—৪।২৫, ৭।৩৭-৩৯।

ভাগবতপুরাণ—(খৃ ১০ম শতক৩)—৩য় স্কন্ধ—১০।১৯, ২০।

মনুসংহিতা (বর্তমানরূপ—খৃঃ পূঃ ২০০-২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত৪)

১।৪৬-৪৯, ৪।৭৩।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়৫)

দ্বিতীয় অধিকরণ—চতুর্বিংশ অধ্যায় (সীতাধ্যক্ষ)।

বৃহৎসংহিতা (বরাহমিহির কৃত) (আঃ খৃঃ পূঃ প্রথম শতক৬)

অধ্যায় ৫৩, ৫৪, ৫৮।

চরক-সংহিতা (আঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতক৭)

সূত্রস্থান—১।৩৬, ৩৭; চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শারীরস্থান—৩। ২২-২৬।

কল্পস্থান—৫।৩।

সুশ্রুত-সংহিতা (চরকের পরবর্তী; কিন্তু ঠিক কাল অনির্ণীত৮)

---

১. Winternitz: History of Indian Literature, Vol I, p. 465.
২. ঐ, p. 525.
৩. ঐ, p. 556.
৪. P. V. Kane: History of Dharmas'astra, I, p. 151.
৫. ঐ, পৃঃ ১০৪।
৬. Keith: A History of Sanskrit Literature, p. 528.
৭. প্রচলিত ধারণা—এই গ্রন্থ কণিষ্কের সমসাময়িক। উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫০৬।
৮. ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৫০৬।

সূত্রস্থান—১।২৩; ৩৫।৩৪-৪২; অধ্যায় ৩৮।

শারীরস্থান—২।৩৩; ৩।১৮; ৪।২০-২৩।

কামসূত্র (বাৎস্যায়নকৃত) (আঃ ৫০০ খৃষ্টাব্দ[১])

অমরকোষ (আঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক[২])

বনৌষধিবর্গ, ১৩৫।

ভূমিবর্গ, ৮

কামন্দকিনীতিসার (আঃ ৭০০ খৃষ্টাব্দ[৩])

১৪।২৭-৪২।

কৃষিপরাশর (আঃ খৃষ্টীয় ৫ষ্ঠ হইতে ১১শ শতকের মধ্যবর্তী[৪])

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক[৫])

উপবনবিনোদ নামক অধ্যায়।

শুক্রনীতি (কাল নির্ণীত হয় নাই। ইহা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে।)

৪।২।৫৬ ৫৭; ৪।৪।৯১-১০৮, ১১৩-১১৪, ১২৩-১২৪।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও, হেমচন্দ্রের 'নিঘণ্টুশেষ', বুদ্ধঘোষের 'সুমঙ্গলবিলাসিনী' নামক টীকা এবং 'ধন্বন্তরিনিঘণ্টু' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতেও উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষযক নানা তথ্য পাওয়া যায়[৬]।

উক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশসমূহে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে যে তথ্যাবলী নিহিত আছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রণালী অনুসারে বিষয়গুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—

১। গাছপালার অঙ্গসংস্থান (Morphology),

২। গাছপালার শারীরবিজ্ঞান (Plant Physiology),

৩। গাছপালার শ্রেণীবিভাগ (Classification),

৪। গাছপালার স্বাভাবিক পরিবেশ (Ecology),

৫। বিবিধ (Miscellaneous).

১। গাছপালার অঙ্গসংস্থান

এই বিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত—বহিরঙ্গ (external morphology) ও অন্তরঙ্গ (internal morphology বা Histology)। এই উভয়বিধ

১. ঐ, পৃঃ ৪৬৯।
২. ঐ, পৃঃ ৪১২।
৩. Keith : A History of Sanskrit Literature, P. 463.
৪. দ্রঃ—S. C. Banerjee : Krisi-parashara—a work on Agriculture, Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1955.
৫. দ্রঃ—G. P. Majumdar : Upavana-vinoda, p. 1.
৬. অন্যান্য গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য B. N. Seal : Positive Sciences etc., p. 169.

ব্যাপার সম্বন্ধে সে-যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানিগণ সচেতন ছিলেন। গাছ-পালার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় সর্বপ্রথম অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এই বেদে (৮।৭) বিস্তারিশাখাবিশিষ্ট ও দীর্ঘমঞ্জরীযুক্তপত্রবিশিষ্ট প্রভৃতি নানা আকারের বৃক্ষের উল্লেখ আছে। গাছের অঙ্কুর, মূল, নাল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের কথা 'বিষ্ণুপুরাণে' (৭।৩৭-৩৯) পাওয়া যায়। গাছের উপরে যে পরগাছা জন্মে, তাহা প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। সুশ্রুতের সূত্রস্থানে (অধ্যায় ৪৬) ছত্রাকের (mushroom) উল্লেখ আছে। ছত্রাকার বলিয়া ইহাকে 'ছত্রাক' বলা হইত। 'পত্র' শব্দটি পতনার্থক 'পৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। একপত্র, দ্বিপত্র, ত্রিপত্র, সপ্তপর্ণ প্রভৃতির উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে একক ও সংযুক্ত এই দ্বিবিধ পত্রই তৎকালে বিদিত ছিল। আকৃতি অনুসারে পত্রের অশ্বপর্ণক (Shorea robusta), মূষিকপর্ণী (Salvinia) প্রভৃতি নামকরণও প্রচলিত ছিল।

পুষ্পের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন শব্দে প্রকাশিত হইত। যেমন, অস্ফুটাবস্থায় ইহাকে বলা হইত কোরক, কলিকা; স্ফুটমানাবস্থায় ইহার নাম ছিল কুট্মল, মুকুল, পূর্ণবিকশিত অবস্থায় ইহাকে অভিহিত করা হইত বিকচ, স্ফুট প্রভৃতি শব্দের দ্বারা।

বীজের বিভিন্ন অংশ যে তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না, বীজকোশ (seed vessel), শস্য (endosperm) ও বীজপত্র (cotyledon) প্রভৃতি শব্দই তাহার প্রমাণ।

উদ্ভিদের অন্তরঙ্গ (Gross Histology) সম্বন্ধে সে-যুগে জ্ঞান খুব স্পষ্ট ছিল। গাছের ভিতরকার কাষ্ঠ ও সার-এর অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতীয়েরা জানিতেন। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে (৩য় অধ্যায়—নবম ব্রাহ্মণ) মানুষের শরীরের সঙ্গে বৃক্ষের সাদৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মানুষের অস্থি, মাংস, মজ্জা ও স্নায়ু যথাক্রমে বৃক্ষের দারু (=কাঠ), শকর (বা, বৃক্ষ-ত্বক্ এর অব্যবহিত পরের অংশ), মজ্জা (pith) ও কিনাত (fibrous tissue) সদৃশ। ষড়দর্শনের টীকায় গুণরত্ন বলিয়াছেন যে, ঔষধপ্রয়োগে মানবদেহের ন্যায় বৃক্ষশরীরেরও ক্ষত ।দ দূর করা যায়।

২। গাছপালার শারীরবিজ্ঞান (Plant Physiology)

গুণরত্নের 'ষড়্দর্শন সমুচ্চয়-টীকায় বলা হইয়াছে, দুগ্ধ ব্যঞ্জনাদি আহারে যেমন মানবদেহ পরিপুষ্ট হয়, তেমনই জল এবং উর্বরভূমি দ্বারা বৃক্ষাদির পুষ্টিসাধন হ'য়া থাকে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে মানুষের শরীরের ন্যায় বৃক্ষশরীরও রোগাক্রান্ত হয়। সংস্কৃতে বৃক্ষের অপর নাম 'পাদপ', অর্থাৎ পাদ ক লের দ্বারা যে (রস) পান করে। বৃক্ষের মূল মানুষের মুখের অন ।। উদ্ভিদ্ কর্তৃক খাদ্যগ্রহণ, উদ্ভিদ্দেহের

বিভিন্ন অংশে খাদ্য প্রেরণ ও খাদ্যের জীর্ণীকরণ প্রভৃতি প্রণালী এবং ইহাতে বায়ুর অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য—এই সমস্ত বিষয় 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বে (১৮৪ অধ্যায়ে) চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে। এই প্রণালী সম্পূর্ণরূপে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।১

প্রাচীন ভারতে বৃক্ষরোপণের নানারূপ বিধিনিষেধ ছিল। 'অর্থশাস্ত্র', 'বৃহৎসংহিতা' ও 'অগ্নিপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিধিনিষেধগুলি আছে। রোপণকালে নক্ষত্রের প্রভাবের উপর বৃক্ষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিত বলিয়া প্রাচীন ভারতবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন।২ বিভিন্ন প্রকার চারাগাছের রোপণের জন্য বিভিন্ন সময় প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। 'বৃহৎসংহিতা'র মতে, অজাতশাখ বৃক্ষের রোপণের সময় শিশির-কাল, জাতশাখেব হেমন্ত এবং সুস্কন্ধের অর্থাৎ, যাহার শাখা বেশ পুষ্ট হইয়াছে তাহার. প্রশস্ত রোপণকাল বর্ষা। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপাদন ছাড়াও, বৃক্ষের ছিন্ন শাখা রোপণ করিয়া বা এক বৃক্ষের শাখার সঙ্গে অন্য বৃক্ষের শাখা একত্র করিয়া বৃক্ষ উৎপাদন করার প্রণালীও প্রাচীন ভাবতে সুবিদিত ছিল। বৃক্ষশাখা রোপণ করিয়া যে বৃক্ষ উৎপাদিত হইত 'বৃহৎ-সংহিতা'য় তাহাকে বলা হইয়াছে 'কাণ্ডবোপ্য'। দুইটি বৃক্ষের শাখা একত্র করিয়া উত্তম বৃক্ষ উৎপাদিত হইত। এই প্রণালী দুইরূপ ছিল। একটি বৃক্ষের শাখাকে অপর কোন বৃক্ষের মূলদেশের বা কাণ্ডেব সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইত। একটি বৃক্ষের মূল অপর বৃক্ষেব মূলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থে রোপণকালে বৃক্ষগুলির মধ্যে উপযুক্ত অন্তর বা ব্যবধান রাখিবার বিধান আছে৩। চারা-গাছের পুষ্টির জন্য উহাতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে. জল সিঞ্চনের উপযুক্ত সময় গ্রীষ্মে সকাল ও সন্ধ্যা, শীতে অপরাহ্ণ এবং বর্ষায় শুধু যখন মাটি শুকাইয়া যায় তখন।

ভূমি হইতে বৃক্ষ খাদ্য গ্রহণ করে বলিয়া প্রাচীন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ ভূমিকে সরস ও উর্বর করিবার নানাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 'বৃহৎসংহিতা', 'অগ্নিপুরাণ' ও 'উপবনবিনোদ'এ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিধান আছে। ভূমির উর্বরতা-বিধায়ক নিয়ম সম্ভবতঃ 'অথর্ববেদে'ই৪ সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উর্বরতাবর্ধক অন্যতম প্রধান দ্রব্য নিম্নলিখিত দ্রব্য-গুলির মিশ্রণঃ—তিল, ছাগবিষ্ঠা, যবচূর্ণ, গোমাংস ও জল। প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই অবশ্য মাত্রা নির্দিষ্ট আছে। গোময় বা শকৃৎ অথবা করীষও

১. দ্রঃ—G. P. Majumdar : *Vanaspati* পৃঃ ৩১-৩৩।
২. 'বৃহৎসংহিতা'—অধ্যায়৫৪।
৩. যথা—অগ্নিপুরাণ—২৮১/৮-৯।
৪. ২/৮/৩।

বহু প্রাচীনকালে ভূমির উর্বরতাবর্ধক বলিয়া বিবেচিত হইত। বীজের রক্ষণ সম্বন্ধে 'বৃহৎসংহিতা'তে বিস্তৃত নিয়মাবলী আছে। ঘৃতমিশ্রিত বীজগুলি হাতে লইয়া ঐগুলিকে দুগ্ধে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরের দিন বীজগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে। উপর্যুপরি দশদিন এইরূপ করিয়া বীজগুলিকে গোময়লিপ্ত করিয়া এবং শূকর বা মৃগমাংস-পূর্ণ ভাণ্ডে ঐগুলিকে উত্তপ্ত করিয়া ঐ মাংস সহ বপন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে বীজগুলি কুসুমযুক্ত বৃক্ষে পরিণত হইবে। পত্রবহুল বৃক্ষের জন্য বীজ-প্রস্তুতির স্বতন্ত্র প্রণালী লিখিত আছে। বৃক্ষের, বিশেষতঃ আম্রবৃক্ষের, পুষ্টির জন্য 'মৎস্যোদক' সেচনের বিধান 'অগ্নিপুরাণে' (১৯৪ অধ্যায়) আছে।

'বৃহৎসংহিতা'র 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' অধ্যায়ে বরাহমিহির বৃক্ষব্যাধির চিকিৎসাপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে (২৮১ অধ্যায়) এবং 'উপবনবিনোদে' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গুণরত্ন তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, মানবদেহে যেমন নানাপ্রকার রোগ হয় এবং তাহার চিকিৎসা হয়, তেমনই উদ্ভিদ্-শরীরেও ব্যাধি জন্মিতে পারে এবং তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। উত্তাপের অতিশয় বৃদ্ধি বা হ্রাস, বায়ুর প্রবলতা প্রভৃতি বৃক্ষরোগের কতক কারণ। পত্রের পীতবর্ণতা, মুকুল বা কলিকার অপুষ্টি শাখার শুষ্কতা এবং বৃক্ষক্ষীরের ক্ষরণ ইত্যাদি রুগ্ন বৃক্ষের কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ। বৃক্ষের ফলহীনত্ব (barrenness) দূরী-করণের জন্য কুলত্থ, (Dolichos biflorus), মাষ (Phaseolus radiatus var Roxburghii), মুদ্গ (Ph. mungo), তিল (Sesamum indicum) এবং যবের (barley) ক্বাথ বৃক্ষমূলে দিবার ব্যবস্থা আছে। রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বৃক্ষমূলে ঘৃতমিশ্রিত কর্দম ও জলমিশ্রিত দুগ্ধ ও মৎস্যমাংসমিশ্রিত বিড়ঙ্গ (Embelia ribes) প্রভৃতি বৃক্ষমূলে দিবার বিধান দেখা যায়।

ধর্মোত্তরের 'ন্যায়বিন্দু-টীকায়, ও উদয়নের 'কিরণাবলী'তে উদ্ভিদের নিদ্রা,[১] জাগরণ, স্পর্শে প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপারের উল্লেখ আছে। গুণরত্ন স্বীয় টীকায় লজ্জাবতী (Mimosa pudica) জাতীয় লতাগুল্মের স্পর্শ-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যেমন পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয় সূর্যোদয়ে এবং কুমুদ বিকশিত হয় চন্দ্রোদয়ে, তেমনই কতক পুষ্প বিশেষ কোন সময়ে প্রস্ফুটিত হয়।

কোন কোন গ্রন্থে[২] মানব শরীরের বিভিন্ন অবস্থার ন্যায় বৃক্ষেরও

১. স্বাপঃ রাত্রৌ পত্রসংকোচঃ—রাত্রিতে পত্রের আকুঞ্চনকেই কেহ কেহ বৃক্ষের নিদ্রা বলিয়াছেন।

২. যথা, গুণরত্নের টীকা।

শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। বৃক্ষের দীর্ঘতম পরমায়ু দশহাজার বৎসর বলিয়া গুণরত্ন বলিয়াছেন। ব্যাধি ও খাদ্যাভাব বৃক্ষ-মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, উদ্ভিদের চেতনা-শক্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরা সচেতন ছিলেন। সুদূর অতীতে ঋগ্বেদেও[১] এই জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। 'ভাগবতে'[২] উদ্ভিদের তিনটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে —(১) উৎস্রোতসঃ,[৩] (২) অব্যক্তচৈতন্যাঃ ও (৩) অন্তঃস্পর্শাঃ[৪]। উদয়ন বলেন যে, উদ্ভিদের 'অতিমন্দ অন্তঃসংজ্ঞা' আছে। মহাভারতের শান্তি-পর্বে কথিত হইয়াছে যে, শীত, উষ্ণ, বজ্রধ্বনি, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।

স্ত্রীপুরুষ সংযোগে উদ্ভিদ্-জগতে সৃষ্টির সম্বন্ধে তৎকালে একটা ধারণা ছিল বটে· সেই ধারণা খুব বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয় না। গাছ-পালাকে যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা হয় নাই। চরকের মতে[৫], কুটজের স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইটি শ্রেণীবিভাগ আছে। যাহাদের সাদা ফুল ও বৃহৎ ফল হয়, তাহারা পুংজাতীয়। যাহাদের লাল অথবা হলুদ রঙের ফুল এবং ক্ষুদ্র ফল হয়, তাহারা স্ত্রীজাতীয়।

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শস্য উৎপাদনের (rotation of crops) রীতির উল্লেখ সুপ্রাচীন 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'য় (৫·১·৭·৩৭) রহিয়াছে।

৩। গাছপালার শ্রেণীবিভাগ (Classification)

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাহা এই যে, প্রাচীন ভারতে বৃক্ষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইত তাহা ছিল সাধারণতঃ দ্বিবিধ—পরিচয়-জ্ঞাপিকা ও গুণপ্রকাশিকা[৬]। যেমন, কোন একটি গাছের ফুল বাঁকা হইলে উহাকে বলা হইত 'বক্রপুষ্প' (Sesbania grandiflora)। আবার, উহাতে স্ফোটকাদি দূর করিবার উপযুক্ত পদার্থ ছিল বলিয়া উহাকে 'ব্রণারি' আখ্যাও দেওয়া হইত।

১. ১০/৯৭/২১।
২. ৩।১০।১৯, ২০।
৩. যাহারা নীচ হইতে উপরে খাদ্য নেয়।
৪. উদ্ভিদের চেতনা সম্বন্ধে দ্রঃ G. P. Majumdar : *Vanaspati*, পৃঃ ৫৩-৫৮।
৫. Vanaspati, পৃঃ ৫৮-৬১।
৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—G. P. Majumdar: Vanaspati, পৃঃ ৭৬-৭৮।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে গাছপালার নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়ঃ—

(ক) উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুযায়ী ভাগ,

(খ) গুণাগুণ হিসাবে ভাগ,

(গ) খাদ্য পানীয় হিসাবে ভাগ।

(ক) উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুযায়ী ভাগ[১]

আর্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে গাছগুলিকে সাধারণভাবে ফলিনী, অফলা ও অপুষ্পা, পুষ্পিণী প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে[২]। ঐ গ্রন্থে বৃক্ষ, গুল্ম ভেষজ ও লতা—উদ্ভিদের এই চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগও দেখা যায়।

ধর্মসূত্রসমূহে অনেক গাছপালার নাম পাওয়া যায়। যদিও ধর্মসূত্র-গ্রন্থগুলিতে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় নাই, তথাপি ওষধি ও বনস্পতি ভেদে দুইটি মোটামুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। 'বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে'র টীকাকার গোবিন্দস্বামী ওষধির দুইটি উপবিভাগ করিয়াছেন; যথা—বল্ল্যোষধি ও তৃণৌষধি। কুলত্থাদি তাঁহার মতে বল্ল্যোষধির অন্তর্গত এবং ব্রীহি প্রভৃতি তৃণৌষধিশ্রেণীভুক্ত।

'মনুসংহিত'য়[৩] উদ্ভিদের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ আছেঃ—

(১) ওষধি—যাহা ফল পাকিলে মরিয়া যায়,

(২) বনস্পতি—যাহার ফুল না হইয়া ফল হয়,

(৩) বৃক্ষ (যাহার কেবল ফুল অথবা ফল হয়),

(৪) গুচ্ছ (যাহা গুচ্ছাকারে জন্মে),

(৫) গুল্ম,

(৬) তৃণ,

(৭) প্রতান (বিস্তারিণী লতা),

(৮) বল্লী (যে লতা গাছ বা অপর কোন আশ্রয়কে বেষ্টন করিয়া থাকে)।

চরকের (সূত্রস্থান—১।৩৬, ৩৭) মতে গাছপালা চারিপ্রকারঃ—

(১) বনস্পতি—ফুল না হইয়া যাহার ফল হয়,

(২) বানস্পত্য—ফুল হইয়া যাহার ফল হয়,

(৩) ঔষধি—মনুর ওষধির অনুরূপ,

১. এখানে কয়েকটিমাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। বিস্তৃত বিবরণের জন্য উক্ত Vanaspati নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৭৯-৮৯)।

২. ঋগ্বেদ—১০/৯৭/১৫।

৩. ১/৪৬-৪৮।

(৪) বীরুধ্—লতাগুল্মাদি।

চরকের টীকায় চক্রপাণি 'লতা' ও গুল্ম' ভেদে বীরুধ্-এর দ্বিবিধ ভাগ করিয়াছেন।

সুশ্রুতকর্তৃক প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ চরকের অনুরূপ।

'ভাগবতোক্ত (৩/১০/১৯) শ্রেণীবিভাগ এইরূপঃ—

(১) বনস্পতি—পূর্ববৎ,

(২) ওষধি—পূর্ববৎ,

(৩) লতা—আশ্রয়ে বেষ্টনকারী,

(৪) ত্বক্সার—যাহাদের ত্বক্ খুব কঠিন; যেমন, বাঁশ,

(৫) বীরুধ—গুচ্ছাকার গুল্ম,

(৬) দ্রুম—যাহার ফুল ও ফল দুইই হয়।

'উপবনবিনোদে' গাছপালাকে বনস্পতি, দ্রুম, লতা ও গুল্ম—এই চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনে পণ্ডিত প্রশস্তপাদ নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

(১) তৃণ, (২) ঔষধি, (৩) লতা, (৪) অবতান,[১] (৫) বৃক্ষ[২] ও (৬) বনস্পতি।

'অমরকোষে'র বনৌষধিবর্গে ও বৈশ্যবর্গে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়ঃ—

(১) যে সকল গাছের ফল হয় এবং কাণ্ড আছে (কাষ্ঠদারু),

(২) ক্ষুপ—হ্রস্ব শাখা ও শিফা[৩] বিশিষ্ট; ইহাদের ফুল ও ফল দুইই হয়,

(৩) লতা,

(৪) ঔষধি,

(৫) তৃণ[৪],

(৬) তৃণদ্রুম—নারিকেল, খেজুর, শুপারি প্রভৃতি গাছ।

(খ) গুণাগুণ হিসাবে ভাগ[৫]

রোগনাশক পদার্থের অস্তিত্ব হিসাবে চরক (সূত্রস্থান—৪) গাছ-

১. গুল্ম।

২. যাহাতে ফুল ও ফল উভয়ই হয়।

৩. মূল।

৪. বাঁশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৫. প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত রোগনাশক উদ্ভিদ্সমূহের নামের জন্য দ্রষ্টব্য 'ভারতীয় বনৌষধি' নামক গ্রন্থ।

পালাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) বিরেচন, (purgative) ও (২) কষায় (astringent)। প্রথম প্রকারের গাছগাছড়ার সংখ্যা তাঁহার মতে ৬০০ এবং দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যা ৫০০। তিনি কষায় শ্রেণীর প্রধান ৫০টি গাছপালাকে আবার ১০টি 'বর্গে' বিভক্ত করিয়াছেন[১]। সুশ্রুত (সূত্রস্থান—৩৮) সমস্ত গাছগাছড়াকে ৩৭টি 'গণে' বিভক্ত করিয়াছেন।

(গ) খাদ্য পানীয় হিসাবে ভাগ

খাদ্যমূল্যে হিসাবে চরক (সূত্রস্থান—২৮) উদ্ভিদ্‌কে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছেন[২]ঃ—

(১) ধান্যবর্গ (Graminaceae)—যে সমস্ত শস্যের খোসা (husk) আছে; যথা ধান, যব, গম ইত্যাদি। এই জাতীয় শস্যগুলির আবার শালি, ব্রীহি, যব, গোধূম প্রভৃতি এগারটি উপবিভাগ করা হইয়াছে।

(২) শমীধান্যবর্গ (Leguminoseae)—মুগ, মাষ প্রভৃতি বার প্রকার শস্য ইহার অন্তর্গত। তিলও এই জাতীয়।

(৩) শাকবর্গ—আঠার প্রকার শাক এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৪) ফলবর্গ।

(৫) হরিৎ বর্গ (সবুজ শ্রেণী)—আর্দ্রক (Zingiber officinale), মূলক (Raphanus Sativus), পলাণ্ডু ও লশুন (Allium cepa ও Allium sativum) প্রভৃতি বহুপ্রকার জিনিষ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) আহারযোগী বর্গ—তিল, সর্ষপ, এরণ্ড, পিয়াল, অতশী, কুসুম্ভ প্রভৃতির তৈল এই শ্রেণীভুক্ত।

সুশ্রুত (সূত্রস্থান), গাছপালাকে খাদ্য হিসাবে ১৫টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) শালিধান্য, (২) ষষ্টিক, (৩) ব্রীহিধান্য, (৪) কুধান্যবর্গ, (৫) বৈদল, (৬) তিল, (৭) যব, (৮) শিম্ব, (৯) ফলবর্গ, (১০) শাকবর্গ, (১১) পুষ্পবর্গ, (১২) উদ্ভিদ্‌বর্গ, (১৩) কাণ্ডবর্গ, (১৪) তৈলবর্গ, (১৫) ইক্ষুবর্গ।

১. দ্রষ্টব্য *Vanaspati*, পৃঃ ৯০-৯৮।

২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ১০৫-১২৭।

'অমরকোষের বনৌষধিবর্গ ও বৈশ্যবর্গে' খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য হিসাবে নানা-প্রকার শস্য ও মসল্লার উল্লেখ আছে।

'ভাবপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে ঃ—

(১) হরীতক্যাদিবর্গ (Myrobalan group),
(২) কর্পূরাদিবর্গ (Camphor group),
(৩) গুড়ূচ্যাদিবর্গ (Tinospora group),
(৪) পুষ্পবর্গ (Flower group),
(৫) বটাদিবর্গ (Banyan group),
(৬) আম্রাদিফলবর্গ,
(৭) ধান্যবর্গ,
(৮) শাকবর্গ
(৯) তৈলবর্গ,
(১০) ইক্ষুবর্গ।

৪। গাছপালার স্বাভাবিক পরিবেশ (Ecology)

জলবায়ু ও জমির প্রকৃতির উপর উদ্ভিদের জন্ম ও পুষ্টি নির্ভর করে। প্রকৃতি অনুসারে চরক (কল্পস্থান—১) জমির নিম্নলিখিত শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রতি শ্রেণীতে জাত বিশেষ কতক প্রকার উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

১। জাঙ্গল (ঊষর ভূমি)—এইরূপ জমিতে যে শ্রেণীর উদ্ভিদ্ জন্মে তাহাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাম Xerophytes; যথা—খদির (Acacia catechu), সাল (Shorea robusta), বদরী (Zizyphus jujuba) ইত্যাদি।

২। অনূপ ('জলপূর্ণ')—এইরূপ স্থানে জন্মে Hydrophytes ও Hygrophytes জাতীয় উদ্ভিদ্, যথা—হিন্তাল (Phoenix paludosa)।

৩। সাধারণ—Mesophytes জাতীয় উদ্ভিদ্ এইরূপ অঞ্চলে জন্মে; যথা—বনস্পতি ও বানস্পত্য[১] ইত্যাদি।

সুশ্রুতও (সূত্রস্থান—৩৫) জমির অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। 'বৃহৎসংহিতায় (অধ্যায় ৫৪) ও 'অমরকোষে'র স্বর্গবর্গে উদ্ভিদের স্বাভাবিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 'উপবনবিনোদে'ও জমিকে উক্ত প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১. এই জাতীয় উদ্ভিদের বর্ণনা গাছপালার শ্রেণীবিভাগে দেওয়া হইয়াছে।

৫। বিবিধ

প্রচীন ভারতবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির মধ্যে উদ্ভিদ্ অগ্রজ; তাহার পরে জীবজগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহাদের এই ধারণার প্রমাণ যে-সমস্ত গ্রন্থে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'১ ও 'রামায়ণ'২।

প্রাচীনকালে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শুধু শিক্ষণীয় একটি শাস্ত্র বলিয়াই পরিগণিত হইতনা; এই বিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনে নানারূপে প্রয়োগও করা হইত। এই বিদ্যার সাহায্যে শস্যের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি, সুলভত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ করা হইত।৩ উদ্ভিদের কতক লক্ষণ হইতে ভবিষ্যৎ অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির জ্ঞানলাভ করা হইত। উদ্ভিদ্ জগতের জ্ঞান কৃষিকর্মে পদে পদে কাজে লাগিত।

উপসংহার

প্রচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে এইটুকু বোঝা গেল যে, আধুনিক যুগে উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে যে যে বিষয় আলোচ্য, প্রচীনকালে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাই করিযাছেন। একথা অবশ্যই সত্য নহে যে, আধুনিক যুগে এই বিজ্ঞান উন্নতির যে স্তরে পৌঁছিযাছে, প্রাচীন ভারতেও ইহা এই অবস্থায়ই ছিল। এই বিজ্ঞানে ভারতের কৃতিত্ব এই যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, এমন কি প্রাচীন সভ্যদেশ গ্রীস্ এবং রোমেও, যখন এই জ্ঞানের উন্মেষই হয় নাই, ভারতবর্ষে তখনই এই বিজ্ঞানেব বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ইহার প্রধান নিদর্শন পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ।

আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসাশাস্ত্রেব উন্নতি উদ্ভিদ্‌বিদ্যাব মাধ্যমেই হইয়াছিল। গাছগাছড়াব সাহায্যে ব্যাধির চিকিৎসাব প্রমাণ পাওয়া যায় হাজার হাজার বৎসর পূর্বেব ঋগ্বেদে৪ ও অথর্ববেদে। অথর্ববেদ৫ হইতে আরম্ভ করিয়া চরক ও সুশ্রুতের যুগ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রেব যে ক্রমোন্নতি হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্‌জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসাবও হইয়াছিল।

১. ১/১/২।
২. উত্তবকাণ্ড, ৭২ সর্গ।
৩. 'বৃহৎসংহিতা'র অধ্যায় ২৯ দ্রষ্টব্য।
৪. ৩ম মণ্ডল, ১৮শ সূক্ত; ১০ম মণ্ডল, ১৪৫ সূক্ত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।
৫. ১/২, ৩, ২৩, ২৪; ২/৭, ২৫; ৪/১৭, ১৮, ২০, ৩৭; ৫/৪, ১৪, ১৫; ৬/৮৫; ১৯/৩৯ প্রভৃতি বহুস্থলে উদ্ভিদেব বিভিন্ন প্রযোগ লিপিবদ্ধ আছে। স্বাস্থ্য, পুত্রলাভ, ভূতপ্রেতেব প্রভাবেব দূরীকবণ, নানাব্যাধিব চিকিৎসা প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যেই উদ্ভিদের প্রয়োগ হইত।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সাহায্য কৃষিকর্মে কিরূপে নেওয়া হইত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'বৃহৎসংহিতা'য় এবং কৃষিপরাশর'[১] নামক গ্রন্থে।

খাদ্য, চিকিৎসা ও কৃষিকর্ম প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব্যতীতও প্রাচীন ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ্‌ ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অবদান অসীম। পোষাকপরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র, যানবাহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ধর্মকার্য প্রভৃতি সব কিছুতেই উদ্ভিদের ব্যাপক ব্যবহার হইত। এইজন্যই উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আবশ্যকতা অনুভূত হইত।[২]

আধুনিক যুগে মার্কিণ উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রবিৎ লুথাব বার্ব্যাঙ্ক বিভিন্ন উদ্ভিদের মিশ্রণে নূতন উদ্ভিদ্‌ বা উদ্ভিজ্জ বস্তু প্রস্তুত করিয়া[৩] উদ্ভিদ্‌-জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের গর্বের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌ জগতে এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া (Creation of Botanical marvels) সম্পূর্ণরূপে অবিদিত ছিল না। 'বৃহৎসংহিতা' (অধ্যায় ৫৪) এবং 'উপবনবিনোদ' ('বিচিত্রকরণম্‌' নামক অংশ) ইহাব প্রধান সাক্ষী। 'উপবনবিনোদে' বর্ণিত দুই একটি 'বিচিত্রকবণ' এইবূপ। যে বৃক্ষে নির্গন্ধ পুষ্প জন্মে, সেই বৃক্ষেব মূলে সুগন্ধি পুষ্পমিশ্রিত মৃত্তিকা দিযা ধব ও খদির গাছের ছালের ক্বাথ সেচন কবিলে এবং উহা চন্দনলিপ্ত করিয়া উহাতে ঘৃত ও ধূপ-ধূম প্রয়োগ কবিলে সেই বৃক্ষেই সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে। প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা যে-গাছে সাদা তুলা জন্মে সেই গাছেই লাল তুলা জন্মান যায়।

১. দ্রষ্টব্য ঃ—G. P Majumdar & S. C. Banerji—*Krisi-parashara*, Calcutta, 1960.

২. ভাবতীয সভ্যতায উদ্ভিদেব স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণেব জন্য দ্রষ্টব্য G. P. Majumdar: Some Aspects of Indian Civilisation.

৩. যেমন, rasp-berry ও black-berry-ব মিশ্রণে তিনি primus berry নামক ফলেব সৃষ্টি কবিযাছেন। এইরূপ অভিনব সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিববণের জন্য দ্রষ্টব্য Harwood: New Creations in Plant Life, 1905. উদ্ভিদ্‌জগতে কতক নূতন সৃষ্টি Lyseneo-ব নামের সহিতও যুক্ত আছে।

কৃষিশাস্ত্র

সভ্যতার আলোক লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কৃষিকর্মকে প্রধান উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্যই মিশর, মেসোপোটেমিয়া, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা নদ-নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাগ্‌বৈদিক সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল সিন্ধু-নদের পার্শ্ববর্তী স্থানে (Indus Valley Civilisation)। আর্যগণও সিন্ধুর আশেপাশেই সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগে আর্যগণ যে কৃষিজীবী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক দেব পূষন্ কৃষকগণের দেবতা। তিনি পশুর রক্ষক; গবাদি পশু পথভ্রষ্ট হইলে পূষন্ তাহাদিগকে যথাস্থানে নিয়া আসেন।১ অক্ষক্রীড়াসক্ত হৃতসর্বস্ব লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অক্ষক্রীড়া বর্জন করিয়া কৃষিকর্মে প্রণোদিত করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, এই কর্মের দ্বারাই বিত্ত, জায়া প্রভৃতি লাভ করা যায়২। শস্যক্ষেত্রে সেচের প্রণালী যে বৈদিক আর্যগণের অবিদিত ছিলনা, তাহারও প্রমাণ ঋগ্বেদে৩ আছে। কৃষিকর্মের অঙ্গস্বরূপ লাঙ্গল ও বৃষের উল্লেখ এই বেদে দেখা যায়৪। ঋগ্বেদের ১০/৯/২.৭ হইতে মনে হয়, এই যুগের শেষভাগে কৃষি-কার্যে ঘোড়ার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। শস্যের বীজ ও উহার বপন সম্বন্ধে ঋগ্বেদের নানাস্থানে উল্লেখ আছে৫। ঐ যুগে নানারূপ শস্যের উৎপাদন হইলেও ধান্য, গম, যব প্রভৃতি প্রধান শস্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শস্যের কর্তন ও সংরক্ষণের বিধি ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে লিপিবদ্ধ আছে৬। শস্যনাশক জীবজন্তু ও তাহাদের কবল হইতে শস্য রক্ষার প্রণালী অথর্ব-বেদের নানা স্থানেই আছে৭।

রামায়ণ ও মহাভারতে নানারূপ তথ্য পাওয়া যায়। কোন

১. ৬/৫৪ সূক্ত।
২. অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহুমন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া—ইত্যাদি। ১০/৩৪/১৩।
৩. যথা—৪/৪/১.৭; ৩/৩/৪.৩, ৭ ইত্যাদি।
৪. যথা—৪/৫/১২.১-৮; ১০/১০/৫.৭ প্রভৃতি।
৫. ১/১৭/২.২১; ১০/৯/২.৩ ইত্যাদি।
ঋগ্বেদ—৫/৬/১২.৯, ১০; যজুর্বেদ ১০৯/২।
৭. যথা—১৬৫, ২২৩ ইত্যাদি।

কোন পুরাণে কৃষিকর্মের সহিত তদানীন্তন ভারতবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়[১]।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' পাঠে কৃষিসম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়[২]। 'মনুস্মৃতি'র বিধান অনুসারে 'বার্তা' রাজার পক্ষে অবশ্যশিক্ষণীয় অন্যতম বিদ্যা[৩]; 'বার্তা' শব্দ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্তু, ঐ স্মৃতিতে দেখা যায় যে, আপদকাল ভিন্ন অন্য সময়ে কৃষিকর্ম উচ্চবর্ণের পক্ষে গর্হিত[৪]। রঘুনন্দন-ধৃত বৃহস্পতির নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেরও মর্ম অনুরূপ ঃ—

কুসীদং কৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্বীতাস্বয়ংকৃতম্।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্বন্নৈনসা লিপ্যতে দ্বিজঃ॥

'পরাশর-স্মৃতি', রঘুনন্দনের 'জ্যোতিস্তত্ত্ব' ও 'কৃত্যতত্ত্ব', মিত্রমিশ্রের 'বীরমিত্রোদয়' প্রভৃতি কয়েকখানি স্মৃতিনিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে কৃষিকর্ম আলোচিত হইয়াছে। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' নামক গ্রন্থে (অধ্যায় ২৪-২৬) কৃষিসম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে। 'শুক্রনীতি' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' এই বিষয়ে বিস্তর তথ্য বিদ্যমান। অর্থশাস্ত্রের শাসনব্যবস্থায় কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারাদির পরিচালনের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগই ছিল এবং এই বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন 'সীতাধ্যক্ষ'[৫]। 'অর্থশাস্ত্রে' কৃষিসংক্রান্ত তথ্যাবলীর মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের উল্লেখ (২/১) এবং কৃষির উন্নতিকল্পে রাজার সাহায্য দানের বিধান আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যসাহিত্যে কৃষি এবং কৃষিজাত শস্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কালিদাসের 'রঘুবংশ[৬] ও বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'[৭]।

বিখ্যাত অভিধান 'অমরকোষে'র (আঃ ৭ম/৮ম শতক) সম্পূর্ণ 'বনৌষধিবর্গ'টি নানারূপ কৃষিকর্মের সহিত তৎকালীন সমাজের পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

লক্ষ্য করিবাব বিষয় এই যে, ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শুধু প্রসঙ্গক্রমে কৃষিকর্মের উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। কৃষিবিষয়ে অন্য

১. যথা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—২/৭/১৬২, বায়ুপুরাণ—৭৯/৭১ ইত্যাদি।

২. দ্রষ্টব্য—V. S. Agrawalla-র India as known to Panini; Chap. IV, Sec. I.

৩. ৭/৪৩।

৪. ১০/৮০-৮৪।

৫. অর্থশাস্ত্র—২/১, ২৪ ও বিনয় সরকারের Positive Background of Hindu Sociology, পৃঃ ১৮০।

৬. ৪/২০-তে শালিধান্যের ও ৪/৩৭-এ কলম বা শালিবিশেষের উল্লেখ আছে।

৭. তৃতীয় উচ্ছ্বাসে ধান্যগমাদির ও এক প্রকার সেচ-প্রণালীর উল্লেখ আছে।

কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা না গেলেও অন্ততঃ একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ইহাই প্রমাণিত করে যে, যে-কৃষি জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতবাসিগণ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটির নাম 'কৃষিপরাশর', 'কৃষিকর্মবিবেচন', 'কৃষিপদ্ধতি' বা 'কৃষিসংগ্রহ'১।

গ্রন্থটি পরাশরের নামের সহিত যুক্ত হইলেও ইহার প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত। মনু, পরাশর ও গার্গ্য ভিন্ন পরবর্তী কালের অপর কোন গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের উল্লেখ ইহাতে না থাকায়, ইহা বেশ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। এই পরাশর যদি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বিংশতি 'ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকে'র২ অন্যতম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইঁহার জীবনকাল ছিল ১০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে। গ্রন্থটিতে পরাশরের নামোল্লেখ, 'পরাশরস্মৃতি'র কৃষিবিষয়ক অংশে 'কৃষিপরাশরে'র অনুল্লেখ এবং এই দুই গ্রন্থের আলোচ্য কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ের বৈষম্য প্রভৃতি হইতে ইহাদের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

'কৃষিপরাশরে' যে সকল শ্লোক আছে, তাহাদের মধ্যে কতক রঘুনন্দন কর্তৃক উদ্ধৃত 'রাজমার্তণ্ড' নামক গ্রন্থের ও বরাহমিহিরের শ্লোক হইতে অভিন্ন। 'কৃষিপরাশর'-রচয়িতা যদি 'রাজমার্তণ্ড' হইতে ঐ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কাল ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী; কারণ, 'রাজমার্তণ্ডে'র রচয়িতা ভোজের কাল খৃষ্টীয় ১০০০—১০৫৫ অব্দ৩। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, এ ক্ষেত্রে ভোজই যে 'কৃষিপরাশর'-রচয়িতার অধমর্ণ নহেন, এমন প্রমাণ নাই। যদি তাহাই হয়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ থাকিলেও তাঁহাকে খৃঃ পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কালের লেখক বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। সুতরাং, 'কৃষিপরাশর'-প্রণেতা উত্তমর্ণ হইলে তিনি খৃঃ পঞ্চম শতকের পূর্বেকার লেখক। আর, তিনি অধমর্ণ হইয়া থাকিলে তাঁহার কাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী।

উল্লিখিত যুক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'কৃষি-পরাশর'-রচয়িতার কাল যাহাই হউক, তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পরবর্তী নহেন।

১. দ্রষ্টব্য—G. P. Majumdar ও S. C. Banerji সম্পাদিত *Krisi-parashara*, Asiatic Society, Calcutta, 1960.

২. ১/১/৪-৫।

৩. দ্রষ্টব্য—P. V. Kane: History of Dharmaśāstra, Vol. I, পৃঃ ২৭৬।

গ্রন্থটি ভারতের কোন্ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কয়েকটি কারণে গ্রন্থকার উত্তর ভারতের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান এই যে, ইহাতে বলা হইয়াছে —বৃষ্টিমূলা কৃষিঃ সর্বা; অর্থাৎ, সমস্ত কৃষির মূলই বৃষ্টি। সুতরাং, বুঝা যায়, ভারতের যে-অঞ্চলে সেচ-প্রণালী প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকার হয়ত সে-অঞ্চলের লোক নহেন। এই গ্রন্থে সেচের কোন উল্লেখও নাই। 'কৃষিপরাশরে' কয়েকটি দেশী শব্দের ব্যবহার আছে; যথা—মদিকা, (=বাংলা 'মই'), কটুন (বাংলা 'কাড়ান'১), 'পচ্চানিকা' বা 'প্রাজনিকা' (=বাংলা 'পাজন'২) ইত্যাদি। দেখা যায়, উক্ত দেশী শব্দগুলির সহিত অধুনা-প্রচলিত বাংলা শব্দগুলির সগোত্র-সম্পর্ক রহিয়াছে। গ্রন্থকার কি বঙ্গ-দেশ বা তন্নিকটবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন?

উল্লিখিত দেশী শব্দগুলি ছাড়া সমগ্র গ্রন্থটি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত। রচনা প্রাঞ্জল এবং বাগ্‌বাহুল্যবর্জিত। কয়েকটি গদ্য মন্ত্র ভিন্ন গ্রন্থটি শ্লোকে রচিত। শ্লোক ছন্দ ছাড়া ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি এবং মালিনী ছন্দও গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন।

'কৃষিপরাশরে'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে কৃষির প্রশংসা করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শান্তির মূল কৃষি। ইহার পরে, কৃষি ও বৃষ্টিপাতের উপর গ্রহের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। আবর্ত, সংবর্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ ভেদে মেঘকে বলা হইয়াছে চতুর্বিধ। বৈশাখ হইতে বারমাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করিবার প্রণালী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আকস্মিক ভেকধ্বনি, অন্ডসহ গর্ত হইতে পিপীলিকা-সমূহের উদ্গমন, বিড়াল ও নকুলের ইতস্ততঃ ধাবন, পথে বালকগণ কর্তৃক ধূলির সেতুবন্ধন, ময়ূরের নৃত্য, সর্পের বৃক্ষাগ্রে আরোহণ, জলচর পক্ষীর রৌদ্রে পক্ষশোষণ প্রভৃতি সদ্যোবৃষ্টির লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পর্যবেক্ষণ ভিন্ন কৃষিকর্ম নিষ্ফল— পরাশর এই মত পোষণ করেন এবং ইহাও বলেন যে, কৃষির পর্যবেক্ষক হইবেন কর্তা স্বয়ং (স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ); এ ব্যাপারে প্রতিনিধি চলিবে না। কৃষিতে বৃষ অপরিহার্য বলিয়া বৃষপোষণের নানারূপ বিধিনিষেধ গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ আছে। গোশালা সর্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। ধূম গোবৃষাদির স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। গোশালায় মাছ-ধোয়া জল রাখা, তুলা পেঁজা, অজবন্ধন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। সকাল সন্ধ্যায় গো-চারণ অবশ্যকরণীয়।

গোময়কে শ্রেষ্ঠ সার বলিয়া প্রশংসা-পূর্বক গ্রন্থকার হল, মই, হলের

১. আগাছা কাটা।
২. গোরু তাড়নের লাঠি।

বিভিন্ন অংশ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। হলের বিভিন্ন অংশগুলির নাম —ঈষা, যুগ, স্থাণু, নির্যোল, পাশিকা, অড্ডচল্ল, শৌল, ফাল, বিন্ধক, যোত্র ও রজ্জু।

তৎপর হলপ্রসারণের উপযুক্ত শুভমুহূর্ত ও কর্ষণকালে কতক শুভাশুভ লক্ষণের আলোচনা করা হইয়াছে। দুই একটি লক্ষণ এইরূপ। হল-প্রবাহকালে ভূমি হইতে কচ্ছপ উত্থিত হইলে কৃষকের পত্নীবিয়োগ ও অগ্নিভয় সূচিত হয়। হলকর্ষণকালে একটি বৃষ ভূপতিত হইলে জ্বরাতিসার রোগে লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। বৃষের নাসিকালেহন শস্য-বৃদ্ধির সূচনা করে।

গ্রন্থকারের মতে, হেমন্তে কৃষিকার্য স্বর্ণপ্রসূ, বসন্তে তাম্র ও রৌপ্য উৎপাদক। নিদাঘে কৃষিকার্যে ধান্য লাভ হয় এবং বর্ষাগমে কৃষিকর্ম শুধু দারিদ্র্যেরই কারণ হয়।

বীজ সম্বন্ধে 'কৃষিপরাশরে' বিস্তৃত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। 'অর্থশাস্ত্রে'ও (২/২৪) বীজ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের সংখ্যা বহু। 'কৃষি পরাশরে'র উপদেশগুলি মোটামুটি এইরূপ। মাঘ ও ফাল্গুন মাস বীজ-সংগ্রহের প্রকৃষ্ট কাল। যে সকল বীজে শাঁস নাই সেগুলি বর্জনীয়। যে সকল বীজ রক্ষিত হইবে সেগুলি একরূপ হইলে অর্থাৎ মিশ্রিত না হইলে শস্য ভাল হয়। ঘৃত, তৈল, লবণ, ঘোল, প্রদীপ প্রভৃতি দ্রব্য বীজের উপরে কখনও রাখা উচিত নয়। ধূম বীজের পক্ষে ক্ষতিকর। বীজ দ্বিবিধ—বপনার্থ ও রোপণার্থ।

প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রকার কার্যেই দেবদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করা হইত। কৃষিকর্মেও এই রীতির ব্যতিক্রম নাই। শস্যধ্বংসকারী জীব-জন্তু ও কীটপতঙ্গাদি দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'কৃষিপরাশরে' কতক মন্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ব্যাপারে পবননন্দনের সাহায্যই সর্বাধিক কাম্য বলিয়া মনে হয়। তদীয় লাঙ্গুলের আস্ফালনে শস্যনাশক কীটপতঙ্গাদি দূরীভূত হওয়ার বিশ্বাস এই গ্রন্থে দেখা যায়।

উক্ত মন্ত্রাদির পরে 'কৃষিপরাশরে' নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিধান আছে:—

> ক্ষেত্র মধ্যে নলরোপণ, মুষ্টিগ্রহণ, পুষ্যযাত্রা ও নবান্ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান শস্যচ্ছেদনানন্তর শস্যের মর্দন, মাপন ও শস্যাগারে স্থাপন।

শস্যচ্ছেদনের পরে লক্ষ্মীপূজা ক্ষেত্রপতির সর্বশেষ কৃত্য বলিয়া গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন।

বাস্তুবিদ্যা

আদিম যুগের মানুষ পশুর ন্যায় গুহায় গহ্বরে, বনে জঙ্গলে বাস করিত৷ ক্রমে ক্রমে সে সভ্যতার আলোক পাইতে থাকিল, তখন শীতাতপ নিবারণ ও বন্য পশু হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতির জন্য তাহার উন্নততর বাসস্থানের প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। সে-যুগে মানুষ যখন গৃহনির্মাণের অপর কোন উপকরণ আবিষ্কার করে নাই, তখন গাছাপালার সাহায্যেই সে ঘর বাড়ী নির্মাণ করিত। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বুদ্ধিবলে মনুষ গৃহনির্মাণের বিবিধ উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিল।

কত সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীন ভারতবাসী গৃহনির্মাণকলা বা বাস্তুবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা অনির্ণেয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় যে নাগরিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতা, কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ববর্তী। সেই সভ্যতা প্রাক্-বৈদিক যুগের কিম্বা বৈদিক যুগের, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। কিন্তু, সিন্ধুসভ্যতায় গৃহনির্মাণকৌশলের যে পরিচয় বর্তমানে আমরা পাই তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ কৌশল অতি অল্পকালে লোকের আয়ত্ত হয় নাই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহুযুগের অনুশীলনের উত্তরাধিকার স্বরূপ ঐ যুগের লোকেরা ঐরূপ নিপুণতা অর্জন করিয়াছিল।

'বাস্তু' শব্দের অর্থ

'বাস্তু' শব্দে আমরা বাসস্থান বুঝিয়া থাকি। এই শব্দটির মূল অর্থ—প্রাণিগণ যেখানে বাস করে (বসন্তি প্রাণিনো যত্র)। পূর্বে শুধু বাসভূমি বুঝাইতে এই শব্দের ব্যবহার হইত; কালক্রমে ভূমির উপরিস্থ গৃহাদিও 'বাস্তু' শব্দে সূচিত হইতে থাকিল।

'অর্থশাস্ত্রে' (৩/৮) 'বাস্তু' শব্দের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে ঃ—

(১) গৃহ, (২) ক্ষেত্র, (৩) আরাম, (৪) সেতুবন্ধ, (৫) তড়াগ।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু গৃহনির্মাণই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বাস্তুবিদ্যার উৎপত্তি ও বাস্তুশাস্ত্র

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' ও অন্যান্য কতক সংস্কৃত গ্রন্থে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় 'চতুঃষষ্টি কলা'র উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নোক্ত চৌষট্টি কলার মধ্যে বাস্তুবিদ্যা অন্যতম।

কোন্ তমসাচ্ছন্ন যুগে যে আর্যগণ এই বিদ্যার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। তবে, বৈদিক যুগেই যে তাঁহারা গৃহনির্মাণে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রমাণ 'গৃহ' বুঝাইতে ধাম, পস্ত্যা, হর্ম্য প্রভৃতি বিবিধ শব্দের প্রয়োগ। ঋগ্বেদে গৃহনির্মাণ কৌশলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐ যুগেই যে এই বিদ্যার সূচনা হইল এমন কথা বলা যায় না।

বেদে ও বৈদিক সাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থে তত্তৎকালের লোকের বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।১

বৈদিক যুগ মোটামুটিভাবে ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব-তৃতীয় শতক পর্যন্ত ব্যাপী।

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' স্থাপত্যবিদ্যার সহিত পরিচয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। নগর, সৌধ, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এই দুই গ্রন্থের বহুস্থলেই উল্লেখ আছে। এই যুগে শুধু যে হর্ম্যাদি নির্মাণের পরিচয়ই পাওয়া যায়, তাহা নহে। স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের উল্লেখ এবং সমাজে তাঁহাদের মর্যাদার প্রমাণ হইতে মনে হয়, বাস্তুশাস্ত্রের তখন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভিণ্টারনিৎস্ (Winternitz) এর মতে, আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে 'রামায়ণ' বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার মতে, 'মহাভারতে'র বর্তমান রূপের উদ্ভব হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে২। যদিও বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন গ্রন্থের উল্লেখ ইহাতে নাই, তথাপি বাস্তুবিদ্যাবিষয়ক নানা পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইতে মনে হয়, সে-যুগে বাস্তুবিদ্যা শাস্ত্রাকারে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতপ্রবর

১. এখানে কয়েকটি মাত্র স্থানের নির্দেশ দেওয়া হইল :—

ঋগ্বেদ—১।৬৭।৫; ১।১৬৬।৮; ২।১৫।৩;৩।৮; ৩।৫৪।২০, ৪।৩০।২০; ৫।৩২।৫; ৭।৫৫।৬, ৭।৭৬।২; ৯।৭১।৪ ইত্যাদি।

অথর্ববেদ—গৃহনির্মাণকালে পঠিত মন্ত্রগুলি ইহাতে আছে। বাস্তুবিদ্যার কতক পারিভাষিক শব্দও অথর্ববেদে পাওয়া যায়।

'শতপথ ব্রাহ্মণে'—(তৃতীয় অধ্যায়) বাস্তু (মহাপুরুষগণের দেহাবশেষ রক্ষার স্থান), গৃহ (সাধারণ বাসস্থান) ও প্রজ্ঞান (স্মৃতিস্তম্ভ বা প্রস্তরখণ্ড)—এই ত্রিবিধ প্রস্তরনির্মিত স্থানের উল্লেখ আছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও বাস্তুবিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় :—

সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র—৩।২; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র—২।৭-৯;

গোভিল গৃহ্যসূত্র—৪।৭।১৫-১৯; হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্র—১।৮।২৭।

২ যথা—২।৪; ৩।৮ ইত্যাদি।

কানের মতে, ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে 'অর্থশাস্ত্র' রচিত হইয়াছিল।১

'মৎস্যপুরাণে' অষ্টাদশ বাস্তুবিদ্যাবিশারদের নাম আছে২। ইঁহাদের কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকে মনে করেন, ইঁহারা লোকপরম্পরায় প্রচলিত কাল্পনিক ব্যক্তি। কাহারও কাহারও মতে, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি৩। 'বৃহৎসংহিতা' ও 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' যথাক্রমে ভরদ্বাজ ও মার্কণ্ডেয় নামে দুইজন বাস্তুশাস্ত্রকারের নাম আছে। দক্ষিণ ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে অগস্ত্য নামেও একজন বাস্তুশাস্ত্রকারের উল্লেখ আছে। নানা গ্রন্থেই বাস্তুবিদ্যার প্রবর্তক স্বরূপ বিশ্বকর্মা ও ময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিম্বদন্তী অনুসারে বিশ্বকর্মা দেবগণের ও ময় দানবগণের শিল্পপ্রবর্তক। ভিন্টারনিৎস্ মনে করেন৪, প্রাচীন পুরাণগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের রচনা।৫

বর্তমানে উপলভ্যমান বাস্তুবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ—

(১) বিশ্বকর্মপ্রকাশ—বাসুদেব-রচিত। ইহা সম্ভবতঃ 'মৎস্যপুরাণে'র পূর্বে রচিত.৬

(২) ময়মত—খৃঃ ১০ম শতকে অথবা তৎপূর্বকালে রচিত।৭

(৩) সমরাঙ্গনসূত্রধার—ভোজদেব-রচিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের রচনা।৮

(৪) মানসার—বর্তমানে প্রাপ্ত রূপটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে রচিত।৯

(৫) শিল্পরত্ন।

(৬) বাস্তুরত্নাবলী।

(৭) অংশুমদ্ভেদ (কাশ্যপরচিত)।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও এই বিষয়ে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। পূর্বে যে পুরাণ দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন 'মার্কণ্ডেয়' (অধ্যায়

১. দ্রষ্টব্য—History of Dharmas'stra, I, p 104.
২. এই পুরাণের ২৫৪ অধ্যায়ে বাস্তুবিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে।
৩. দ্রষ্টব্য—T. P. Bhattacharya : A Study on Vastuvidya, দশম অধ্যায়।
৪. দ্রষ্টব্য—History of Indian Literature, I, p. 525.
৫. দ্রষ্টব্য—Keith : A History of Sanskrit Literature, p. 528.
৬. A Study on Vastuvidya, p. 108.
৭. ঐ, পৃঃ ১৭৮।
৮. ঐ, পৃঃ ১৭৭।
৯. ঐ, পৃঃ ১৯৭।

৪৯), বায়ু (অধ্যায় ৮), অগ্নি (অধ্যায় ১০৪) প্রভৃতি পুরাণেও বাস্তু-বিদ্যার আলোচনা আছে। বৈষ্ণবগ্রন্থ 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে'ও (খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম শতকের মধ্যবর্তী) এই শাস্ত্রের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত কতক তন্ত্রগ্রন্থে ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন আগমশাস্ত্রে বাস্তুবিদ্যার আলোচনা পাওয়া যায়।

চিতোরের মহারাণা কুম্ভের (১৪৩৩—৬৮ খৃষ্টাব্দ) উৎসাহে জয় ও অপরাজিতের প্রমাণ অনুযায়ী স্তম্ভনির্মাণবিষয়ক একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।১

কতক বৎসর পূর্বে 'অপরাজিতপৃচ্ছা' নামে স্থাপত্যশাস্ত্রের একটি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।২

বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ কথা

বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থাপত্যশিল্পকেও সেই অনুসারে প্রধান দুইটি প্রকারে (type বা style) সাধারণতঃ বিভক্ত করা হইয়া থাকে; উত্তর ভারতীয় শিল্পকে বলা হয় 'নাগর' এবং দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের নাম 'দ্রাবিড়'৩। দাক্ষিণাত্যের শিল্পশাস্ত্রে 'বেসব' নামে স্থাপত্যশিল্পের অপর একটি প্রকারভেদের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত প্রকারের শিল্প যে ভারতের কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, শুধু উড়িষ্যা দেশের স্থাপত্যকেই 'বেসর' নামে অভিহিত করা হইত। আবার, কাহারও কাহারও মতে, 'আন্ধ্র' ও 'কলিঙ্গ' নামে 'বেসর' শিল্পের দুইটি উপবিভাগ ছিল৪। 'লাট', বৈরাট', 'ভূমিজ' প্রভৃতি শিল্প প্রকাবেব নামও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'শিল্পরত্ন' ও 'ঈশানগুরুদেবপদ্ধতি'তে 'নলিন', 'প্রলীন' প্রভৃতি কুড়ি রকমেব মন্দির-শিল্পের উল্লেখ আছে। 'অত্রি-সংহিতা' নামক দাক্ষিণাত্যের আগম গ্রন্থে 'ব্রহ্মাচ্ছন্দ', 'বিষ্ণুচ্ছন্দ', 'ইন্দ্রচ্ছন্দ' ও 'রুদ্রচ্ছন্দ' নামে চারি প্রকার মন্দির-শিল্পের উল্লেখ আছে। পরবর্তী

১. দ্রষ্টব্য—Journal of Oriental Institute, Baroda, Vol. VIII, No. 1, p. 73.

২. সং পি. এ. মনকড, ১৯৫০।

৩. 'নাগর' ও 'দ্রাবিড়'—এই দুইটি নামেব প্রকৃত অর্থ বিতর্কের বিষয়। তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে প্রযুক্ত 'নাগর' শব্দটিও 'দ্রাবিড়' শিল্পেরই প্রকারভেদ মাত্র। (*A Study on Vastuvidya*, পৃঃ ১৬০-৬১)। এখানে বলা আবশ্যক যে, মন্দির-শিল্পই এইরূপ ভাগের মূল।

৪. *A Study on Vastuvidya*, পৃঃ ১৫৮।

কোন কোন গ্রন্থে 'ব্রহ্মাকান্ত', 'বিষ্ণুকান্ত' প্রভৃতি নামের মন্দির-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতীয় বাস্তুবিদ্যা, বিশেষতঃ মন্দির-শিল্প, কি পরিমাণে বৌদ্ধ-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৌদ্ধস্তূপ পরবর্তী মন্দিরসমূহের অগ্রদূত। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, পরবর্তী যুগের মন্দির-শিল্প বৌদ্ধ স্তূপ-শিল্পের দ্বারা আদিতে প্রভাবিত হইলেও, ইহাতে স্বতন্ত্র লক্ষণ যথেষ্ট ছিল। 'শিখর' বিশিষ্ট মন্দির সম্পূর্ণ পরবর্তী যুগের উদ্ভাবনা।

দাক্ষিণাত্যের শিল্প কোন্ সময়ে, কি প্রকারে ও কত পরিমাণে আর্য-শিল্প প্রভাবিত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের উপর উত্তর ভারতের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য এই যে, উত্তর ভারতের স্থাপত্য-শিল্পও দক্ষিণ ভারতের শিল্পের সঙ্গে কালক্রমে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিতগণের মতে, উত্তর ভারতের আর্যশিল্প অসুর ও নাগ প্রভৃতি অনার্য জাতির শিল্পের দ্বারাও কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল।১

বর্তমানে ভারতের নানা অঞ্চলে নানারূপের মঠমন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় সবই খৃঃ ষষ্ঠ শতক বা তৎপরবর্তী যুগের। খৃঃ ষষ্ঠ শতকের পূর্বেকার মঠমন্দিরাদি বিদ্যমান না থাকিলেও, যুক্তি প্রমাণ বলে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মন্দির-শিল্প ভারতে জন্মলাভ করিয়াছিল খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় কি প্রথম শতকে।২

প্রাচীন ভারত স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে রোমক (Roman) শিল্পের নিকট ঋণী কিনা সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। রোমীয় স্থাপত্য-শিল্পী বিট্রুবিয়াস্ (Vitruvius) এর গ্রন্থের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের, বিশেষতঃ 'মানসার' নামক গ্রন্থের, অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, কোন্ পক্ষ ঋণী তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।৩

বৈদিক যুগে বাস্তুবিদ্যা

ঋগ্বেদে বাস্তুবিদ্যা ধর্মেরই অঙ্গস্বরূপ ছিল। বাস্তু বা বাসস্থানের অধিপতি ছিলেন বাস্তোষ্পতি। নূতন গৃহাদি নির্মাণকালে ইঁহার উপাসনা করিতে হইত।৪ বাস্তোষ্পতিকে একস্থানে দেবতক্ষ্ণ ত্বষ্টা হইতে

১. *A Study on Vastuvidya,* পৃঃ ২৯৮-৩০১।
২. ঐ, পৃঃ ২৯১।
৩. ঐ, পৃঃ ১৯৮-২০১।
৪. ঋগ্বেদ—৭।৫৪, ৫৫।

অভিন্ন বলা হইয়াছে।[১] ঐ বেদে বিশ্বকর্মাকে গৃহনির্মাণ প্রসঙ্গে দেখা যায় না; তিনি বিশ্ব-কর্মা অর্থাৎ বিশ্বের স্রষ্টা। 'ছর্দি', 'হর্ম্য', 'ধ্রুব'[২] প্রভৃতি শব্দ হইতে মনে হয়, ঋগ্বেদের যুগে বাড়ীঘর রীতিমতই নির্মিত হইত; অবশ্য ঐ যুগের গৃহাদির উপকরণ বা কলাকৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদে নগর অর্থে 'পুর' শব্দের ব্যবহার আছে। কাহারও কাহারও মতে, এই শব্দটি অনার্য অসুরগণের নগরকেই বুঝায়।

গৃহনির্মাণকালে যে সমস্ত সূক্তের আবৃত্তি আবশ্যক সেগুলি অথর্ব-বেদে বিদ্যমান।[৩] 'বংশ', শালা বা গৃহের 'স্থূন', 'উপমিৎ', 'প্রমিৎ' ও 'পরিমিৎ' প্রভৃতি স্থাপত্যবিদ্যা-সংক্রান্ত কতক শব্দের প্রয়োগ এই বেদে দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ-যুগেও বাস্তুবিদ্যার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

কোন কোন গৃহ্যসূত্রে কিন্তু এমন কতক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি হইতে, মনে হয়, পরবর্তী শিল্পশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। 'সাঙখায়ান গৃহ্যসূত্রে' (৩/২ প্রভৃতি) গৃহনির্মাণকালীন অনুষ্ঠানাদির বিবরণ পাওয়া যায়; এই বিবরণ হইতে গৃহনির্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। 'আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে' (২/৭-৯) গৃহনির্মাণের অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রচলিত কয়েকটি প্রথার সন্ধান মিলে। ইহাতে বাস-যোগ্য ভূমির নির্বাচন ও পরীক্ষার জন্য প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। ভূমির গুণাগুণ পরীক্ষার একটি প্রণালী বড় সুন্দর। ভূমির একস্থানে একটি গর্ত খনন করিয়া ঐ মাটি দিয়াই গর্তটি বন্ধ করিতে হইবে। যদি ঐ মাটিতে গর্ত সম্পূর্ণ বন্ধ না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভূমি নিকৃষ্ট; যদি গর্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয় তাহা হইলে ভূমি মধ্যম; আর যদি গর্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া কিছু মাটি উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে বুঝা যাইবে ভূমি উৎকৃষ্ট। 'গোভিল'-ও 'খাদির-গৃহ্যসূত্রে' বাস্তুবিদ্যার বিবরণ আরো বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে, ভূমি-পরীক্ষা ছাড়াও বাসভূমির আকৃতি, জল-নির্গমন, গৃহের দ্বার নির্মাণ, গৃহের চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'পারস্কর—' (৩/৪/২) ও 'হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্রে' (১/৮/২৭) গৃহনির্মাণেব উপযোগী শুভমুহূর্তাদির আলোচনা আছে।

এই প্রসঙ্গে শুল্বসূত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে নানা আকৃতির

১. ঋগ্বেদ—৫।৪১।৮।

২. ঐ—৩।৫৪।২০, ২।৪১।৫। পরবর্তী যুগের শিল্পশাস্ত্রে এই শব্দদ্বারা বিশেষ এক প্রকার গৃহকে বুঝান হইযাছে।

৩. অথর্ববেদ—৩।১২; ৯।৩।

অগ্নিবেদী নির্মাণের প্রণালী ও ইষ্টকের বর্ণনা আছে। ভূমির মাপন-প্রণালী সম্বন্ধে যে বৈদিক যুগেই আর্যগণের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল, শুল্ব-সূত্রগুলিই তাহার সাক্ষী। এই হিসাবে ভারতের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে শুল্বসূত্রসমূহের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে বাস্তুবিদ্যা

'রামায়ণে' যে যুগের অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই যুগে স্থাপত্য-শিল্প বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এই গ্রন্থে দেবায়তন, বহুতলবিশিষ্ট ইষ্টকরচিত হর্ম্য, দুর্গ, সজ্জিত গবাক্ষ ও তোরণাদির বহু উল্লেখ আছে।[১]

'মহাভাবতে' যে যুগের কাহিনী বর্ণিত আছে, সেই যুগে যে বাস্তু-বিদ্যা শাস্ত্র হিসাবেই প্রচলিত* ছিল এবং বাস্তুবিদ্যাবিশারদ স্থপতিও সমাজে অনেক ছিলেন সেই বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই।[২] গৃহাদি নির্মাণ কালে 'শান্তি'কর্মের উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। 'মহাভারতে' নগর, নগরের চারিদিকে প্রাকার, পরিখা ও সেতুবন্ধ প্রভৃতির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে; 'চৈত্য' বা দেবমন্দিরাদির কথাও ইহাতে আছে। বাস্তুবিদ্যা এই যুগে খুবই উন্নত ছিল,[৩] ইহা বুঝা গেলেও তৎকালে গৃহাদি নির্মাণে কি কি উপকরণের ব্যবহার হইত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। 'মহাভারতে'র কোন কোন স্থান হইতে (১·১৮৪·১৯) মনে হয় তৎকালে প্রাসাদাদিও চূণকাম করিয়া সাদা করা হইত। 'সুধাবদাত' শব্দটিই এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'সৌধ' শব্দটি সম্ভবতঃ সুধা (=চূণ) পদ হইতেই ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

পুরাণে বাস্তুবিদ্যা

প্রায় সকল পুরাণেই হর্ম্য, প্রাসাদ, দেবায়তন, নগর প্রভৃতির সঙ্গে সেই যুগের লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, বিশেষ কতক পুরাণে বাস্তু-

১. 'বামাযণে' স্থাপত্যশিল্পেব অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি স্থান-নির্দেশ দেওয়া গেল :—

১।১৩।৮, ৫।১৫ ও ৪৩।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 'বামায়ণে' অযোধ্যা নগবীব স্বরূপের যে পরিচয় পাওয়া যায, তাহা 'মানসাব' ও অপর কতক বাস্তুবিদ্যাবিষযক গ্রন্থে বর্ণিত নগরের অনুরূপ।

২. মহাভারত—১।৫১।১৫।

৩. বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে, দৃষ্টান্তস্ববূপ, মহাভারতের কয়েকটি স্থান নির্দেশিত হইল :—

১।১২৮।৪১; ২।১।১৮; ১২।৬২; ১৪।১০; ৫।১৪৩।৩০, ১২।৫৪।২।

বিদ্যার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বর্ণনা আছে; বস্তুতঃ এই সকল পুরাণই সম্ভবতঃ পরবর্তী শিল্পশাস্ত্রের মূল আদর্শ। এই সকল পুরাণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'মৎস্যপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'গরুড়পুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ', 'নারদপুরাণ', 'বায়ুপুরাণ', 'ভবিষ্যপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', উক্ত পুরাণগুলিতে স্তম্ভ, ইষ্কটনির্মিত গৃহের পরিমাপ, নক্সা, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি গৃহনির্মাণসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

অর্থশাস্ত্রে বাস্তুবিদ্যা

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী ছাড়াও, এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (৩/৮, ৯, ১০) শুধু বাস্তুসংক্রান্ত বিষয় অবলম্বনেই রচিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'অর্থশাস্ত্রে' 'বাস্তু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা-- গৃহ, আরাম, ক্ষেত্র, সেতুবন্ধ ও তড়াগ। এই গ্রন্থে, বাসযোগ্য বাস্তুভূমির নির্বাচন, দুর্গ, প্রাসাদ, কোষাগার, কারাগার, প্রাকার ও পরিখাদি নির্মাণ, এই সমস্ত বিষযেরই আলোচনা আছে। ইহাতে 'দেবকুল', 'দেবায়তন' চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতি দেবালয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্রে' গৃহাদির উপকরণ সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বাঁশ ও কাঠের উপর মাটির প্রলেপ বা আস্তর দিয়া ঘর তৈরীর কথা ইহাতে আছে। ইষ্টকের ব্যাপক ও প্রস্তরের অল্পবিস্তর ব্যবহার এই যুগে ছিল বলিয়া মনে হয়। নগর নির্মাণ, নগরস্থ গৃহাদি ও রাস্তাঘাট তৈরীর বিষয়ও এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

'শুক্রনীতিসারে'ও দুর্গ ও সুরক্ষিত নগরাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে দেব-মন্দির ও অন্যান্য নানাবিধ ইষ্টক রচিত গৃহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যা

বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে পাঁচটি অধ্যায় আছে। ইহাতে বাসস্থানের উপযোগী স্থান, মৃত্তিকা-পরীক্ষণ প্রণালী, গৃহের নক্সা, তল (Storey) সমূহের ও দ্বারের মাপ প্রভৃতি নানা বিষয় দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত ইষ্টকনির্মিত গৃহের শ্রেণীবিভাগ ও নির্মাণ প্রণালী 'মৎস্যপুরাণ' ও 'ভবিষ্যপুরাণে'র অনুরূপ।

আগম গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যা

এক প্রকার তন্ত্রগ্রন্থের নাম 'আগম'। তন্ত্রে শুধু মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র, বিশিষ্ট প্রকার পূজা ও যোগসাধন প্রণালীর আলোচনা আছে বলিয়া

সাধারণতঃ মনে করা হয়। কিন্তু, এই জাতীয় কতক গ্রন্থে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কালিকগমে'র ষাটটি অধ্যায় এই বিষয়ে রচিত। এই গ্রন্থে বাসস্থানের উপযোগী স্থান নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া 'মৎস্য' ও 'ভবিষ্য' পুরাণের এবং 'বৃহৎসংহিতা'র ন্যায় বিংশতি প্রকার ইষ্টকনির্মিত গৃহের বর্ণনা আছে। নাগর, দ্রাবিড় ও বেসর ভেদে ত্রিবিধ নির্মাণপদ্ধতি এবং পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব ভেদে ত্রিবিধ ইষ্টক রচিত গৃহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল আগমে বাস্তুবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'করণাগম', 'সুপ্রভেদাগম', 'বৈখানসাগম'।

কামসূত্রে বাস্তুবিদ্যা

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র সাধারণ নামক প্রথম অধিকরণে নাগরকের জীবনযাত্রাপ্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে তদীয় গৃহের ও নগরের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে১।

বাৎস্যায়নের জীবনকাল নিঃসংশয়ে নিরূপিত না হইলেও তাঁহাকে সাধারণতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক বলিয়া মনে করা হয়।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে, কাব্যে ও নাট্যগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। বাণের 'হর্ষচরিতে' রাজপ্রাসাদের একটি জীবন্ত চিত্র আছে। অন্তঃপুর ভিন্ন প্রাসাদের অন্ততঃ তিনটি প্রাঙ্গণ, বহুতল বিশিষ্ট বিশাল অট্টালিকা, উজ্জ্বল প্রস্তর নির্মিত কুট্টিম বা গৃহভিত্তি ও গৃহতল, মহার্ঘ প্রস্তরখচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত প্রাচীর ও গৃহস্তম্ভ প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সভামণ্ডপ, প্রাগ্‌বংশ২ প্রভৃতির বর্ণনাও ইহাতে আছে।

কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে 'বানশালা',৩ 'চৈত্য'৪ ও 'বিহার' প্রভৃতি নানাবিধ গৃহের উল্লেখ আছে; অবশ্য ইহাদের নির্মাণপ্রণালীর কোন বর্ণনা এই কাব্যে নাই। 'মেঘদূত', 'শিশুপালবধ', প্রভৃতি কাব্যে এবং 'মৃচ্ছকটিক', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে নাগর ও সৌধাদি সম্বন্ধে কাব্য ও নাট্যকারগণের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কতক জ্যোতিষ ও গণিত গ্রন্থে বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। 'গর্গসংহিতা'য় প্রাঙ্গণ ও কক্ষাদির পরিমাণ এবং দ্বার-

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য বর্তমান গ্রন্থের 'কামশাস্ত্র' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
২. যজ্ঞাগারের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রাকার গৃহ।
৩. প্রাকারপরিখাদিদ্বারা সুরক্ষিত বৃহৎ অট্টালিকা।
৪. সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও জৈনগণের উপাসনা-স্থান; ইহাতে প্রায়শঃ স্মৃতিস্তম্ভ থাকে।

স্থাপনাদি আলোচিত হইয়াছে। দিক্‌নির্ণয়ের জন্য শঙ্কু (gnomon) স্থাপন বাস্তুনির্মাণে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'সূর্যসিদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', 'লীলাবতী' প্রভৃতি গ্রন্থে।

বাস্তুবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থসমূহে আলোচিত বিষয়

এ পর্যন্ত বাস্তুবিদ্যা বিষয়ে যে সমস্ত তথ্যের কথা বলা হইল, সেই তথ্যগুলি 'ঋগ্বেদ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অর্থশাস্ত্র' অবধি নানাগ্রন্থের নানা স্থানে পাওয়া যায়। শুধু বাস্তুবিদ্যা অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের বিয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত কতক প্রাচীন গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃতি হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহে স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা আছেঃ—

বাস্তুদেবতা ও তাঁহার অর্চনা,
বাসার্থ ভূমির পরীক্ষা ও নির্বাচন,
গৃহনির্মাণ বিশেষতঃ দ্বারনির্মাণ—এই প্রসঙ্গে জলনির্গমন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থারও উল্লেখ আছে।
বাস্তু ভূমিতে বৃক্ষরোপণ—(অর্থাৎ, গৃহের চতুষ্পার্শ্বে কি কি বৃক্ষ রোপণীয় ও কি কি বৃক্ষ বর্জনীয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা),
গৃহনির্মাণের উপকরণ—ইষ্টক, প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি,
গৃহের নির্মাণের জন্য শুভাশুভ মুহূর্ত,
বিভিন্ন প্রকারের গৃহ,
নির্মাতব্য গৃহাদির পরিমাপ,
দেবমন্দির নির্মাণ,
স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন সম্প্রদায়,
জনপদ ও নগর প্রভৃতির নির্মাণকল্প,
সাজসজ্জা (decorative elements)।

উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নহে। সুতরাং, কয়েকটি মাত্র কৌতূহলজনক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা হইবে। গৃহাদির জন্য নির্বাচিত স্থানের মাটি পরীক্ষা করিয়া নেওয়া আবশ্যক। এই পরীক্ষার একটি প্রণালী এইরূপ। নির্বাচিত স্থানে এক হাত গভীর বর্গাকার একটি গর্ত খনন

করিতে হইবে। ঐ গর্ত জলপূর্ণ করিয়া একদিন ও এক রাত্রি অপেক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ের পরে ঐ জল নিঃশেষে শুকাইয়া গেলে স্থানটিকে নিকৃষ্ট মনে করিতে হইবে। কিন্তু, ঐ জলের কিছু পরিমাণ গর্তে থাকিলে স্থানটিকে ইষ্টকনির্মিত গৃহাদি নির্মাণের উপযোগী মনে করা যাইতে পারে। বর্তমানে বড় বড় শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানে (Corproation) City Architect-এর যে কাজ, সেই ধরণের কাজ সে-যুগেও ছিল বলিয়া মনে হয়। গৃহনির্মাণ ব্যাপারে নির্মাতাকে অপরের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। 'অর্থশাস্ত্রে' স্পষ্টই বিধান আছে যে, কেহ যদি নিজের বাড়ীতে দ্বার বা বাতায়ন এমন ভাবে নির্মাণ করে যাহা অপরের অসুবিধা জন্মাইতে পারে তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে। এক বাড়ীর জল অপরের বাড়ীতে পড়িতে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। দুইটি বাস্তু বা সন্নিকৃষ্ট 'শালা'র মধ্যে নির্দিষ্ট অন্তরাল১ রাখা অবশ্যকর্তব্য। বর্তমান কালেও শহরে গৃহনিমাণ করিতে হইলে এই জাতীয় বিধিনিষেধ পালন করিতে হয়।

গৃহের নানা অংশে, বিশেসতঃ দ্বারে, নানারূপ চিত্রকর্মের ও মূর্তি নির্মাণের প্রচলন ছিল। প্রাকৃতিক বস্তু, পশুপাখী, দেবদেবী ও পুরাকাহিনীর কোন ঘটনা অবলম্বনে এই সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হইত। বাস্তুশাস্ত্রের নির্দেশ এই যে, গৃহে শুধু চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত বা মূর্তি নির্মাণ করিতে হইবে।

বাস্তুশাস্ত্রে সকল যুগেই দ্বারের প্রতি লেখকগণের অত্যন্ত মনোযোগ লক্ষিত হয়। দ্বারেব অবস্থান, উপাদান, আকার প্রভৃতি সমস্ত কিছু সম্বন্ধে তাঁহারা বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্বারের মধ্য দিয়া আলোক ও বায়ুর আগমন নির্গমন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ অতি সচেতন। আলোক ও বায়ুর প্রতিরোধককে বলা হয়াছে 'বেধ'; এই বেধগুলি গৃহস্বামীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজা ও সেনাপতির গৃহের দ্বারের উচ্চতা প্রায় আট হাত এবং প্রস্থ প্রায় চার হাত।

দ্বারসম্বন্ধে অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিধি এই যে, ইহা চারিটি প্রধান দিকের (Cardinal points) কোন এক দিকে থাকিবে এবং দেওয়ালের ঠিক মধ্যভাগে স্থাপিত হইবে।

ইষ্টকের আকার সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বিধি দেখা যায়। বৃহত্তম ইষ্টকের আকার ১৮″×১৮″×৬″ এবং ক্ষুদ্রতম আকাব ৮″×৪″×২″।

১. 'অর্থশাস্ত্র'মতে এক হাত, আট আঙ্গুল বা তিন পদ পরিমিত স্থান—'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' (রাধাগোবিন্দ বসাক-কৃত বঙ্গানুবাদ)—পৃঃ ২১২।

দ্বাদশতল বিশিষ্ট প্রাসাদ, 'মানসারে'র মতে, সর্বোচ্চ। ইহা 'চক্রবর্তী' রাজার বাসোপযোগী।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার দিগ্‌দর্শন করা গেল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই বিদ্যা ভারতের চতুষ্প্রান্তেই সীমায়িত থাকে নাই। তিব্বত, শিকিম, নেপাল ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় স্থাপত্যশাস্ত্রও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যে শ্যাম, কম্বুজ, চম্পা, সুমাত্রা, বলি বোর্ণিও এবং জাভা প্রভৃতি স্থানেও এই প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মধ্য এশিয়ায় খোটান ও তুন্‌হুয়াং নামক স্থানের স্থাপত্যে ভারতীয় প্রভাব নগণ্য নহে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, সুদূর চীন জাপানও এই বিষয়ে ভারতের নিকট অনেকাংশে ঋণী। মধ্য আমেরিকার ময় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষও ভারতীয় বাস্তুবিদ্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসিগণের 'ময়' নামের সঙ্গে ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রের গ্রন্থ 'ময়মতে'র নামের সাদৃশ্য সম্ভবতঃ আকস্মিক নহে।

শ্যৈনিকশাস্ত্র

প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ রাজশাসিত দেশ। রাজগণের চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম উপায় ছিল মৃগয়া। সুতরাং, মৃগয়া সম্বন্ধে সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থাদি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ইতস্ততঃ মৃগয়ার উল্লেখ বা প্রাসঙ্গিক বর্ণনা থাকিলেও এই বিষয়ে বিশেষ কোন গ্রন্থের সংবাদ অদ্যাবধি জানা যায় না। মৃগয়া সম্বন্ধে 'শ্যৈনিকশাস্ত্র'ই[১] বর্তমানে একমাত্র গ্রন্থ। গ্রন্থটি রুদ্রদেবের নামাঙ্কিত। এই রুদ্রদেব, (কোন কোন পুথি অনুসারে, চন্দ্রদেব বা রুদ্রচন্দ্রদেব) কুমাওন বা কূর্মা-চলের রাজা। এই রুদ্রদেবের জীবন-ও রাজত্বকাল অজ্ঞাত। এই গ্রন্থে কতক তুর্কী ও ফার্সি শব্দের প্রয়োগ আছে। অবশ্য ইহা হইতে গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যায় না; কেননা, তুর্কীগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণের বহু-কাল পূর্ব হইতেই তুর্কীগণের সঙ্গে ভারতবাসিগণের বাণিজ্যিক যোগা-যোগ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, গ্রন্থখানির রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্বে টানা যায়; কারণ, ইহাতে মৃগয়া প্রসঙ্গে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও বন্দুক বা বারুদের উল্লেখ নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, গ্রন্থখানি হিন্দু আমলের ভারতবর্ষে রচিত হইতে পারে না; কারণ, গ্রন্থকার 'ত্রৈবর্ণিকধর্মনির্ণয়' নামক একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিবন্ধসমূহ ভারতে মুসলমান অভিযানের পরবর্তীকালেই রচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। স্মৃতিনিবন্ধের ইতিহাসে বাংলা দেশের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আমরা জানি যে, এই দেশের ভবদেব, অনিরুদ্ধ ভট্ট ও হলায়ুধ প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা স্মৃতিনিবন্ধকার প্রাক্-মুস্লিম যুগের লেখক। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, রুদ্রদেব তদীয় উল্লিখিত গ্রন্থে কুল্লূকভট্টের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুল্লূকের কাল খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগের কাছাকাছি[২]। সুতরাং, ইহাই রুদ্রদেবের জীবনকালের ঊর্ধ্ব সীমারেখা।

'শ্যৈনিকশাস্ত্রবৃত্তি' নামে এই গ্রন্থের একটি টীকা আছে[৩]।

'শ্যেন' শব্দ হইতে 'শ্যৈনিক' শব্দটি উৎপন্ন। কিন্তু, গ্রন্থটিতে শ্যেনের

১ স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ সহ সম্পাদিত, এসিয়াটিক্ সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯১০।

২· দ্রঃ—Kane: History of Dharmasastra, I, পৃঃ ৩৬৩।

৩· কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুথিসংখ্যা ৮২৪৪।

বিবরণ ছাড়াও অন্যান্য কতক বিষয়ের আলোচনা আছে। গ্রন্থটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'কর্মানুষঞ্জন'; ইহাতে সাধারণতঃ ব্যসনরূপে পরিগণিত ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে লেখক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পরিমিত ভোগে তথাকথিত ব্যসনগুলি হিতকর হইয়া থাকে। 'ব্যসনহেয়তানিরূপণ' নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি অষ্টাদশ ব্যসনের উল্লেখপূর্বক পরিমিত ভোগে ইহাদের উপযোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'মৃগয়াবিবেচন' নামে অভিহিত; ইহাতে মৃগয়ার প্রশংসা-পূর্বক অষ্টপ্রকার মৃগয়া বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে 'শ্যেনানাং বিবেচনম্' অর্থাৎ শ্যেনের প্রকারভেদ ও তাহাদের বিবরণ, ইহাদের পোষণপ্রণালী ইত্যাদি। 'চিকিৎসাধিকার' নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্যেনের নানাবিধ রোগ ও উহাদের প্রতিকার আলোচিত হইয়াছে। 'শ্যেন-পাতেতিকর্তব্যতা' নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্যেনযুদ্ধের প্রণালী, তদ্দর্শন-জনিত আনন্দ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। শেষ ও সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম 'মৃগয়ানন্তরেতিকর্তব্যতা'; ইহাতে শ্যেনযুদ্ধের পরে রাজার শ্রমাপনোদন পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্যৈনিকশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিম্নলিখিত অষ্টাদশটি ক্রিয়া সাধারণতঃ ব্যসনরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ঃ—

(ক) ক্রোধজ

(১) বাক্পারুষ্য, (২) দণ্ডপারুষ্য[১], (৩) ঈর্ষ্যা, (৪) অসূয়া, (৫) সাহস[২], (৬) অর্থদূষণ[৩], (৭) পৈশুন্য[৪], (৮) ক্রোধ।

(খ) কামজ

(১) স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, (২) অক্ষক্রীড়া, (৩) মদ্যপান, (৪) গীত, (৫) বাদ্য, (৬) নৃত্য, (৭) বৃথাভ্রমণ, (৮) পরোক্ষনিন্দা, (৯) দিবানিদ্রা, (১০) মৃগয়া।

রুদ্রদেবের মতে, উল্লিখিত ব্যাপারগুলি স্বরূপতঃ ব্যসন নহে; ইহাদের প্রতি নিরঙ্কুশ আসক্তিই ব্যসন। সংযমের সহিত উক্ত ক্রিয়াসমূহে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে যথেষ্ট আনন্দলাভ করা যায় এবং উহাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে বর্জন করিলে জীবনের অনেক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, যদি স্ত্রীলোক একান্তভাবে বর্জনীয় হয়

১. লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড।
২. এমন হঠকারিতা যাহাতে জীবন বিপন্ন হইতে পারে।
৩. আদান ও প্রদানে বিবেচনার অভাব, উপযুক্ত স্থলে দানে অস্বীকৃতি, অপাত্রে দান ইত্যাদি।
৪. অপরের ছিদ্রান্বেষণ।

তাহা হইলে পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণকারী পুত্রের লাভ কিরূপে হইবে? মৃগয়া সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিলে যজ্ঞাদির প্রয়োজনীয় মাংস ও অজনাদি লাভ হয় না। দিবানিদ্রা অজীর্ণাদি রোগের উপশমার্থ অপরিহার্য। তাহা ছাড়া, উল্লিখিত অষ্টাদশটি ক্রিয়া ব্যতীত জীবনে কোনপ্রকার সুখভোগের কল্পনা করা যায় না। যেমন, বসন্ত ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর সৌন্দর্যে, চন্দ্রোদয়ের মহিমা, মাল্য-চন্দনাদির ধারণ প্রিয়াসাহচর্যেই উপভোগ্য; বিরহীর পক্ষে এমন উপভোগ্য বস্তুও বিরক্তির উদ্রেক করে। এই রূপে রুদ্রদেব দেখাইয়াছেন যে. বাস্তব জীবনে উল্লিখিত সমস্তগুলি ব্যাপারেরই ক্ষেত্র বিশেষে উপযোগ আছে। তিনি বারংবারই ইহাদেব প্রতি অত্যাসক্তিকে নিন্দা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের মতে, মৃগয়ার বহু প্রকারভেদ আছে। তন্মধ্যে তিনি অষ্ট প্রকার মৃগয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা এইরূপঃ—

(১) আশ্বীনা—অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মৃগয়া,
(২) সজালা—পাশ বা ফাঁদের সাহায্যে মৃগয়া,
(৩) কাল্যা—নানারূপ কৌশলে মৃগয়া,
(৪) যাবশী১—ক্ষেত্রে শস্যের কম্পনাদি লক্ষ্য পূর্বক তন্মধ্যে লুক্কায়িত জন্তুর মৃগয়া,
(৫) সাপেক্ষা—প্রতীক্ষা পূর্বক লক্ষ্যের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ,
(৬) পদপ্রেক্ষা—লক্ষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণক্রমে মৃগয়া,
(৭) শ্বগণিকা—লক্ষ্যের প্রতি কুকুর নিয়োগ কবিযা মৃগয়া,
(৮) শ্যেনপাতা—শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে মৃগয়া।

শীতের মধ্যভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ পর্যন্ত আশ্বীনা মৃগযার প্রশস্ত কাল। কর্দম, প্রস্তব, বৃক্ষ ও গর্তাদিহীন স্থান এই প্রকার মৃগয়ার উপযোগী। এইরূপ মৃগয়া অভ্যাস কবিলে শবীব লঘু, মেদহীন ও দৃঢ় হয়; ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। তাহা ছাড়া, ধাবমান লক্ষ্যকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবার কৌশলও ইহা দ্বারা আয়ত্ত হয়২।

১. শব্দটি সম্ভবতঃ 'যবস' হইতে উৎপন্ন (যবস=পশুব খাদ্য)। সুতবাং 'যাবসী' রূপটি শুদ্ধ মনে হয।

২. তুলনীয—'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য সেনাপতি কর্তৃক মৃগযা-প্রশংসাঃ—

অনববতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূবপূর্বং
ববিকবিণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈবভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যাযতত্বাদলক্ষ্যং
গিবিচব ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি॥ ২।৪

[প্রভু পার্বত্য গজেব ন্যায় অতি বলিষ্ঠ দেহ ধারণ করিয়া আছেন; অবিরাম ধনুর্গুণাকর্ষণে দেহেব পূর্বার্ধ কর্কশ হইযাছে, ইহা সূর্যকিবণ সহ্য করিতে সমর্থ। (এত পরিশ্রমেও) দেহে ঘর্মের লেশমাত্র নাই। দেহ কৃশ হইলেও, পেশীবহুল বলিযা উহার কৃশত্ব লক্ষিত হইতেছে না।]

শুধু তাহাই নহে ঃ এই প্রকার মৃগয়াদ্বারা ধর্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ করা যায়। বৃক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর ও শস্যধ্বংসকারী জন্তুসমূহের বধ, নানা উপযোগবিশিষ্ট বনের রক্ষণ, তস্করাদির অপসারণ ও অরণ্যবাসী জনগণের সহিত সখ্যস্থাপন প্রভৃতি আশ্বীনা মৃগয়া দ্বারা সম্ভবপর হয় বলিয়া ইহা ধর্মার্জনে সহায়তা করে। বন্যগজ ও গণ্ডার, মূল্যবান্ শৃঙ্গচর্মাদি ও কস্তুরী প্রভৃতির লাভে সহায়তা করে বলিয়া এইরূপ মৃগয়া অর্থার্জনেরও সহায়ক। এইরূপ মৃগয়ায় এমন কতক পশুমাংস লাভ হয়, যাহা কামবৃত্তি উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিতে সহায়তা করে। সুতরাং চতুর্বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গেরই সাধন আশ্বীনা মৃগয়া।

যে প্রকার মৃগয়ায় জাল বা ফাঁদের সাহায্য নেওয়া হয়, তাহা সজালা মৃগয়া নামে অভিহিত। এইরূপে মৎস্য, শঙ্খ, শুক্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। নিষাদ ও অন্যান্য নীচশ্রেণীর লোকেরা এইরূপ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, এই উপায়ে হস্তী ধৃত হইতে পারে বলিয়া রাজগণের পক্ষেই ইহা উপযোগী। মৃগের সাহায্যে মৃগ এবং পক্ষীর সাহায্যে পক্ষী ধরাও এই মৃগয়ার অন্তর্গত।

কাল্যা মৃগয়া চতুর্বিধ ঃ—

(১) বহুকর্ণিকা—ইহাতে দুই কিম্বা তিন ব্যক্তি একত্র হইয়া বায়ুর অভিমুখে অবস্থান পূর্বক তারস্বরে চীৎকার করে এবং ত্রিকর্ণী বা ত্রিশূলের দ্বারা হরিণকে বিদ্ধ করে।

(২) মূললগ্নিকা—ইহাতে বৃক্ষান্তরিত অনেক লোক ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে পশু বধ করে।

(৩) মহাকাল্যা—ইহাতে বহুসংখ্যক লোক বনকে বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হয় এবং জন্তুসমূহের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া 'করবাল' বা খড়্গ এবং অন্যান্য অস্ত্রদ্বারা উহাদিগকে বধ করে।

(৪) গজকাল্যা—ইহাতে গ্রীষ্মকালে হস্তিসমূহ শুষ্কপ্রায় পল্বলে পতিত হইয়া ধৃত হয়।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ॥ ২।৫

[মৃগয়ায় মেদক্ষয় হেতু শরীর লঘু হইয়া কর্মক্ষম হয়; ভয় ও ক্রোধে প্রাণিগণের চিত্তবিকার লক্ষিত হয়; ধনুর্ধরগণের কৌশলের পরাকাষ্ঠা এই যে, তাহাদের তীরসমূহ ধাবমান লক্ষ্যে সফল হয়। মৃগয়া বৃথাই ব্যসন বলিয়া অভিহিত হয়। বস্তুতঃ এইরূপ চিত্তবিনোদক আর কী আছে ?]

যাবশী মৃগয়াতে গোধূমাদি শস্যের ক্ষেত্রে শস্যের কম্পনাদি হইতে লুক্কায়িত পশুগণের গতিবিধি নির্ণয় করিয়া উহাদিগকে বধ করা হয়।

সাপেক্ষা মৃগয়াতে ধনুর্ধর ব্যক্তিগণ প্রতীক্ষায় থাকে এবং পশুগণ সন্নিহিত হইলে উহাদিগকে বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করে। বিভীতক[১] বৃক্ষ-বহুল স্থানে, শস্যক্ষেত্রে এবং জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানে এইরূপ মৃগয়া সফল হয়। গোশব সম্মুখে রাখিয়া সিংহাদি হিংস্র পশুগণকে এইরূপে অতি সহজে বধ করা যায়।

পদপ্রেক্ষা মৃগয়ায় পশুগণের পদাঙ্ক অনুসরণক্রমে উহাদিগকে বধ করা হয়। ইহা দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারে বধ্যপশুর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কুকুরের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া মৃগয়াকারী লক্ষ্যবস্তুকে প্রাপ্ত হয় এবং উহাকে বধ করে। দ্বিতীয় প্রকারে ধন্বী নিজেই লক্ষ্য পশুর পদচিহ্ন অনুসরণ করে। বালুকাময় স্থানে অথবা আর্দ্রস্থানে এইরূপ মৃগয়া অতিশয় সফল হয়।

ঊষরভূমিতে শশকাদি জন্তুকে আক্রমণ করিবার জন্য কতকগুলি কুকুর প্রযুক্ত হয়। যখন শশকাদি ও কুকুরসমূহ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন ধন্বী লক্ষ্যের প্রতি শরক্ষেপ করে। ইহাতে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন; কারণ, শরগুলি শুধু লক্ষ্যকেই বিদ্ধ করিবে, তৎসন্নিহিত কুকুরগুলিকে নহে' এইরূপ মৃগয়া শ্বগণিকা নামে অভিহিত। রজ্জুমোক ইহারই প্রকারভেদ। রজ্জুমোকে কৌশলে রজ্জু বিস্তার পূর্বক হরিণ ধৃত হয়।

শ্যেনপাতা মৃগয়ায় শিক্ষিত শ্যেন পক্ষিগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। উহারা নানাবিধ পক্ষীর উপরে পতিত হয়। এইরূপ মৃগয়া নানাভাবে করণীয়। শ্যেনগুলিকে মুক্ত করিবার প্রণালী দ্বিবিধ ঃ—

(১) হস্তমোক—ইহাতে শ্যেনপক্ষীর পদবন্ধন রজ্জুটি অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া উহাকে লক্ষ্যের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।

(২) মুষ্টিমোক—ইহাতে শ্যেনপক্ষীটিকে করতলে রাখা হয়; উহার পালকগুলি বস্ত্রাবৃত থাকে। সেই অবস্থায় উহা নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন ঐ বস্ত্রখণ্ডের জন্য উহার উড়িতে কষ্ট না হয়।

শ্যেনপক্ষীর শিক্ষাব্যবস্থা অতিশয় কৌতুককর। শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে যেন তিনি নিজের প্রতি উহার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে, শ্যেনপক্ষীটিকে পাইয়াই তিনি উহার চক্ষুদ্বয় এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিবেন যেন উহা তাঁহার মুখ পাঁচদিন পর্যন্ত দেখিতে না পায়। এই কয়দিনের মধ্যে উহা যেন তাঁহার কণ্ঠস্বরও শুনিতে না পায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সময়ের পরে, প্রতিদিন রাত্রে মৃদু আলোকে উহার

১. Beleric myrobalan.

চক্ষু খুলিয়া চক্ষুদুইটিকে শীতল জলে ধৌত করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমে নিজের প্রতি উহার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যে তিনি উহাকে নিজে খাদ্য পানীয় দিবেন এবং স্বহস্তে উহাকে আদর করিবেন। যে সকল শ্যেন সহজে পোষ মানিতে চায় না, তাহাদিগকে বশে আনিতে হইলে শাস্তিও বিধেয়।

শ্যেনপক্ষী প্রধানতঃ দ্বিবিধ ঃ—

(১) কৃষ্ণাক্ষ—যাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ,

(২) পাটলাক্ষ—যাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত পক্ষীগুলির নাম—কুহী, শশাদ (hare-hawk) চরক, (Suker falcon) বহরী, (peregrine) লগর (Lugger falcon) পক্ষকলিকা, তুরুমতী (Merlin)। দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীগুলির নাম—বাজ, বাস, বেসর, সিচান, জুর, চেট, ধূতি, টুন। এখানে গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, উভয় শ্রেণীর শ্যেনের মধ্যেই স্ত্রীপক্ষীগুলির সাহস ও গতিভঙ্গী উৎকৃষ্ট।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, 'বাজ'[১] শব্দে পক্ষীমাত্রকেই বুঝায় বটে, কিন্তু, শ্যেন পক্ষীকে বুঝাইতে ঐ শব্দটি রূঢ় হইয়াছে।

বাজ পঞ্চবিধ ঃ—

(১) বলাকা—ক্ষীণদেহবিশিষ্ট। ইহার বক্ষে ও উরুতে সাদা ও কাল পালক থাকে।

(২) চক্রাঙ্গ—চক্রবাকের আকৃতিবিশিষ্ট।

(৩) কালক—কঙ্কের ন্যায় লম্বা ও কাল।

(৪) হংসবাজ—সর্বাঙ্গ তুষারধবল।

(৫) মহারাবণ—ইহার পুচ্ছে ও পালকে অশ্বত্থ বা পিপ্পল পত্রের ন্যায় চিহ্ন থাকে। ইহা বাজরাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাকে রাবণ বলা হয় এইজন্য যে, ইহার সমাগমে অন্যান্য পক্ষী সভয়ে চীৎকার করে।

বাস চতুর্বিধ ঃ—

(১) ঔরঙ্গণ—শক্তি, সাহস ও বর্ণভেদে ইহা বহুবিধ।

(২) ক্ষীণদেহবিশিষ্ট ও দ্রুতগামী।

(৩) প্রতিষ্ঠান—ইহার শরীরে ঘন পালক থাকে এবং ইহার সাহস ও গতিবেগ নিকৃষ্ট।

(৪) শিকার—অতিশয় সাহসী ও দ্রুতগামী।

১. 'বাজ' শব্দের মূল অর্থ 'পক্ষ'।

বেসর ত্রিবিধঃ—

(১) মাণিক—স্থূলকায় ও অধম গুণযুক্ত।

(২) চূলিকাঙ্ক—ইহা মধ্যমগুণবিশিষ্ট।

(৩) বাসাপ্রতিম—ইহার সাহস ও পুচ্ছ উল্লিখিত বাসপক্ষীর ন্যায়; ইহা উত্তমগুণযুক্ত।

উল্লিখিত পক্ষীগুলির মধ্যে যাহাদের মস্তক সর্পফণাসদৃশ, গ্রীবা লম্বা, পক্ষ বিস্তৃত, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত সেইগুলিকে উৎকৃষ্ট বুঝিতে হইবে। উৎকৃষ্ট পক্ষীগুলির অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, উহাদের দেহ স্বস্তিকাকৃতি।

বিভিন্ন শ্রেণীর শ্যেনের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। কুহী, চরক, বাজ ও বহরীর জন্য পঁচিশ টঙ্ক[১] সদ্যোমাংস বিধেয়। শশাদের পক্ষেও এই পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর পুং পক্ষীগুলির জন্য পাঁচ টঙ্ক কম বিহিত। পক্ষকলিকার জন্য পনর টঙ্ক, বাস-এর জন্য তের এবং বেসর ও চূলাঙ্কের জন্য এগার টঙ্ক বিধেয়। সিচানের শক্তি অনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুরুমতীকে নয় টঙ্ক মাংস দিতে হইবে। চেটা, টোনা ও ধূতিকার জন্য যথাক্রমে আট, সাত ও ছয় টঙ্ক মাংসের বিধান আছে।

শ্যেনপক্ষীর পালনপদ্ধতি নিতান্ত সহজ নহে। উহাকে বাঁধিয়া 'সুধা-ধবলিতোদরে প্রাসাদশিখরে' স্থাপন করিতে হইবে। ঐ স্থানটিকে যন্ত্রের সাহায্যে জলধারাসিক্ত করিয়া শীতল রাখিতে হইবে; মাঝে মাঝে পাখার বাতাসও আবশ্যক। শ্যেনের বাসস্থানটি জালে বেষ্টিত থাকিবে যেন কোন মক্ষিকা সেখানে প্রবেশ করিতে না পারে। শ্যেনকে উদ্যানের ছায়াশীতল ও সুরক্ষিত স্থানে অথবা মশকাদিমুক্ত ভূগৃহে[২] রাখা যাইতে পারে। সর্বত্রই জলসিঞ্চন বিধেয় এবং 'ভূগৃহে' উহাকে রাখিলে ঐ স্থানের চারিদিকে সবুজ যবাঙ্কুর বিরাজিত হইবে এবং স্থানটি সুগন্ধি হইতে হইবে। দুইটি কি তিনটির অধিক শ্যেন একত্র রাখা সমীচীন নহে।

শ্যেনের সম্মুখে একটি পাত্রে উহার স্নানের জন্য জল রাখা প্রয়োজন।

শ্যেনের নানাবিধ রোগের উপশমের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা গ্রন্থকার করিয়াছেন। শ্যেন যদি খাদ্য উদ্গিরণ করে, তাহা হইলে মহিষের মাখন-মিশ্রিত মেথিচূর্ণ উহার সেব্য। অজীর্ণ রোগের ঔষধ শুধু বহ্নিচূর্ণ[৩] অথবা ভাঙের রসমিশ্রিত বহ্নিচূর্ণ এবং উষ্ণ জল। শ্যেন কৃশ হইলে উহাকে

১. ১ টঙ্ক=৪ মাষ।

২. মাটির তলাব ঘর।

৩. ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। অভিধানে দেখা যায়, কতক প্রকার উদ্ভিদের নাম "বহ্নি'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন marking-nut।

স্ত্রীস্তন্য১সংযুক্ত অথবা গাভীদুগ্ধজাত মাখনের সহিত মিশ্রিত মাংস দিতে হইবে। অগ্নিমান্দ্য হইলে উহাকর্তৃক লবঙ্গ অথবা নরমূত্রমিশ্রিত মাংস ভক্ষণীয়।

বর্ষাকালে শ্যেনপক্ষীর পুরাতন পালক ঝড়িয়া পড়ে এবং নূতন পালক জন্মে। ইহাতে বিলম্ব হইলে উহাকে 'শরটামিষ'২ দেয়। শ্যেনের পালক যদি কৃমিদষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে উহার প্রতিকার সমপান বিড়ঙ্গ, বহ্নি ও কস্তুরী।

শ্যেনের শ্বাসরোগের সাধারণ নাম 'শাখা'। উহা চতুর্বিধা—(১) অভিঘাত-সমুত্থা বা আঘাতজনিতা, (২) শ্লেষ্মজা, (৩) পিত্তজা, (৪) ক্ষৈণ্যজা বা ক্ষয়-রোগ। শেষোক্ত রোগকে শোষিতাও বলা হয়। প্রতিটি রোগেরই ঔষধের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মধ্যে শোষিতা রোগই মারাত্মক। ইহার প্রতিকার নানরূপঃ—নররুধিরসিক্ত কলবিঙ্ক মাংস, চটকার সদ্যমাংস, শূকরমাংস অথবা গাভীদুগ্ধজাত মাখনমিশ্রিত পক্ষিমাংস ইত্যাদি। এই রোগে মাঝে মাঝে 'কর্পূরসংযুক্ত বারি' পানও বিধেয়।

শ্যেনের নেত্রাভ্যন্তরে তাপ, ধূম বা কোন প্রকার আঘাত হেতু সাদা দাগ পড়িলে উহার নেত্রমধ্যে 'চাঙ্গেরী৩মূলচূর্ণ' প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহার বিকল্পব্যবস্থা—হরিদ্রা, নিম্বপত্র, মরিচ, হলুদ, হরিতকী, পিপ্পলী, মুস্তা৪ ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতির সমপরিমাণ অংশের অজামূত্রসিক্ত বটিকা।

কোন কোন সময়ে শ্যেনের মুখে খাদ্য পানীয়ের অনিয়মহেতু প্রদাহ দেখা যায়; এই রোগ শ্লেষ্মা এবং পিত্তজনিতও হইয়া থাকে। পিত্তজ প্রদাহে ক্ষীরীবৃক্ষের 'ছল্লিকা৫চূর্ণ' তিল তৈলে মিশ্রিত করিয়া উহার মাংসসহ সেবন বিধেয়। উহা প্রদাহে লেপনও করা যায়। অন্য কারণ-জনিত প্রদাহে অন্যরূপ ঔষধের ব্যবস্থা আছে।

শ্যেনের পায়ে কখনও কখনও ফোঁড়া ও প্রদাহ হয়; ইহার নাম গর্দভী। এই রোগ দীর্ঘকাল থাকিলে চান্দী নামে অভিহিত হয়। গর্দভীর প্রতিকার পিপ্পল ও উদুম্বর বৃক্ষের রস আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন প্রয়োগ; এইরূপ এক সপ্তাহ কাল করণীয়। ইহার বিকল্প ব্যবস্থা বিট্ প্রলেপ। চান্দী হইলে সেই স্থানে প্রথমতঃ জলৌকা বা জোঁক স্থাপন করিতে হইবে। তৎপর নবনীতমিশ্রিত হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ আক্রান্তস্থানে প্রয়োগ করিয়া বস্ত্র-

১. শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, ছাগদুগ্ধ। টীকা হইতে মনে হয়, এই শব্দে স্ত্রীলোকের দুগ্ধও বুঝাইতে পারে।

২. শরট—কৃকলাস।

৩. Oxalis monadelpha.

৪. Cyperus rotundus.

৫. ছল্লিকা অর্থাৎ ছাল।

খণ্ডে ঐ স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিতে হইবে। তিন দিন পর পর পুরাতন ঔষধ ও বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তন আবশ্যক। এইরূপে বার দিনে চান্দী প্রশমিত হয়।

কখনও কখনও আহত হইলে শ্যেনের শক্তিক্ষয় ও বিবর্ণতা লক্ষিত হয়। এই রোগের ঔষধ মাংসের সহিত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের সমপরিমাণ মিশ্রণঃ—দ্বিবিধ হরিদ্রা, তুত্থক,১ ভার্গী,২ মদন,৩ অর্কদুগ্ধ ও ঘৃত।

পর্যুষিত বা দুর্জর মাংস ভক্ষণে শ্যেনের উদরে কৃমি জন্মে। দুই ভাগ বিড়ঙ্গ এক ভাগ কস্তুরীব সহিত পান করিলে ঐ কৃমিনাশ হয়।

স্নান না করার ফলে কখনও কখনও শ্যেনের শরীরে লিক্ষা৪ ও যূক৫ জন্মে। ইহাদিগকে নষ্ট করিতে হইলে মাগধী৬চূর্ণ উহার শরীরে উদ্ধূলন৭ করিতে হইবে। ইহার বিকল্প ঔষধ গোমূত্রমিশ্রিত 'বিল্বমূল-ত্বক্'চূর্ণের প্রলেপ।

শ্যৈনিকশাস্ত্রেব শেষ দুই অধ্যায়ে (ষষ্ঠ ও সপ্তম) শ্যেনযুদ্ধের বিবরণ, শ্যেনযুদ্ধ দর্শনে বাজার আনন্দ ও ঐ যুদ্ধোত্তর কালে রাজার শ্রমাপনোদন পদ্ধতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

১ Blue vitriol—তুঁতে।
২ Siphonanthus indica.
৩ Vangueria Spinosa.
৪ সাধাবণ ভাষায, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, লিক্ (=উকুনের ডিম)।
৫ উকুন।
৬ লঙ্কা (long pepper)
৭ ধূলি (powder)ব ন্যায ছড়াইযা দেওযা।

কামশাস্ত্র

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য প্রতিটি পুরুষার্থ সম্বন্ধেই শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তৃতীয় পুরুষার্থ 'কাম' আলোচ্য।

'কাম' শব্দটি সংস্কৃতে ও বাংলায় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ইচ্ছামাত্র বুঝাইতেই এই শব্দের প্রয়োগ আছে। অথর্ববেদেও 'কাম' শব্দের এই অর্থ আছে বটে; কিন্তু, এই বেদের কতক অংশে পরবর্তী যুগের পুষ্পধন্বার অগ্রদূত একটি কামদেবের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের পরে 'কাম' শব্দ প্রেম বা ইচ্ছামাত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' এই শব্দ কামদেব, প্রেম ও স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণগুলিতেও 'কাম' শব্দের অনুরূপ প্রয়োগ আছে। 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি', 'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী প্রভৃতি স্থলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রেরই কামনা বা ভোগ্যবস্তুমাত্রই 'কাম' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আবার 'লক্ষ্ম্যাঃ কামুকো হরিঃ' প্রভৃতি স্থলে রিরংসা অর্থে 'কাম' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাংলায়ও সাধারণ কামনা ও সম্ভোগেচ্ছা অর্থে 'কাম' শব্বের ব্যবহার হয়; যথা—প্রীতিকাম, মনস্কাম, কামগন্ধ, কামান্ধ ইত্যাদি।

'কাম' মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। আর্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু, কামশাস্ত্রের উদ্ভব অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শাস্ত্রসমূহের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের যে ঔদাসীন্য, কামশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। কোন শাস্ত্রের উৎস নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করিতে না পারিলেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ দেবদেবীর অবতারণা করিয়া তাঁহাদের পবিত্র নামের সঙ্গে শাস্ত্রের উৎপত্তিকে যুক্ত করিতেন। ইহাতে শাস্ত্রে পবিত্রতা আরোপিত হইত এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী সমাজে পাঠক সহজেই শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইত। 'কামসূত্র' গ্রন্থে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতিসাধন ত্রিবর্গ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিয়াছিলেন এবং মহাদেবের অনুচর নন্দী ত্রিবর্গ হইতে কামকে পৃথক্ করিয়া কামসূত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন[১]। নন্দী স্বয়ং দেবতা না হইলেও দেবাদিদেবেরই ত অনুচর; সুতরাং শাস্ত্রের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

---

১. কামসূত্র—১।১।৫, ৮।

'কামসূত্র'ই যে এই শাস্ত্রের একমাত্র বা প্রাচীনতম গ্রন্থ নহে, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই রহিয়াছে। বাৎস্যায়ন নিম্নলিখিত পূর্বাচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেনঃ—

শ্বেতকেতু, বাভ্রব্য, দত্তক, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনর্দীয়, গোণিকা-পুত্র, সুবর্ণনাভ, কুচুমার (বা কুচিমার)।

'বৃহদারণ্যক উপনিষদে' উদ্দালক-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতে মনে হয়, সে-যুগেও প্রধানতঃ প্রজননবিদ্যা (Genetics) প্রসঙ্গে যৌনপ্রেমের সমস্যাবলী ঋষিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্বেতকেতু কামশাস্ত্রের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, অন্ততঃ উপনিষদের যুগ হইতে এই শাস্ত্র আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। বাৎস্যায়নের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, তাঁহার পূর্ববর্তী অধিকাংশ আচার্যই শাস্ত্রের একদেশ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বাভ্রব্যের শাস্ত্র ছিল অগাধ; সেজন্যই 'সংক্ষিপ্য সর্বমর্থমল্পেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতম্'। এক কুচুমারের গ্রন্থ ভিন্ন অপর সকল আচার্যের গ্রন্থই অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। কুচুমার-রচিত গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে[১]। 'কামসূত্র' ও উহার 'জয়মঙ্গলা' নামক টীকা হইতে জানা যায় যে, দত্তক পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি গণিকাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দত্তক ও দত্তক-সূত্রের উল্লেখ কোন কোন নাট্যগ্রন্থে পাওয়া যায়[২]।

বাৎস্যায়ন ও তৎকৃত 'কামসূত্র'

সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ দিক্‌পালের ন্যায় বাৎস্যায়নের জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মল্ল (বা, মল—) নাগ। তাঁহার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। কেহ কেহ তাঁহাকে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকের লেখক বলিয়া মনে করেন[৩]। কাহারও কাহারও মতে, ইনি আনুমানিক খৃষ্টীয় ৫ম শতকের পূর্ববর্তী হইতেই পারেন না[৪]।

'কামসূত্রে' গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের আকার ও বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা

১. দ্রঃ—M. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature, p. ৪88.

২. ঐ, পৃঃ ৮৮৭।

৩. ঐ, পৃঃ ৮৮৮।

৪. Keith : A History of Sanskrit Literature, p. 469. ডাঃ সুশীল দে মহাশয়ের মতে, বাৎস্যায়নের কাল আঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক। (Ancient Indian Erotics and Erotic Literature, p. 91).

করিয়াছেন। গ্রন্থটি ছত্রিশ অধ্যায়ে রচিত; ইহাতে সাতটি অধিকরণ; চৌদ্দটি প্রকরণ ও ১২৫০টি শ্লোক আছে। 'কামসূত্রে'র টীকাকারগণের মধ্যে যশোধরের নামই সর্বাধিক পরিচিত; তাঁহার টীকার নাম 'জয়মঙ্গলা'। 'কামসূত্রে'র সাতটি অধিকরণ এইরূপঃ—

(১) সাধারণ, (২) কন্যাসম্প্রযুক্তক, (৩) ভার্যাধিকারিক, (৪) বৈশিক,
(৫) পারদারিক, (৬) সাম্প্রয়োগিক ও (৭) ঔপনিষদিক।

উক্ত অধিকরণগুলিতে বাৎস্যায়নের আলোচিত সমস্ত বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এখানে সম্ভবপর নহে। প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম 'সাধারণ' নামক প্রকরণে বাৎস্যায়ন চারিটি পুরুষার্থের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় গ্রন্থের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে, অপরাপর পুরুষার্থের ন্যায় কামও সেবনীয়; কামপ্রবৃত্তি জীবের স্বভাবসিদ্ধ এবং ইহার চরিতার্থতা খাদ্যের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু কাম জীবমাত্রের সহজাত প্রবৃত্তি বলিয়া ইহা শাস্ত্রের অপেক্ষা করে না—এইরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, কামের চরিতার্থতার পদ্ধতি বিবেকহীন ইতরপ্রাণীর এবং বিবেকসম্পন্ন মানুষের একপ্রকার নহে; মানুষের পক্ষে কাম একটি কলাও বটে। সুতরাং এই সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ শাস্ত্রব্যতিরেকে হইতে পারে না।

ইহার পরে বাৎস্যায়ন কামসূত্রের অঙ্গস্বরূপ চৌষট্টি কলা বা বিদ্যার নামকরণ করিয়াছেন। এই চৌষট্টি বিদ্যার সঙ্গে চৌষট্টি কামকলারও বিধান আছে। এই বিদ্যাসমূহ বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয়। নৃত্যগীত হইতে আরম্ভ করিয়া সাজসজ্জা, ব্যায়াম, গৃহকর্মে নৈপুণ্য প্রভৃতি বিষয় এই বিদ্যাগুলির অন্তর্গত। বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় এই সকল বিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য। এই বিষয়ে কন্যার শিক্ষাগুরু হইবে তাহার ধাত্রী, সখী, সমবয়স্কা মাসীমা, বৃদ্ধা দাসী, ভিক্ষুকী অথবা ভগ্নী। প্রতিক্ষেত্রেই শিক্ষিকা হইবেন বিবাহিতা।

এই অধিকরণে নাগরকের জীবনযাত্রাপ্রণালী অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ইহা এইরূপ।

চতুর্বর্ণেয় লোকই নাগরকবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। এই জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা, অর্থ এবং দারপরিগ্রহ। নাগরকের বাসস্থান হইবে নগরে, পত্তনে, খর্বটে অথবা অন্য কোন সজ্জনাধ্যুষিত স্থানে[১]। এইরূপ স্থানে গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী নাগরক বাসগৃহ নির্মাণ করিবেন; গৃহে বিভিন্ন কার্যের

১. যশোধরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নগর—আটশত ক্ষুদ্র গ্রামবিশিষ্ট প্রদেশ, পত্তন—রাজধানী এবং খর্বট দুইশত ক্ষুদ্র গ্রামবিশিষ্ট প্রদেশ।

জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ এবং গৃহপার্শ্বে বৃক্ষবাটিকা ও নদী বাপী প্রভৃতি থাকিবে। বাসগৃহ হইবে দুইটি—একটি বাড়ীর বাহিরে ও অপরটি ভিতরে। বাহিরের ঘরে দুইটি সুন্দর উপাধান ও শুভ্র আস্তরণযুক্ত একটি শয্যা প্রস্তুত থাকিবে। তাহার পার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অপর একটি অনুরূপ শয্যা থাকিবে। উহার শিরোভাগে কুর্চাসনের (ব্রাকেট?) উপরে চিত্র স্থাপিত হইবে এবং একটি বেদিকা (টেবিল?)তে মাল্য অনুলেপনাদি রক্ষিত হইবে। মাটিতে থাকিবে পতদ্‌গ্রহ বা পিক্‌দানী, বীণা, তুলিকা ও বর্ণ প্রভৃতি চিত্রের উপকরণ, পুস্তক ও পাশা খেলার সরঞ্জাম। ঐ গৃহের বাহিরে খাঁচায় পাখী থাকিবে। বাগানে একটি দোল্‌না ও লতামণ্ডপের মধ্যে পরিষ্কৃত ভূমিতে একটি বেদি (স্থণ্ডিলপীঠিকা) থাকিবে।

অন্তঃপুরিকাগণের বাসোপযোগী অভ্যন্তরের গৃহও নানা উপকরণে সজ্জিত থাকিবে।

নাগরক প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিবেন এবং পরিমিত গাত্রানুলেপনপূর্বক ওষ্ঠ অলক্তক-রঞ্জিত করিয়া দর্পণে মুখ দেখিবেন এবং তাম্বূল চর্বণ করিয়া কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি নিত্য স্নান করিবেন; প্রতি দ্বিতীয় দিনে শরীরে তৈলচন্দনাদির প্রয়োগ, তৃতীয় দিনে ফেনক[১] দ্বারা গাত্রঘর্ষণ, চতুর্থ দিবসে ক্ষৌরকর্ম প্রভৃতি নিয়ম তাঁহার পালনীয়। মধ্যাহ্ননিদ্রার পর নাগরক কেশপ্রসাধন করিয়া অপরাহ্নে গোষ্ঠীতে বা বন্ধুবান্ধবের সভাসমিতিতে বিহার করিবেন। সন্ধ্যাকালে সঙ্গীতসুখ উপভোগ করিয়া তিনি পুষ্পশোভিত ও ধূপাদিদ্বারা সুবাসিত গৃহে রাত্রিযাপনার্থ যাইবেন।

নাগরক মাঝে মাঝে অন্য নাগরকের বাড়ীতে বা বারাঙ্গণাগৃহে বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে নৃত্যগীত ও পানাদি করিতে পারেন।

'কামসূত্রে'র দ্বিতীয় অধিকরণের নাম কন্যাসম্প্রযুক্তক। ইহাতে পূর্ব-রাগ ও বিবাহাদির আলোচনা করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত অষ্টপ্রকার বিবাহের[২] উল্লেখ করিয়া বাৎস্যায়ন প্রথম চারিটি ধর্ম্য বিবাহের স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত বিধানের আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিবাহে কন্যার যোগ্যা-যোগ্যতাব বিচারও করা হইয়াছে। এই ব্যাপারেও বাৎস্যায়ন স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। বর্জনীয়া কন্যাগণের মধ্যে কয়েকটি এইরূপ :—

ভঙ্গিকা, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি অপ্রশস্ত নামধারিণী, পুরুষাকৃতিসম্পন্না, বৃহল্ললাটা, নক্ষত্রনাম্নী, বৃক্ষনাম্নী, নদীনাম্নী ইত্যাদি।

কন্যার বিবাহযোগ্যতার প্রধান প্রমাণ তদ্দর্শনে বরের মন ও চক্ষুর তৃপ্তি।

১. আধুনিক সাবানজাতীয় ফেনাযুক্ত দ্রব্য।
২. ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, গান্ধর্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস।

ধর্ম্য বিবাহের সুযোগ না ঘটিলে শেষোক্ত চারিপ্রকার বিবাহের অন্যতম করণীয়। এই প্রকার বিবাহগুলির মধ্যে গান্ধর্ববিবাহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; কারণ, ইহা 'অনুরাগাত্মক', ইহাতে ক্লেশভোগ অল্প এবং বরণের বিধানও নাই।

তৃতীয় অধিকরণে গ্রন্থকার বিবাহিতা নারীর ইতিকর্তব্যতা আলোচনা করিয়াছেন; এই অধিকরণের নাম 'ভার্যাধিকারিক'। ভার্যা দ্বিবিধা—একচারিণী ও সপত্নীকা। একচারিণী সর্বপ্রকারে পতির মতানুবর্তিনী হইবেন। তিনি ঘরবাড়ী পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত রাখিবেন, নানাপ্রকার পত্র-বৃক্ষের দ্বারা বৃক্ষবাটিকা মনোরম করিবেন এবং পতির আত্মীয়স্বজনের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিবেন। স্বামীর রুচিকর ভোজ্যদ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিয়া তিনি সর্বদা তাঁহার সেবায় নিরতা থাকিবেন। কিন্তু, স্বামী কখনও অতি-ব্যয় বা অসদ্ব্যয় করিলে গোপনে তিনি তাঁহাকে সংযত করিবেন। পতির সাম্বৎসরিক আয় হিসাব করিয়া সেই অনুসারে তাঁহার অর্থব্যয় বিধেয়। একচারিণী ভার্যা সর্বদা ভিক্ষুকী, শ্রমণা, ক্ষপণা১, কুলটা, কুহকা২ ও মূল-কারিকা৩ প্রভৃতির সঙ্গ পরিত্যাগ কবিবেন। নিজের ধন ও স্বামীর সহিত মন্ত্রণাব কথা অপরকে তিনি বলিবেন না। গুরুজনেব শুশ্রূষা, প্রচণ্ড আলাপ ও উচ্চহাস্যের বর্জন, সৌভাগ্যে গর্বপ্রকাশ না করা, পরিজনের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রভৃতি একচারিণী ভার্যার কর্তব্য। প্রোষিতভর্তৃকা একচারিণী অতি সাধাবণ বেশে পতির সংবাদ অন্বেষণে যত্নবতী হইয়া দিনযাপন করিবেন, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের নিকট শয়ন করিবেন, পতির আরব্ধ কার্য সমাপন করিবেন এবং উৎসব ব্যসন ব্যতীত পতির জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীতে যাইবেন না, গেলেও অধিককাল থাকিবেন না।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, পত্নীব শঠতা, চরিত্রহীনতা, বন্ধ্যাত্ব, নিরবধি কন্যাজনন প্রভৃতি কারণে পতি পুনর্বার দারপরিগ্রহ করেন; কখনও কখনও স্বীয় চপলতাবশতঃও তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠা সপত্নী কনিষ্ঠার প্রতি ভগ্নীর ন্যায় আচবণ করিবেন ও তাহাকে উপদেশ দিবেন। কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠাকে মাতৃবৎ মনে করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবেন, জ্যেষ্ঠার সন্তানকে নিজের সন্তান অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিবেন।

এই প্রকরণে ভার্যার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনাক্রমে গ্রন্থকার পুনর্ভূ-পত্নীর উল্লেখ করিয়াছেন। পুনর্বিবাহিতা বিধবার নাম পুনর্ভূ। এইরূপ পত্নীর আচরণও অন্য পত্নীর আচরণের ন্যায়।

১. রক্তবস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী।
২. কৌতুককারিণী।
৩. বশীকরণমূলকর্মকারিণী।

প্রসঙ্গক্রমে বাৎস্যায়ন 'দুর্ভগা' ভার্যার আচরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পতির বিরাগভাজন পত্নীকে বলা হয় দুর্ভাগা। এইরূপ ভার্যা সর্বতো-ভাবে পতির মনোরঞ্জনে যত্নবতী হইবেন; এমন কি, স্বামী কোন পরস্ত্রীকেও যদি প্রচ্ছন্নভাবে কামনা করেন, তাহা হইলে দুর্ভগা তাঁহার সেই কামনা পূর্ণ করিবেন।

রাজার পক্ষে পরিণীতা পত্নী ছাড়া বেশ্যা, নাটকব্যবসায়িনী এবং 'আভ্যন্তরিকা' রমণীও সম্ভোগযোগ্যা। 'আভ্যন্তরিকা' অর্থাৎ অন্তঃ-পুরিকা; সম্ভবতঃ অন্তঃপুরস্থা দাসী।

বৈশিক অধিকরণে বাৎস্যায়ন বেশ্যাগণের শ্রেণীবিভাগ, জীবনযাত্রা ও কলাকৌশল বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বেশ্যা ত্রিবিধা—একপরিগ্রহা, অনেক-পরিগ্রহা ও অপরিগ্রহা। একপরিগ্রহা একজন পুরুষের প্রতি ও অনেক-পরিগ্রহা অনেকেব প্রতি আসক্তা। অপরিগ্রহা কোন পুরুষবিশেষের প্রতি আসক্তা হয় না; নানা উপায়ে সে ধনোপার্জন করে।

অন্যপ্রকারে বেশ্যা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভ-দাসী। ইহাদের প্রত্যেকটি উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। উত্তম-গণিকা দেবমন্দিব স্থাপন, লোকের সুবিধার জন্য তড়াগ সেতু প্রভৃতির নির্মাণ, ব্রাহ্মণগণকে দান প্রভৃতি কার্য করে। রূপাজীবা সর্বাঙ্গ অলঙ্কার-ভূষিত করে এবং প্রকাণ্ড গৃহ নির্মাণ করাইয়া উহা মহামূল্য ভাণ্ডাদি-দ্বারা সুশোভিত করে। কুম্ভদাসী শুক্লবস্ত্রপরিহিতা হইয়া সুবর্ণলেশ-যুক্ত অলঙ্কার ধারণ কবে। কুম্ভদাসীকে বলা হইয়াছে সামান্যকর্মকরা।

অপর একস্থানে বাৎস্যায়ন বেশ্যাগণের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ কারয়াছেন ঃ—

(১) কুম্ভদাসী, (২) পরিচারিকা, (৩) কুলটা, (৪) স্বৈরিণী, ।৫) নটী, (৬) শিল্পকারিকা, (৭) প্রকাশবিনষ্টা, (৮) রূপাজীবা ও (৯) গণিকা। যশোধর টীকায় বলিয়াছেন যে, গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভদাসী—এই তিন শ্রেণীই প্রধান; অপরগুলি ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রভুর পরিচর্যাকারিণীর নাম পরিচারিকা। পতিভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যে গৃহান্তরে গিয়া পুরুষান্তরের সহিত সম্প্রযুক্ত হয় সে কুলটা। স্বৈরিণী পতিকে তিরস্কার করিয়া স্বগৃহে বা পরগৃহে অন্য পুরুষাসক্ত হয়। নটীকে বলা হইয়াছে রঙ্গ-যোষিৎ, অর্থাৎ যে নাটকাদিতে অংশ গ্রহণ করে। রজক ও তন্তুবায় প্রভৃতির ভার্যাকে বলা হয় শিল্পকারিকা। পতির জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে কামচারপরায়ণা স্ত্রীকে বলা হয় প্রকাশবিনষ্টা।

বেশ্যাগণ পীঠমর্দ, বিট, শৌণ্ডিক, ভিক্ষুক প্রভৃতিকে নিজকর্মের

সহায়ক করিবে। এইরূপ ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার লোকের সংস্পর্শে আসে; সুতরাং ইহারা বেশ্যাসক্ত লোক সংগ্রহ করিতে সক্ষম।

নবীন যুবক, অর্থাধিকারে অধিকৃত, 'অকৃচ্ছ্রাধিগতবিত্ত' অর্থাৎ যাহার কষ্ট করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হয় না, যাহার কথা রাজা বা মহামাত্র শ্রদ্ধা করেন, ধনবানের একমাত্র পুত্র, প্রচ্ছন্নকাম সন্ন্যাসী প্রভৃতি বেশ্যার গম্য পুরুষ বলিয়া বাৎস্যায়ন নির্ধারণ করিয়াছেন।

পঞ্চম অধিকরণের নাম পারদারিক। ইহাতে পরস্ত্রীগমন সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বাৎস্যায়ন পুরুষের উদ্দেশ্যে নানারূপ সতর্কবাণী বলিয়াছেন। পরস্ত্রীকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যত্নসাধ্যা ও অযত্নসাধ্যা। তাহারা যত্নসাধ্যা যাহাদিগকে পাইতে হইলে পুরুষের অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। যাহারা অনায়াসলভ্য তাহারা অযত্নসাধ্যা।

সাম্প্রয়োগিক নামক ষষ্ঠ অধিকরণে স্ত্রীসম্ভোগের নানা প্রকারভেদ আলোচিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ব্যাপারটিকে কলা-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রন্থকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়াদির নির্দেশ হইয়াছে। কামপ্রবৃত্তির বশে যথেচ্ছাচার ও পাশবিকতা স্পষ্টভাবে নিন্দিত হইয়াছে। প্রণয়-কলহের প্রসঙ্গদ্বারা বাৎস্যায়ন বর্তমান অধিকরণের উপসংহার করিয়াছেন। নায়কের অপ্রিয় বাক্য ও অপ্রীতিকর আচরণে নায়িকার ক্রোধ হইতে পারে। নায়ক কর্তৃক নায়িকার নিকট তাহার সপত্নীর গুণকীর্তন, সপত্নীর নামে নায়িকার আহ্বান প্রভৃতি অপ্রিয়বাক্য। নায়িকার সপত্নী-কক্ষে নায়কের গমন, ঐ সপত্নীর উদ্দেশ্যে তাম্বুলাদিপ্রেষণ ও তাহার সহিত নায়কের মিলন প্রভৃতি নায়িকার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর। এই সকল কারণে নায়িকা কুপিতা হইয়া রোদন, শয্যা হইতে ভূমিতে পতন, ভূষণাদি বর্জন প্রভৃতি দ্বারা কলহের সূত্রপাত করিবেন। তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিতে নায়ক তাঁহাকে নানারূপ অনুনয় বাক্য বলিবেন, এমন কি নায়িকার পাদপতনও তাঁহার পক্ষে বিধেয়। অবশ্য, বেশ্যা বা পরস্ত্রীর ক্ষেত্রে নায়ক-কর্তৃক পাদপতন নিষিদ্ধ। কলহের মধ্যেও নায়িকা মাত্রালঙ্ঘন করিবেন না। ক্রোধবশে গৃহাভ্যন্তরে তিনি যাহাই করুন, বহির্গমন তাঁহার পক্ষে বিধেয় নহে। তাঁহার বহির্গমনে নায়কের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, ক্রোধচ্ছলে নায়িকা পুরুষান্তরের সহিত মিলিতা হইবেন।

'কামসূত্রে'র সর্বশেষ অধিকরণের নাম 'ঔপনিষদিক'। 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থ রহস্য, যাহা নিভৃতে শিক্ষিত হয়। এই অধিকরণে এমন কতক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যেগুলি গোপনে অভ্যাস বা প্রয়োগ করিতে হয়। সম্ভবতঃ এই জন্যই অধিকরণটির এবম্বিধ নামকরণ হইয়াছে। এই অধিকরণের প্রধান আলোচ্য বিষয় সুভগঙ্করণ, বশীকরণ ইত্যাদি। দুই

একটি কৌতুককর বিষয় একটু স্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে। সুভগংকরণ অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে দেহসৌন্দর্য ও তারুণ্য বৃদ্ধি করা। রূপলাবণ্য বৃদ্ধির জন্য পুনর্নবা, সহদেবী (নীল ঝিঁটি), সারিবা (অনন্তমূল), কুরণ্ট ও পদ্ম-পত্রের সহিত সিদ্ধ তিলতৈলের গাত্রাভ্যঙ্গ, শুষ্ক পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মফুল ও নাগকেশর পুষ্পের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন বিধেয়। বশীকরণে স্ত্রীকর্তৃক পুরুষের ও পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীর বশে আনয়নের নানা প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, গণিকার বিবাহবিধিও 'কামসূত্রে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিবাহ এক বৎসরের জন্য বলবৎ থাকে। এই কালসীমা অতিবাহিত হইলে কোন বিবাহ-বন্ধন থাকে না এবং স্বেচ্ছাক্রমে গণিকা পুরুষান্তরের নিকট গমন করিতে পারে।

'কামসূত্রে' সমাজ-চিত্র

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে 'কামসূত্রে'র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়। সমাজতত্ত্বের (Sociology) দিক্ হইতে এই গ্রন্থটি অমূল্য। নাগরক ও তৎপল্লীব জীবনযাত্রার নিখুঁত বিবরণ, আনুষঙ্গিক প্রসাধন দ্রব্য এবং বাসগৃহের বর্ণনা প্রভৃতি হইতে বাৎস্যায়ন-পরিকল্পিত সমাজটি যেন পাঠকের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিভিন্ন নারী-প্রকৃতির ও নারীরূপের আলোচনায় বাৎস্যায়ন ভারতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান অঞ্চলের নারীচরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অঞ্চলগুলির নাম মধ্যপ্রদেশ, বাহ্লীক, অবন্তি, মালব, আভীর, 'সিন্ধু-ষষ্ঠ' নদীসমূহের[১] মধ্যবর্তী স্থান, অপরান্ত[২], লাটদেশ, স্ত্রীরাজ্য[৩], কোশল, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, বনবাস[৪] ও গৌড়। গৌড়নারীর প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী ও কোমলাঙ্গী; মনে হয়, এই অঞ্চলের নারীদিগকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

'কামসূত্রের ঔপনিষদিক অধিকরণে আলোচিত বশীকরণ, নষ্টরাগ-প্রত্যানয়ন, সুভঙ্গকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি জনসাধারণের বিশ্বাস ও তৎকালে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির সাক্ষ্য বহন করে।

সমাজে গণিকার স্থানটি 'কামসূত্রে' স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। নিজের কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে গণিকা সেই কন্যার স্বভাব-চরিত্র, বিদ্যা ও

---

১. বিপাশা, শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধু।
২ 'পশ্চিমসমুদ্রসমীপেঽপরান্তদেশঃ'—যশোধর।
৩. 'বজ্রবন্তদেশাৎ পশ্চিমেন'—ঐ।
৪. 'কুঙ্কণবিষয়াৎ পূর্বেণ'—ঐ।

রূপের যোগ্য কতক পাত্রের সমাবেশ করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে বলিবে—যে নির্ধারিত বহুমূল্য বস্তুসমূহ দিবে, সে-ই ইহাকে বিবাহ করিবে। সেই যুবতীটি মাতার অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে বাহিরে গিয়া বিত্তশালী নাগরকপুত্রগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিবে। বিনা কারণে যেখানে সেখানে তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া অশোভন মনে হইতে পারে। সুতরাং কোন কলাশিক্ষার অজুহাতে বা সঙ্গীতাদিচর্চা উপলক্ষ্যে গন্ধর্ব-শালায় তাহাদের সংসর্গে ঐ যুবতী থাকিবে। মাতা যখন দেখিবেন, কোন যুবক ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে, তখন সেই যুবকের সহিতই কন্যাবিবাহের ব্যবস্থা করিবেন।

বৈশিকপ্রকরণে বাৎস্যায়ন বেশ্যাগণের শ্রেণীবিভাগ ও বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সমাজের একটি অতি বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ্যা যে শুধু বেশ্যালয়েই থাকিত তাহা নহে, গৃহস্থালয়েও প্রচ্ছন্ন বেশ্যা ছিল; যথা কুলটা, পরিচারিকা, স্বৈরিণী ইত্যাদি। একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, 'বেশ্যা' বলিতে সাধারণতঃ মনে যে অবজ্ঞার উদ্রেক হয়, কামসূত্রের গণিকা ঠিক তাহার পাত্র নহে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গণিকা তৎকালীন সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী ছিল। গণিকা ছিল hetaera ; prostitute বা harlot নহে। 'মৃচ্ছকটিকে'র বসন্তসেনা ছিলেন এই জাতীয়া রমণী।

বাৎস্যায়নের গ্রন্থপাঠে মনে হয়, তিনি ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্য-জীবনকে মর্যাদা দিয়াছেন। গার্হস্থ্যজীবনের যতটুকু ধর্মের সহিত যুক্ত ততটুকু তিনি অস্বীকার করেন নাই; যেমন, সবর্ণ স্ত্রীর পরিণয়, ঔরস-পুত্রলাভ ইত্যাদি। কিন্তু, পুরুষের পক্ষে তিনি নারীর দ্বিবিধ প্রয়োজন অনুমোদন করিয়াছেন—একটি পুত্রার্থ, অপরটি সুখার্থ।

সেই যুগেও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, 'কামসূত্র' তাহার সাক্ষ্য বহন করে। 'কন্যা-সম্প্রযুক্তক' প্রকরণে 'অধর্ম্য' গান্ধর্ববিবাহের প্রতি বাৎস্যায়নের পক্ষপাত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, সমগ্র 'বৈশিক অধিকরণ'টিই স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়। বেশ্যাগণের উপভোগ ব্যাপারে সবর্ণ অসবর্ণের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় নাই। যাহার নিকট হইতে অধিকতর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, সে-ই বেশ্যার গম্য। 'পারদারিক অধিকরণে'ও বর্ণ-বিচার লক্ষিত হয় না। সংক্ষেপে বাৎস্যায়নের মত এই যে, পুত্রার্থে নারী-সম্ভোগ ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী করণীয়; কিন্তু সুখার্থ সম্ভোগে ভোগীর স্বাধীনতা আছে। বাৎস্যায়নের সমাজ বিধবার সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল বলিয়া মনে হয়। বিধবাকে তাহার অভিপ্রেত পুরুষের সঙ্গে বাস করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত।

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র যুগে নাগরিক জীবনে এবং সেনাদলে বেশ্যা ও গণিকার সম্ভোগ যে প্রচলিত এবং অনুমোদিত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ ঐ দুইটি গ্রন্থে আছে১। ঐ যুগে বিশিষ্ট অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য গণিকাগণের নৃত্যগীতাদি প্রায় অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত।২ বর্তমান যুগে জাপানে অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। জাপানী গেইশা (Geisha) বালিকাগণ প্রাচীন ভারতীয় গণিকার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। সে-যুগে ভারতীয় সমাজে গণিকা যে মর্যাদার অধিকারিণী ছিল, প্রাচীন গ্রীস্ দেশে এবং মধ্যযুগীয় ইওরোপ ও এশিয়ার স্থানে স্থানে বারনারীর এক বিশেষ সম্প্রদায় সেই মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।৩ ভারতীয় গণিকার মর্যাদা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত যাত্রার মন্ত্রটি প্রণিধানযোগ্য ঃ— ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা .. .. দ্বিজনৃপ-গণিকা. . . .দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ ॥

আধুনিক যৌনবিজ্ঞান (Sexology) ও সুপ্রজননবিদ্যার (Eugenics) সঙ্গে 'কামসূত্রে'র তুলনার কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক যৌন-বিজ্ঞান ও কামসূত্রের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য প্রধান। বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী বেশ্যাগমন নিন্দিত। সুতরাং, সাধারণতঃ এ-বিষয়ের আলোচনা আধুনিক যুগে হয না। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ (birth-control) একটি অপরিহার্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ের আলোচনা বর্তমান যুগের গ্রন্থাদির অনেক অংশ অধিকার করে। কিন্তু, 'কামসূত্রে' ইহা আদৌ নাই। আধুনিক কালের যৌনবিজ্ঞান যে-পরিমাণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, 'কামসূত্র' ঠিক তেমন নহে। আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, আধুনিক যৌনবিজ্ঞান স্ত্রীলোকের মন ও শরীরের প্রতি যে-পরিমাণ অবহিত 'কামসূত্রে' সেই পরিমাণ মনোযোগ দেখা যায় না। 'কামসূত্রে' পুরুষের ভোগই যেন মুখ্য, নারীর স্থান গৌণ। Eugenics সম্বন্ধে কোনপ্রকার আলোচনাই এই গ্রন্থে নাই। পুরুষের স্ত্রীসম্ভোগ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হইতে পাবে, তাহাই বাৎস্যায়নের লক্ষ্য; কি করিয়া সুস্থ সুন্দর সন্তান লাভ করা যায়, তাহার চিন্তা তিনি করেন নাই। গান্ধর্ববিবাহ যাঁহার মতে উৎকৃষ্ট বিবাহপদ্ধতি, তিনি স্বভাবতঃই বর-কন্যার অনুরাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। সুতরাং

১ যথা—বামায়ণ—২।৩।১৭-১৮; ২।৩৬।১২।
মহাভারত—৪।৩৪।১৭-১৮; ৫।১৯৫।১৮-১৯।

২. যথা—রামায়ণ—৬।১২৭।১ ও তৎপববর্তী কতক শ্লোক।
মহাভাবত—৫।৮৬।১৫-১৬, ১২।৩২৫-৩৩।

৩. দ্রঃ—J. J. Meyer : Sexual Life in Ancient India, p. 271-275.

উভয়ের মিলনের ফলস্বরূপ সন্তান কিরূপ হইবে, সেই চিন্তার অবসর বাৎস্যায়নের শাস্ত্রে নাই।

সংস্কৃত কাব্যনাটকাদিতে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে কামশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। বাৎস্যায়নের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; সুতরাং কোন্ কোন্ কবি ও নাট্যকার তদীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে, আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'ই এই শাস্ত্রের একমাত্র গ্রন্থ নহে। তাঁহার পূর্বে ও পরে কামশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', ভবভূতির 'মালতীমাধব', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', 'চতুর্ভাণী' বিশেষতঃ ঈশ্বরদত্তের 'ধূর্তবিটসংবাদ',ও শ্যামলিকের 'পাদতাড়িতক', দামোদরগুপ্তের 'কুট্টনীমত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রণয় এবং কামের চিত্রায়ণে নাট্যকার ও কবিগণ কামশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল—একথা মনে করা অযৌক্তিক নয়।

কামশাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ

বাৎস্যাযনের পরবর্তী কালের কামশাস্ত্র-বিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারগণের মৌলিক চিন্তার নিদর্শন নাই। এই গ্রন্থগুলিতে তাঁহারা প্রায়ই শুধু সাম্প্রয়োগিকের আলোচনা করিয়াছেন। ক্বচিৎ ঔপনিষদিকের আলোচনাও দেখা যায়। একমাত্র শেষোক্ত গ্রন্থটি বিস্তৃত। কিন্তু, গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা বাৎস্যায়নের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত।

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	গ্রন্থকার	কাল
অনঙ্গরঙ্গ১	কল্যাণমল্ল	১৪৮৮-১৫১৭ খৃষ্টাব্দ।
কন্দর্পচূড়ামণি২	বীরভদ্রদেব (বঘেলবংশীয়)	১৫৭৭ ”
পঞ্চসায়ক৩	জ্যোতির্মল্ল বা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখর (মৈথিল)	খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ।
দেশোপদেশ নর্মমালা	ক্ষেমেন্দ্র	খৃষ্টীয় একাদশ শতক।

১. (ক) সং রামশাস্ত্রী লাহোব, ১৮৯০।
(খ) সং বিষ্ণুপ্রসাদ ভাণ্ডাবী, বাবাণসী, ১৯২৩।
ইহাব ইংবাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।
২ সং রামশাস্ত্রী, লাহোব, ১৯২৬।
৩. সং সদানন্দ শাস্ত্রী, লাহোর, ১৯২১।

নাগরকসর্বস্ব[১]	পদ্মপণ্ডিত বা পদ্মশ্রীজ্ঞান	আঃ খৃষ্টীয় ১০ম হইতে ১৪শ শতকের মধ্যবর্তী কাল।
রতিরহস্য[২]	কোক্কাচার্য বা কুক্কোক	খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী।
রতিরত্নপ্রদীপিকা[৩]	মহারাজ দেবরাজ	খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক।
রতিমঞ্জরী	জয়দেব ('গীতগোবিন্দ'কার হইতে পৃথক্)	

১. সং তনসুখরাম শর্মা (জগজ্জ্যোতির্মল্লের টীকা সহ), বোম্বাই, ১৯২১।

২ সং দেবীদত্ত পরজুলি (কাঞ্চীনাথের টীকা সহ), লাহোর। R. Schmidt কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ, Lotus Verlag, Berlin, 1903.

৩. সং কে, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার (ইংরাজী অনুবাদ সহ) মহীশূর, ১৯২৩।

সঙ্গীতশাস্ত্র[১]

'সংগীত' শব্দের অর্থ

সম্ পূর্বক 'গৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এই শব্দটির অর্থ গীত বা গান। কিন্তু, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য—এই তিন অর্থেই 'সংগীত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[২]। বাদ্য গীতকে এবং নৃত্য বাদ্যকে অনুসরণ করে। সুতরাং এই তিনের মধ্যে গীতই প্রধান বলিয়া এই তিনের সমবায়কে 'সংগীত' বলা হইয়াছে। সংগীতকে অনেক স্থলে গান্ধর্ববিদ্যা বা পঞ্চমবেদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সংগীতশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক বিদ্যা আয়ত্ত করিতেই তাহা বিধিবদ্ধ প্রণালীতে অভ্যাস করিতে হয়। ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে ব্যাকরণের প্রয়োজন, আবার ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য সংজ্ঞা পরিভাষা আবশ্যক; সংজ্ঞা পরিভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বর্ণজ্ঞান দরকার। ঠিক এই ভাবেই সংগীতের স্বর, তাল, লয়, রাগ প্রভৃতি শিক্ষা করা প্রয়োজন, আবার এইগুলি শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমান যুগে, ভারতে নানাবিধ সংগীত প্রচলিত আছে। কিন্তু, কোন কোন প্রকারের সংগীতে নানাদেশীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রকৃত ভারতীয় ধারাটি উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন আবশ্যক।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে যুগ অতীত হইয়াছে সে যুগের সংগীত-ধারাকে পুনর্জীবিত করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, বর্তমান অতীতেরই অনুবৃত্তিমাত্র। সুতরাং কোন সংস্কৃতির বর্তমান রূপটি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার অতীত রূপটির সহিত পরিচয় আবশ্যক। কোন মানুষের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য তাহার কুল বা বংশাবলীর খোঁজ নিতে হয়। অনুরূপভাবেই ভারতীয় সংগীতের যথার্থ স্বরূপ অধিগত করিতে হইলে ইহার শুধু প্রচলিত রূপটির পর্যালোচনা করিলেই চলিবে না: ইহার ঐতিহ্য ও ক্রমপ্রবহমান ধারাটিকেও জানিতে হইবে।

---

১. সংস্কৃতে রচিত ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সর্ব-সাধারণের উপযোগী করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইল। প্রচলিত সংগীত হইতে দুই এক ব্যাপারে ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও শাস্ত্রীয় রূপটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই নিবন্ধটি রচিত হইয়াছে।

২. গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।

ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি

ভারতবর্ষে সংগীতের ধারা চিরপ্রবহমানা। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাগ্-বৈদিক সিন্ধু-সভ্যতার যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সপ্তছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশী, মৃদঙ্গ, বীণা, করতাল, নৃত্যপরায়ণ নরনারীর মূর্তি প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে সেই সুদূর অতীতে (আঃ খৃঃ পূঃ ৩০০০-২৫০০), যখন পৃথিবীর অনেক সভ্যতার জন্মই হয় নাই, ভারতে সংগীত সুজ্ঞাত ছিল। বৈদিক যুগে (আঃ ২৫০০-১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সেই সংগীতধারা অনেক পরিমাণে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের যুগ হইতে সংগীত যেন আর্যগণের শোণিতপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। যে ঋক্‌সমূহে নৈসর্গিক পদার্থদর্শনে আর্যমনের বিস্ময়বিহ্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, দার্শনিক চিন্তা ব্যক্ত হইয়াছে, দেবদেবীর স্তুতিগান করা হইয়াছে সেগুলি সবই ত গান! উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরই ত ঋক্‌মন্ত্রের প্রাণ। এই বেদের অষ্টম মণ্ডলটি 'প্রগার্থ' বা গানবহুল। যে ঋক্‌গুলি যাগযজ্ঞে গীত হইত, প্রধানতঃ তাহাদের সমষ্টিই সামবেদ। সামগান ছিল তদানীন্তন ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। সামগানগুলির মধ্যে কতক ছিল অরণ্যগেয় এবং কতক গ্রামগেয়। পূর্বোক্ত প্রকারের গান ছিল অরণ্যবাসী ঋষিগণের জন্য, আর শেষোক্ত প্রকার গান ছিল গৃহীর জন্য। গ্রামগেয় গান হইতেই পরবর্তী ভারতীয় গানের উদ্ভব বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন।

গান ছাড়াও বৈদিক সাহিত্যে নৃত্য এবং ক্ষোণী, বাণ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে১।

ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক ও উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে সংগীতের সহিত আর্যগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েব প্রমাণ আছে।

'নারদীয় শিক্ষা'তে সাত স্বব, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা ও ঊনপঞ্চাশ তানের উল্লেখ আছে।

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র উৎপত্তি, অনেক পণ্ডিতের মতে ভ্রমণশীল গায়কদের গীতি হইতেই হইয়াছিল। এই দুই মহাকাব্যের বর্তমান রূপে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাদের যাগযজ্ঞাদিতে এবং সভায় নানারূপ সংগীতচর্চার ব্যবস্থা ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ভিন্টারনিৎস্ এর মতে, 'রামায়ণ' বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল সম্ভবতঃ খৃঃ ২য় কি ৩য় শতকে এবং 'মহাভারতে'র অধুনাপ্রাপ্ত রূপটি উদ্ভূত হইয়াছিল আনুমানিক খৃঃ চতুর্থ শতকে।

পুরাণ গ্রন্থাদিতে সংগীতের সহিত লেখকগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রচুর

১ সংগীত ও সংস্কৃতি (উত্তবভাগ), পৃঃ ১৮।

প্রমাণ রহিয়াছে। পুরাণগুলির মধ্যে এই বিষয়ে তথ্য সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যায় 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' ও 'বায়ুপুরাণে'। এই দুইটি পুরাণের রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ ৩য় হইতে ৫ম শতাব্দী। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' সপ্তস্বর, গ্রাম, রাগ, মূর্ছনা, তান, তাল, লয় প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া, বেণু, বীণা, পণব, মৃদঙ্গ, পটহ, দুন্দুভি ও শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যের উল্লেখও ইহাতে রহিয়াছে। নৃত্যেরও যে বিশেষ প্রচলন ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এই পুরাণে আছে। এই গ্রন্থের ২৩শ অধ্যায়েই সঙ্গীতের তথ্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; তথ্যই আছে, তত্ত্ব নাই। স্বর, গ্রাম প্রভৃতির উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে, কিন্তু উহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা নাই। 'বায়ুপুরাণে' (অধ্যায় ৮৬—৮৭) সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা ও ঊনপঞ্চাশ তানের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রামের সহিত মূর্ছনার সম্বন্ধ ও মূর্ছনাগুলির নামের সার্থকতা প্রভৃতির আলোচনা আছে। এই বিষয়গুলি ছাড়াও এই পুরাণে গীতালঙ্কার, বর্ণ, স্থান ও তাল ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালিকাপুরাণে' কতগুলি রাগের নাম আছে।

কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থেও সংগীতশাস্ত্রের অল্পবিস্তর তথ্য নিহিত আছে। এইরূপ তন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'যামলতন্ত্রে'র অন্তর্গত 'বীণাতন্ত্র'।

প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য বীণাবাদ্য, শ্রুতি, জাতি ও তালের জ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[১]।

সংস্কৃতে রচিত কাব্যনাটকাদির মধ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য—এই ত্রিবিধ সঙ্গীতের সম্বন্ধেই নানা তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' ও 'মেঘদূত', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

সংগীতশাস্ত্রের বহুগ্রন্থ পুঁথি আকারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। অতি অল্পসংখ্যক সংগীতগ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের শুধু নাম গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা প্রধান প্রধান সংগীতগ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রন্থই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) নাট্যশাস্ত্র

ইহাই আবিষ্কৃত সংগীতগ্রন্থ সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহাকে

১. বীণাবাদণতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি॥ প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, ১১৫।

ভরতমুনি১ কর্তৃক প্রণীত বলিয়া মনে করা হয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, দেবগণ চক্ষু ও কর্ণের যুগপৎ তৃপ্তিকর কোন কলা রচনার জন্যা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন। ফলে, ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামক পঞ্চম-বেদ সৃষ্টি করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গান নিলেন সামবেদ হইতে, তান্ডবনৃত্য শিব হইতে ও লাস্যনৃত্য পার্বতী হইতে। মর্ত্যলোকে এই বেদ প্রচারের ভার অর্পিত হইল ভরতমুনির উপর। এই জন্যই তিনি প্রণয়ন করিলেন 'নাট্যশাস্ত্র' নামক বিরাট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই ভরত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সেই বিষয়ে পন্ডিতগণ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। এমন হইয়া থাকিতে পারে যে, স্বীয় গ্রন্থের প্রাধান্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার ব্রহ্মাশ্রিত ভরত-মুনির নামের সহিত গ্রন্থটিকে যুক্ত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া পন্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, ইহার রচনাকাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক; কেহ কেহ আবার ইহাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ইহার রচনাকালের ঊর্ধ্বতন সীমা খৃষ্টের জন্ম ও অধস্তন সীমা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক২। 'নাট্য-শাস্ত্রে'র কালনির্ণয় প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সমগ্র গ্রন্থটি একজনের রচনা বলিয়া পন্ডিতগণ মনে করেন না। অনেকের মতে, 'নাট্যশাস্ত্রে'র শেষাংশ কোহলের রচনা৩।

নাট্যশাস্ত্র নামটি হইতে মনে হইতে পারে যে, এই গ্রন্থে শুধু নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। কিন্তু, ইহার কতকগুলি অধ্যায়৪ কেবল সংগীত সম্বন্ধে রচিত।

'নাট্যশাস্ত্রে'র টীকাসমূহের মধ্যে অভিনবগুপ্ত-রচিত 'অভিনব-ভারতী' সর্বাপেক্ষা অধিক সুপরিচিত ও প্রামাণ্য।

(২) দত্তিলম্

এই গ্রন্থ দত্তিলাচার্যকৃত। 'নাট্যশাস্ত্রে' ভরতের শিষ্যগণের মধ্যে দত্তিলের উল্লেখ আছে। কাহারও কাহারও মতে, দত্তিলের রচিত একটি বৃহত্তর গ্রন্থও ছিল; উহা বর্তমানে লুপ্ত।

১ 'শৃঙ্গারশেখর' নামক গ্রন্থে 'ভরত' নামের এইরূপ অর্থ ব ' হইয়াছে ঃ—

ভকারো ভাবনৈর্যুক্তো রেফো রাগেণ মিশ্রিতঃ।
তকারং তালমিত্যাহুর্ভরতার্থবিচক্ষণাঃ ॥

অর্থাৎ, ভাবনা অর্থে ভ-কার, রাগ অর্থে র-কার ও তাল অর্থে ত-কার প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব, ভাব-রাগ-তালের সমন্বয়ই ভরত।

২ S. K. D. E : *History of Sanskrit Poetics*, I, পৃঃ ৩৬।

৩ অধ্যায় ২৮-৩৩।

৪ 'সংগীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃঃ ২১৪।

(৩) বৃহদ্দেশী

মতঙ্গ এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা রচিত হইয়াছিল সম্ভবতঃ খৃঃ ৫ম হইতে ৭ম শতকের মধ্যে কোন সময়ে১। গ্রন্থটির নাম হইতে মনে হয় যে, ইহাতে শুধু দেশী সঙ্গীতেরই আলোচনা আছে। বস্তুতঃ, অধুনাপ্রাপ্ত গ্রন্থটিতে শ্রুতি এবং স্বরও আলোচিত হইয়াছে২।

(৪) সঙ্গীতমকরন্দ

নারদ-প্রণীত। ইহা 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র পূর্ববর্তী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৫) সঙ্গীতরত্নাকর

শার্ঙ্গদেব-রচিত। ইহার রচনাকাল খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী। শার্ঙ্গদেব কাশ্মীরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতামহ দাক্ষিণাত্যে বসবাস করেন। শার্ঙ্গদেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাজা সিংঘনের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক। চিকিৎসা এবং দর্শন-শাস্ত্রেও শার্ঙ্গদেবের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, দেবী সরস্বতী তাঁহার নিকট বিশ্রাম লাভ করিতেন৩।

এই গ্রন্থ সঙ্গীতশাস্ত্রে অতিশয় প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সিংহভূপাল, কেশব, কল্লিনাথ, হংসভূপাল ও কুম্ভকর্ণ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাগুলির মধ্যে কল্লিনাথের টীকাই সর্বাধিক আদৃত। কোন কোন বিষয়ে সিংহভূপালের টীকা অধিকতর প্রাঞ্জল।

(৬) সঙ্গীতসময়সার—পার্শ্বদেব-কৃত। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের লেখক ও শার্ঙ্গদেবের সমসাময়িক৪। পার্শ্বদেব জটিল বিষয় সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

(৭) স্বরমেলকলানিধি—রামামাত্য-রচিত। ইনি বিজয়নগররাজ রামরাজের অমাত্য এবং 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র টীকাকার কল্লিনাথের বংশধর। এই গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক।

(৮) রাগবিবোধ—সোমনাথ-কৃত। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের গ্রন্থ।

১. 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃঃ ৪৩১।

২. M. Krishnamachariar, *History of Classical Sanskrit Literature*, পৃঃ ৮২৩।

৩. নানাস্থানেষু সংভ্রান্তা পরিশ্রান্তা সরস্বতী।
সহবাসপ্রিয়া শশ্বদ্বিশ্রাম্যতি যদালয়ে॥ 'সঙ্গীতরত্নাকর'।

৪. দ্রঃ—O. C. Ganguly, Ragas and Raginis, পৃঃ ৩৪।

সোমনাথ সম্ভবতঃ অন্ধ্রদেশীয় ছিলেন। 'রাগবিবোধ-বিবেক' নামে এই গ্রন্থের একটি টীকা আছে।

(৯) সঙ্গীতদর্পণ—দামোদর-বিরচিত। গ্রন্থকার চতুরদামোদর নামেও পরিচিত। ইনি লক্ষ্মীধরের পুত্র এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের (মতান্তরে শাহ্জাহানের) সভাস্থ সঙ্গীতরসিক ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। দামোদরের জীবনকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক।

(১০) রাগতরঙ্গিণী—লোচনপণ্ডিতরচিত। ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক।

(১১) সঙ্গীতসুধা—গোবিন্দদীক্ষিতকৃত; রচনাকাল সপ্তদশ শতক।

(১২) হৃদয়কৌতুক ও হৃদয়প্রকাশ—হৃদয়নারায়ণদেব কর্তৃক সপ্তদশ শতকে রচিত।

(১৩) সঙ্গীতপারিজাত—অহোবল প্রণীত; রচনাকাল সপ্তদশ শতক। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইহা ফার্সি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহার সঙ্গেই বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় সঙ্গীতের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

(১৪) সঙ্গীতসারসংগ্রহ[১]—নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক অষ্টাদশ শতকে রচিত।

অপ্রকাশিত ও অধুনা অপ্রাপ্ত সঙ্গীতগ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য[২]:—

'অভিলাষার্থচিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস' (সোমেশ্বর),
কোহলরহস্য (কোহল),
চত্বারিংশচ্ছতরাগনিরূপণ (নারদ),
তাললক্ষণ (কোহল),
তুম্বুরুনাটক (তুম্বুরু),
নন্দিভরত (নন্দিকেশ্বর[৩])
নাট্যলোচন,
পঞ্চমসারসংহিতা,
রাগসাগর,

---

১ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্তৃক সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

২ এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য:—
M. Krishnamachariar : *History of Classical Sanskrit Literature*, পৃঃ ৮৩২-৮৮৪।
গ্রন্থগুলির নাম অ-কারাদিক্রমে এবং গ্রন্থকারগণের নাম সম্ভবপরস্থলে গ্রন্থনামের পার্শ্বে লিখিত হইল।

৩ "খৃষ্টীয় ২য়-৩য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি।" (সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, উত্তরভাগ, পৃঃ ৩৭৫)

রাগার্ণব,
বর্ণরত্নাকর (জ্যোতিরীশ্বর),
সংগানসাগর (শুভংকর),
সঙ্গীতমেরু (কোহল),
সঙ্গীতনারায়ণ,
সঙ্গীতরাগ (রাণা কুম্ভকর্ণ),
সঙ্গীতসারামৃতোদ্ধার (তুলাজি),
সর্বাগমসংহিতা (সম্ভবতঃ
যাষ্টিক-রচিত),
সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কার১ (নান্যদেব)

সংগীতশাস্ত্রে আলোচিত বিষয়

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয় সমূহের মধ্যে অনেকগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্যক। বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং, সংগীতশাস্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির মোটামুটি পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল২।

(বিষয়গুলি অ-কারাদি ক্রমে লিখিত)

অংশ—মতঙ্গের মতে, এই শব্দে বুঝায় বাদী স্বরকে; ইহা প্রধান স্বর। রাগে যে স্বর অধিক ব্যবহৃত হইয়া রাগটিকে অভিব্যক্ত করে তাহাই অংশ। দামোদর বলিয়াছেন—বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে। অর্থাৎ গানে যে স্বরের বহুল প্রয়োগ হয়, তাহাই অংশ। মতান্তরে, যে স্বর সমূহে রাগের পূর্ণ রূপ অংশিত বা খণ্ডিত হয় তাহাই অংশ। এই মতে রাগে বাদী স্বর একাধিক হইতে পারে না, কিন্তু অংশ একাধিক থাকিতে পারে।

অনুবাদী (স্বর)—যে স্বর সংবাদী স্বরকে আরো পরিস্ফুটভাবে বিকাশে সাহায্য করে, তাহার নাম অনুবাদী; যেমন ষড়্জের অনুবাদী ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ; ঋষভের অনুবাদী মধ্যম, পঞ্চম

১. ইহা 'নাট্যশাস্ত্রে'র ভাষ্য হইলেও ইহাতে সংগীতসম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়।

২. এই বিষয়গুলির বিবরণ ঐতিহাসিকভাবে দেওয়া হয় নাই, সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। 'সংগীতদর্পণ' গ্রন্থটি গ্রন্থকারের নিজের ভাষায়ই 'সংগীতশাস্ত্রসংক্ষেপঃ'। ইহা হইতে 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'সংগীতরত্নাকর' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের সারকথা সহজেই বোধগম্য হয় বলিয়া অনেক স্থলেই এই গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ও নিষাদ ইত্যাদি। (অনু পশ্চাৎ বদতি সম্পাদয়তি ইতি অনুবাদী)। আধুনিক ব্যাখ্যাকার বলেন, বাদী এবং সংবাদী ভিন্ন রাগে প্রযোজ্য অন্যান্য স্বরগুলিই অনুবাদী।

অলঙ্কার—ভরতাদি অনেক শাস্ত্রকারই 'অলঙ্কার' অর্থে বিশিষ্ট বর্ণ-সন্দর্ভকে বুঝিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে (১।৬।৩)। 'বৃহদ্দেশী'র টীকায় সিংহভূপাল বলিয়াছেন যে, যেমন কটককেয়ূরাদি ভূষণে মানবদেহ সুদর্শন হয়, তেমনই অলঙ্কার-যুক্ত গান গায়ক ও শ্রোতার মনোরঞ্জক হয়। ভরত প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ও শার্ঙ্গদেব তেষট্টিটি অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কাব্যশোভাকর উপমাদি অলঙ্কার হইতে গীতালঙ্কার স্বতন্ত্র। গীতে প্রযোজ্য অলঙ্কারের সংখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন।

আতোদ্য—আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের নাম; যেমন, মৃদঙ্গ।

আলাপ—"পদ অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক বস্তু বা যা-কিছু অক্ষর সন্নিবদ্ধ। পদ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। নিবদ্ধপদ তালযুক্ত ও ধ্রুবাগানে তা ব্যবহৃত হ'ত। অনিবদ্ধ পদে তাল থাকে না; কিন্তু, অক্ষর, ছন্দ ও যতি থাকে। অনিবদ্ধের অপর নাম 'আলাপ'[১]।" ইন্দিরা দেবীর ভাষায়, "কথা ও তাল বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি নিরর্থক শব্দ উচ্চারণ পূর্বক রাগের রূপ দেখানোর পদ্ধতিকে বলে 'আলাপ'[২]।" সঙ্গীতরত্নাকরে বিভিন্ন প্রকারের আলাপের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

ঔড়ব—'রাগ' দ্রষ্টব্য।

কাণ্ডারণা—দামোদর বলিয়াছেন—

কাণ্ডারণা তু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈর্বিবিধৈর্যুক্তা কৌশলেন বিভূষিতা॥

নিপুণভাবে শোভিত ও বিবিধ গমকযুক্ত তারস্থানের দ্রুততাকে বলা হয় কাণ্ডারণা।

কূটতান—'সঙ্গীতদর্পণে' কূটতানের স্বরূপ এইরূপে নির্দেশিত হইয়াছে ঃ—

অসংপূর্ণাশ্চ সংপূর্ণা ব্যুৎক্রমোচ্চারিতস্বরাঃ।
মূর্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুরিতি শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

যে সকল সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মূর্ছনাতে স্বরগুলি অপক্রমে

১ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ ২৩৩।
২. 'হিন্দুসঙ্গীত' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃঃ ১৪।

উচ্চারিত হয়, উহারা কূটতান বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। দামোদরের মতে, প্রত্যেক মূর্ছনায় পূর্ণ কূটতান ৫০৪০টি; মূর্ছনা সর্বসমেত ৫৬টি। অতএব, পূর্ণ কূটতানের সংখ্যা মোট ৫০৪০×৫৬=২৮২২৪০। এখানে 'সংপূর্ণ' অর্থ সাতস্বরবিশিষ্ট, অসংপূর্ণ অর্থে ষাড়ব (ছয় স্বরবিশিষ্ট) ও ঔড়ব (পাঁচ স্বরবিশিষ্ট) বুঝিতে হইবে।

গীত—'রঞ্জক স্বরসন্দর্ভে'র নাম গীত১। 'রঞ্জক' শব্দের অর্থ চিত্তাকর্ষক। সুতরাং, যে স্বরসমাবেশ জনচিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহা গীতপদবাচ্য নহে। দামোদর বলিয়াছেন—

গীতবাদিত্রনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।
অতো রক্তিবিহীনং যন্ন চ তৎ সংগীতমুচ্যতে॥

অর্থাৎ, গীত, বাদ্য ও নৃত্য—ইহাদের সাধারণ গুণ 'রক্তি'। রক্তি-হীন হইলে ইহারা সংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। এই 'রক্তি' রঞ্জকত্বের সমার্থক। ভরতের২ মতে, ধ্রুবগান পাঁচ প্রকার— (১) প্রবেশ, (২) আক্ষেপ, (৩) নিষ্ক্রম, (৪) প্রাসাদিক ও (৫) আন্তর।

গ্রহ (স্বর)—ভরতের মতে, ইহা অংশ হইতে অভিন্ন। কিন্তু, পরবর্তী লেখকগণ ইহাকে রাগের অপ্রধান স্বর বলিয়া মনে করেন। মতঙ্গের মতে, অংশো বাদ্যের পরং গ্রহস্তু বাদ্যাদিভেদৈর্ভিন্ন-শ্চতুর্বিধঃ—অংশ বাদী, কিন্তু গ্রহ বাদী বিবাদী, অনুবাদী ও সংবাদী ভেদে চারিপ্রকার। সিংহভূপাল বলিয়াছেন—অংশস্তু রাগজনকত্বাৎ প্রধানং, গ্রহস্ত্বপ্রধানমিতি তয়োর্ভেদঃ। অর্থাৎ, রাগের সৃষ্টি করে বলিয়া 'অংশ' প্রধান, 'গ্রহ' অপ্রধান ইহাই এই দুই স্বরের পার্থক্য। দামোদরের মতে, গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে—গীতের আদিতে স্থাপিত যে স্বর তাহাই গ্রহ।

গ্রাম—ইহা এক প্রকার প্রাচীন ঠাট (scale)। শ্রুতি ও স্বরের সমাবেশকে গ্রাম বলা হয়। ভরত ষড়জ ও মধ্যম—এই দুইটি গ্রাম স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী লেখকগণের মতে, গ্রামের সর্বোচ্চ সংখ্যা সাত। প্রকৃত অর্থ, নির্দিষ্ট ব্যবধানে অবস্থিত সপ্তস্বর।

জাতি—'জাতি'র বিভিন্ন লক্ষণগুলির মর্মার্থ এইরূপঃ—

১. দ্রঃ—সুতরাং গীত বলিতে কথাযুক্ত গান নাও হইতে পারে।
২. দ্রঃ—'নাট্যশাস্ত্র' (মনোমোহন ঘোষের ইংরাজী অনুবাদ), ৬।৩০।

"(১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলঙ্কার, বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে-স্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় তাকে 'জাতি' বলে;
(২) যে স্বরসন্দর্ভের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের—প্রত্যেকটি স্বরগঠনের বা রাগরূপের সত্যকারের রসপ্রতীতি হয় তাকে 'জাতি' বলে; কিংবা
(৩) গান্ধর্ব ও দেশী রাগগুলি যে মূল বা কারণরাগ থেকে জন্মলাভ করে তাকে 'জাতি' বলে[১]।"

তাল—গীতের পরিমাণ-নির্ণায়ক কাল বা সময়ের নাম 'তাল'। আবাপ, নিষ্ক্রাম, শম্যা প্রভৃতি ভেদে তাল বহুবিধ। উত্থিত হস্তের অঙ্গুলি-প্রসারণকে বলা হয় 'নিষ্ক্রাম'। দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়াকে বলে 'শম্যা'। সশব্দ ও নিঃশব্দ ভেদে ভরত তালকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মার্গ ও দেশী ভেদে তালের দুইটি ভাগও দেখা যায়। 'তাললক্ষণ' নামক গ্রন্থে কোহল 'তাল' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়াছেনঃ—

তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তিসমাযোগাত্তালো নামাভিধীয়তে॥

অর্থাৎ, 'ত'কার শিবকে ও 'ল'কার শক্তিকে বুঝায়। সুতরাং, শিব-শক্তির সংযোগের নামই তাল।

দেশী—বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীতের নাম 'দেশী'। দামোদর বলিয়াছেন—

তত্তদ্‌দেশীরীত্যা যৎস্যাৎ লোকানুরঞ্জনম্‌।
দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে॥

দেশভেদে, তত্তদ্‌ দেশস্থ রীতি অনুযায়ী, যে সঙ্গীত লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে তাহাকে বলা হয় 'দেশীসঙ্গীত'। এই সঙ্গীত মার্গসঙ্গীতেরই প্রকারভেদ; পার্থক্য এই যে, ইহা আলাপাদিবিহীন।

ধ্রুবা—ভরত ধ্রুবাগানের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নানা প্রকারভেদও 'নাট্যশাস্ত্রে' লিপিবদ্ধ আছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ধ্রুবার এই তিন প্রকার ভাগ প্রধান।

('গীত' দ্রষ্টব্য)

নাদ—দামোদর 'সঙ্গীতদর্পণে' ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃঃ ৪৩৯।

ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তিনি এইরূপে দিয়াছেনঃ—

নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥

ন-কারকে প্রাণ ও দ-কারকে অনল বলা হয়। সেইজন্য, নাদকে প্রাণ ও অগ্নির সংযোগে উৎপন্ন বলা হয়। সংগীতে নাদের প্রাধান্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্॥

গীতের আত্মা নাদ, নাদকে স্ফুটভাবে প্রকাশ করে বলিয়াই বাদ্য প্রশংসিত হয়। ঐ দুইটি লইয়াই নৃত্য। অতএব ঐ তিনটিই নাদাধীন।

নৃত্য, নৃত্ত, নাট্য—'নৃত্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে 'নৃৎ' ধাতু হইতে। একই ধাতু হইতে 'নৃত্ত' এবং 'নাট্য' শব্দ দুইটিও নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং, ইহাদের পরস্পর প্রভেদ জানা প্রয়োজন। 'দশরূপকে' (১।৭-১৩) ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্, নৃত্তং তাল-লয়াশ্রয়ম্, অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্। অর্থাৎ, নৃত্য ভাবপ্রধান, নৃত্ত তাল-ও লয়-প্রধান এবং অবস্থাবিশেষের অনুকরণের নাম নাট্য। পরবর্তী কোন কোন লেখকের মতে, নৃত্তকে ভাবাশ্রয় ও নৃত্যকে তাললয়াশ্রয় বলা হইয়াছে১। কিন্তু, সংগীতের অংগ হিসাবে যে নৃত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, মনে হয় উহা ভাবাশ্রয় নৃত্য; বস্তুতঃ, নৃত্যের ভাবাশ্রয়ত্বরূপ লক্ষণই প্রাচীনতর। আংগিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য—এই চারিপ্রকার অভিনয়-হীন গাত্রবিক্ষেপের নাম 'নৃত্ত', আর নৃত্য ভাব-ও রসাশ্রিত। এই জন্যই নৃত্যজ্ঞেরা নৃত্যকে মার্গ ও নৃত্তকে দেশীশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন২। তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে নৃত্য দ্বিবিধ। ভরতোত্তর কোন কোন লেখক পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য আখ্যা দিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব এই পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।

ন্যাস (স্বর)—ভরতের মতে, ন্যাসোঽংগসমাপ্তৌ। দামোদর বলিয়াছেন—ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ। গানের বা রাগের যে স্বরে সমাপ্তি হয়, তাহাই ন্যাস।

বর্ণ—এই শব্দে সাধারণতঃ গানক্রিয়া বা গানকে বুঝায়। স্বরের বিস্তারের নাম 'বর্ণ': যেমন—সা সা সা রী রী রী। কেহ কেহ স্বরো-

১. দ্রঃ—D. R. Mankad: *Types of Sanskrit Drama*, পৃঃ ১৪।
২. 'সংগীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃঃ ৩৮৩।

চ্চারণ পদ্ধতির এই নামকরণ করিয়াছেন। স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে বর্ণ চারিপ্রকার।

বাদী (স্বর)—যাহা বলে তাহা বাদী। ইহা একপ্রকার স্বর। ইহা রাগের স্বরূপকে বিকশিত করে। ইহা নির্ণয় করিতে শ্রুতিজ্ঞান আবশ্যক।

বাদ্য—বাদ্যযন্ত্র যে বেদের যুগ হইতেই প্রচলিত ছিল, সেই বিষয়ে বেদেই প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'পুরাণে' মৃদঙ্গ এবং পুষ্কর প্রভৃতি যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ক্লাসিক্যাল যুগের বহু কাব্যনাটকে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভরত 'আশ্রাবণা' শব্দে শুষ্কবাদ্য অর্থাৎ নিগীত বাদ্যের কথা বলিয়াছেন। এই বাদ্য সম্ভবতঃ নাট্যে নৃত্যগীতের বিরতিকালে ব্যবহার করা হইত। 'নাট্যশাস্ত্রে'র অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে (আতোদ্যবিধি) ভরত "তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির—এই চার রকম বাদ্যশ্রেণীর উল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেনঃ তন্ত্রীযুক্ত (বীণাদি) বাদ্যযন্ত্রকে 'তত', মৃদঙ্গশ্রেণীর পুষ্করবাদিকে 'অবনদ্ধ', তাল দেবার (করতলাদি) বাদ্যযন্ত্রকে 'ঘন' ও বংশ ও বেণু প্রভৃতিকে 'সুষির' বলে[১]।" সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম[২] নিম্নে দেওয়া গেল।

(অ-কারাদি ক্রমে)

তুম্বীবীণা—'হরিবংশে' ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা তুম্বুরা বা তানপুরারই পূর্বরূপ।

পণব—ভরতের বর্ণনানুযায়ী ইহা ষোল আঙ্গুল লম্বা। ইহার একটি মুখ আট আঙ্গুল ও অপর মুখ পাঁচ আঙ্গুল ব্যাসবিশিষ্ট। ইহার মুখগুলি চর্মাবৃত হইত। ভরত ইহাকে মৃদঙ্গশ্রেণী-ভুক্ত বলিয়াছেন।

বংশ—বংশ শব্দের অর্থ বাঁশ। আদিতে বাঁশের তৈরী ছিল বলিয়াই ইহার এইরূপ নামকরণ হয়ত হইয়াছিল। ইহা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। পরবর্তী যুগে ইহা নানা ধাতুর এবং হাতীর দাঁত ও স্ফটিক প্রভৃতির দ্বারা তৈরী হইত।

বাণ—ইহা বৃহদাকার বীণাবিশেষ। ইহার তন্তুসংখ্যা ছিল একশত ও মুঞ্জাঘাসের তৈরী।

---

১. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তরভাগ), পৃঃ ২২১।

২. কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন ভারতে 'বাহুলীন' নামক একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল। ইহা হইতেই নাকি violin বা বেহালা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ জানা নাই।

বীণা—ইহা সুপ্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত ও সাহিত্যে ইহার বহু উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে গোধাবীণা (গোসাপের চাম্‌ড়ার তৈরী) ও কান্ডবীণার (বেতের তৈরী) উল্লেখ আছে। কালিদাস বীণাকে বল্লকীও বলিয়াছেন। চিত্রা, বিপঞ্চী, দারবী, কচ্ছপী ও ঘোষকা প্রভৃতি নানাপ্রকার বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সঙ্গীতরত্নাকরে' এগার প্রকার বীণার বর্ণনা আছে; ইহাদের মধ্যে দুইটির নাম 'একতন্ত্রী' ও ত্রিতন্ত্রিকা'। চিত্রাবীণা হইতে 'সেতার'র উৎপত্তি হইয়া থাকা সম্ভব। পিনাকবীণাকে কেহ কেহ আধুনিক 'এস্‌রাজে'র পূর্বরূপ বলিয়া মনে করেন।

বেণু—বেণু ও বংশ সমার্থক। কালক্রমে ইহাদের আকার ও গঠনপ্রণালী বিভিন্ন হইয়াছিল। প্রথমে বংশনির্মিত হইলেও পরে বেণু নানাপ্রকার ধাতুতে নির্মিত হইত।

মুরজ—মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে।

মৃদঙ্গ—ইহা আতোদ্য বা আনদ্ধজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ইহা মাটির তৈরী (মৃৎ।অঙ্গ=মৃদঙ্গ)। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা হইতে মৃদঙ্গ ভারতে প্রচলিত। 'পটহ', মর্দল', 'ঢক্ক' প্রভৃতি মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্যের নানাপ্রকার ভেদ।

উক্ত যন্ত্রগুলি ছাড়াও, 'হরিবংশে' ভেরী, শঙ্খ, ঝর্ঝরী (ঝাঁঝর), ডিণ্ডিম প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়[১]। অন্যান্য গ্রন্থে আরও বহু রকমের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে।

বিবাদী (স্বর)—যে স্বর রাগের সৌন্দর্যহানি ঘটায়, তাহার নাম বিবাদী।

মার্গ—ইহা একপ্রকার সঙ্গীতের নাম। দামোদর বলিয়াছেন--

দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।
মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্॥
(সঙ্গীদর্পণ—১।৪)

ব্রহ্মা যাহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছিলেন এবং ভরত মহাদেবের সম্মুখে যাহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন মুক্তিপ্রদ সেই সঙ্গীতই মার্গসঙ্গীত।

মার্গসঙ্গীত আলাপনিবদ্ধ। এই সঙ্গীতের দ্বিবিধ ফল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন। ইহার দৃষ্টফল মনোরঞ্জন, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন এবং আভিচারিক ফল। অদৃষ্টফল পারলৌকিক মঙ্গলসাধন।

মূর্ছনা—যাহাতে সাতটি স্বর থাকে তাহাকে মূর্ছনা বলা হয়; স্বরের

১. 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃঃ ১৫৪।

আরোহণ ও অবরোহণ হইতে ইহার উদ্ভব। মতঙ্গের মতে, যাহাতে রাগ মূর্ছিত বা বিকশিত হয় তাহাকে মূর্ছনা বলে। বীণার সঙ্গে এই শব্দটির প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ভরতের মতে, ষড্‌জ গ্রামের মূর্ছনা—

(১) উত্তরমন্দ্রা, (২) রজনী, (৩) উত্তরায়তা, (৪) শুদ্ধষড্‌জা, (৫) মৎসরীকৃতা, (৬) অশ্বক্রান্তা, (৭) অভিরুদ্‌গতা;

মাধ্যমগ্রামের মূর্ছনা—

(১) সৌবিরী, (২) হরিণাশ্বা, (৩) কলোপনতা, (৪) শুদ্ধমধ্যা, (৫) মার্গবী, (৬) পৌরবী, (৭) হৃষ্যকা।

ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের প্রতি গ্রামের শুদ্ধ, সান্তর, সকাকলীক ও সান্তর-কাকলীক এই চারিটি প্রকারভেদ আছে। প্রতি প্রকারভেদে উপরোক্ত ৭টি মূর্ছনা আরোপ করিলে মূর্ছনার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২×৪×৭=৫৬।

রাগ ও রাগিণী—যাহা শ্রোতৃচিত্তের রঞ্জন করে তাহাই রাগ। মতঙ্গ বলিয়াছেন—রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ; রঞ্জনাদ্‌জায়তে রাগঃ। রক্তি বা আনন্দ-জনক স্বরসমূহের নাম রাগ। দামোদরের মতে, 'স্বরবর্ণবিভূষিত ধ্বনিবিশেষে'র নাম রাগ। সাধারণভাবে ছয রাগের কথা বলা হইয়া থাকে১। কিন্তু ছয়টি ছাড়াও নানা গ্রন্থে নানারাগের উল্লেখ দেখা যায়।

জনৈক পাশ্চাত্ত্য সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি রাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"It (Rāga) is a turning from the illusions of this earth.......to the 'I am that' which is behind all shapes".২

দামোদর বলিয়াছেন যে, শিব ও শক্তিব সংযোগে রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। শিবের পঞ্চমুখ হইতে নিঃসৃত পাঁচটি ও পার্বতীর মুখ হইতে একটি—এই ছয়টি রাগ৩। নিম্নলিখিত রাগগুলি শিবের মুখনিঃসৃত—

(১) শ্রী, (২) বসন্তক, (৩) ভৈরব, (৪) পঞ্চম, (৫) মেঘ।

পার্বতীর মুখনির্গত রাগ নট্টনারায়ণ। ইহারা পুরুষ বলিয়া

১ নাবদেব 'পঞ্চম-সাব-সংহিতা'য ছয বাগ ও ছত্রিশ বাগিণীব উল্লেখ আছে—
বাগাঃ ষডথ বাগিণ্যঃ ষট্‌ত্রিংশৎ চারুবিগ্রহাঃ।
আগতা ব্রহ্মসদসি ব্রহ্মাণং সমুপাসতে॥

২. G. T Garratt (ed)—"The Legacy of India", পৃঃ ৩১৮।

৩. শিবশক্তিসমাযোগাদ্রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ।
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চ বাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠস্তু গিবাজামুখাৎ॥
(সংগীতদর্পণ)

কল্পিত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের নিম্নলিখিত রাগিণী বা ভার্যার কথা বলা হইয়াছেঃ—

শ্রীরাগ—মালশ্রী, ত্রিবেণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পসাড়িকা।
বসন্তরাগ—দেশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলী।
ভৈরবরাগ—ভৈরবী, গুর্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী ও সৈন্ধবী।
পঞ্চমরাগ—বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, পটমঞ্জরী ও মালবী।
মেঘরাগ—মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারা॥
নট্টনারায়ণ—কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও নটহম্বীরা।

এই ছয় রাগ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, ছয়টি রাগ এইরূপঃ—

ভৈরব কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘরাগ। আবার, অপর এক মতে ইহারা নিম্নলিখিতরূপঃ—

ভৈরব, পঞ্চম, নাট, মল্লার, গৌড়মালব, দেশাখ্য।

রাগিণী সম্বন্ধেও অনেক বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন একটি মতে, ভৈরব রাগের রাগিণী এই কয়টি—মধ্যমাদি, ভৈরবী, বঙ্গালী, বরাটিকা ও সৈন্ধবী। শ্রীরাগের রাগিণী মতান্তরে এইরূপ—বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাসিকা, আসাবরী।

রাগ ও রাগিণীসমূহের বিভিন্ন মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। নিদর্শনস্বরূপ এইরূপ কয়েকটি মূর্তির ধ্যান অনুবাদ সহ নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

(হিন্দোলরাগ)

নিতম্বিনীমন্দতরঙ্গিতাসু
দোলাসু খেলাসুখমাদধানঃ।
খর্বঃ কপোতদ্যুতিকামযুক্তঃ
হিন্দোলরাগঃ কথিতোমুনীন্দ্রৈঃ॥

বঙ্গানুবাদ—গুরুনিতম্বযুক্ত রমণীগণ কর্তৃক ধীরে দোলায়িত দোলাসমূহে ক্রীড়াসুখভোগী, খর্বাকৃতি, কপোতকান্তি ও কামপরায়ণ—শ্রেষ্ঠমুনিগণ কর্তৃক হিন্দোলরাগ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(শ্রীরাগ)

অষ্টাদশাব্দঃ স্মরচারুমূর্তিঃ
ধীরো লসৎপল্লবকর্ণপূরঃ।
ষড়্জাদিসেব্যোহরুণবস্ত্রধারী
শ্রীরাগ এষ ক্ষিতাপালমূর্তিঃ॥

বঙ্গানুবাদ—এই শ্রীরাগ অষ্টাদশবর্ষীয়, রাজরূপী, কামদেবসদৃশ মনোহর-কান্তি, ধীর, রক্তবস্ত্রধারী, ষড়্জাদি (স্বর) কর্তৃক সেবিত;

ইঁহার কর্ণে পত্রনির্মিত কর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে।

(বেলাবলী
—হিন্দোলরাগের রাগিণী)

সংকেতদীক্ষাং দয়িতে চ দত্ত্বা
বিতন্বতী ভূষণমঙ্গকেষু।
মুহুঃ স্মরন্তী স্মরমিষ্টদেবং
বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ॥

বঙ্গানুবাদ—পতিকে সংকেতের উপদেশ দিয়া (স্বীয়) তনু অঙ্গসমূহে অলংকারপ্রদায়িণী, বারংবার ইষ্টদেব মদনের স্মরণকারিণী, বেলাবলী নীলোৎপলকান্তিবিশিষ্টা।

(বসন্তী
—শ্রীরাগের রাগিণী)

শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বন্ধচূড়া
কর্ণাবতংসীকৃতশোভনাম্রা।
ইন্দীবরশ্যামতনুঃ সুচিত্রা
বসন্তিকা স্যাদলিমঞ্জুলশ্রীঃ॥

বঙ্গানুবাদ—ভ্রমরোপশোভিতা, পরমা সুন্দরী, নীলপদ্মসদৃশ শ্যামাঙ্গী বসন্তিকা মস্তকোপরি ময়ূরপুচ্ছের মুকুট পরিহিতা এবং মনোহর আম্রমুকুলের কর্ণাবতংসে সজ্জিতা।

রাগিণী সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'দত্তিল', 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'বৃহদ্দেশী' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে কোন রাগিণীরই উল্লেখ নাই। সুতরাং, রাগিণী রাগ অপেক্ষা অর্বাচীন। নারদের 'সঙ্গীতমকরন্দ' নামক গ্রন্থে রাগের স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব ভেদে ত্রিবিধ ভাগ সর্বপ্রথম দেখা যায়। নারদ কিন্তু 'রাগিণী' শব্দের উল্লেখ করেন নাই; রাগের 'স্ত্রী' বা 'যোষিৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবও রাগিণীর উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে, রাগ ত্রিবিধ—ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা।

রাগরাগিণী সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। বঙ্গালী, সৈন্ধবী, কানড়া, মালবী, গুর্জরী প্রভৃতি রাগিণীর এবং গান্ধার, গৌড়মালব প্রভৃতি রাগের নাম যেন উহাদের উৎপত্তিস্থলেরই ইঙ্গিত দেয়[১]।

---

১. কোন কোন সঙ্গীতশাস্ত্রকার এই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে মতঙ্গ দেশজ রাগ রাগিণীর কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য —

বঙ্গালদেশসম্ভূতা বঙ্গালী দিব্যরূপিণী।

গুণ বা প্রভাব অনুসারেও কতক রাগ রাগিণীর নামকরণ হইয়াছে। দীপকরাগের অর্থ, যে-রাগে আগুন জ্বালাইবার শক্তি আছে। 'ললিতা' রাগিণীর নাম হইতেই মনে হয়, ইহা লালিত্যপূর্ণ।

পশুপক্ষীর নাম হইতে কতক রাগিণীর নাম হইয়াছে; যেমন, কুরঙ্গী, মায়ূরী প্রভৃতি।

শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণভেদে কেহ কেহ রাগের ত্রিবিধ ভাগ করিয়াছেন। মার্গ ও দেশী—রাগের এইরূপ ভাগও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ—রাগের এই তিনপ্রকার ভাগও লক্ষিত হয়। দামোদর বলিয়াছেন—

ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগস্ত্রিধা মতঃ॥

পাঁচটি স্বরের রাগ হয় ঔড়ব, ছয়টি দ্বারা ষাড়ব এবং সাতটিস্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ।

শাস্ত্রকারগণ রাগরাগিণীসমূহের জন্য প্রশস্ত কাল ও ঋতু নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে দামোদরের মত সংক্ষেপে লিখিত হইল। মেঘরাগ, ভৈরবী ও বেলাবলী প্রভৃতি রাগিণী প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিতে হয়। শ্রীরাগ, কর্ণাটী ও কেদারী প্রভৃতি রাগিণী তৃতীয় প্রহরের পর হইতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত গীত হয়। রাগরাগিণীর কাল নির্দিষ্ট থাকিলেও এই নিয়ম যে সর্বদা পালিত হইত না, তাহা দামোদরের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়ঃ—

রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ।

দামোদরের মতে, শ্রীরাগ, বসন্তরাগ, ভৈরবরাগ, পঞ্চমরাগ, মেঘরাগ ও নট্টনারায়ণ যথাক্রমে শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বর্ষা ও হেমন্ত ঋতুতে গেয়। এই বিধানও যে সকল সময়ে অনুসৃত হইত না, তাহার প্রমাণ দামোদরের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিঃ—

যথেচ্ছয়া বা গাতব্যাঃ সর্বর্তুষু সুখপ্রদাঃ।

লয়—কাল বা সময়ের অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানের সমতার নাম। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে লয় ত্রিবিধ।

শ্রুতি—'সঙ্গীতদর্পণে' ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—স্বরূপমাত্রশ্রবণান্নাদোহনুরণনং বিনা শ্রুতিরিত্যুচ্যতে। অর্থাৎ, শ্রুতিধ্বনিহীন স্বরূপে শ্রুত নাদকে শ্রুতি বলা হয়। ভরত দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন।

চতুর্থ, সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ, বিংশ ও দ্বাবিংশ শ্রুতিতে অবস্থিত যথাক্রমে সা, রে গা, মা, পা, ধা ও নি স্বর নিয়াই শুদ্ধ ষড়জ গ্রাম গঠিত। এই গ্রামের পঞ্চম স্বর এক-

শ্রুতি নিম্ন হইলেই মধ্যম গ্রাম উৎপন্ন হয়। প্রতি স্বর স্বীয় অন্ত্যশ্রুতিতে অবস্থিত।

ষাড়ব—'রাগ' দ্রষ্টব্য।

সংবাদী (স্বর)—বাদীস্বরের দ্বারা রাগের রূপ বিকশত হইলে তাহাকে যে স্বর পরিপুষ্ট ও ব্যবহার-উপযোগী করে, তাহাই সংবাদী।

স্বর—'সঙ্গীতদর্পণে' স্বরের লক্ষণ এইরূপে দেওয়া হইয়াছে ঃ—

শ্রুত্যনন্তরভাবিত্বং যস্যানুরণনাত্মকঃ।
স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে॥
স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্তিতঃ॥

যাহা 'শ্রুতি'র অব্যবহিত পরে উৎপন্ন হয় এবং যাহার প্রতিধ্বনি আছে, যাহা স্নিগ্ধ ও আনন্দপ্রদ তাহা স্বর নামে অভিহিত হয়। যে নাদ নিজেই শোভিত হয় তাহা স্বর।

শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে স্বর দ্বিবিধ। শুদ্ধস্বর সাধারণতঃ সাতটি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারা এইরূপ—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ।

বিভিন্ন গ্রন্থে নামকরণ একরূপ থাকিলেও স্বরগুলির ক্রমে পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দত্তিল "ঋষভকে বলেছেন তৃতীয় সংখ্যক স্বর, গান্ধার দ্বিতীয়, মধ্যম চতুর্থ, মধ্যম থেকে গান্ধারের অনুভূতি হয়, (তার—ষড়্জ থেকে?) নিষাদ দ্বিতীয়, ধৈবত তৃতীয় (এবং তার—ষড়্জ চতুর্থ"[১]।

কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে, ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ স্বরগুলি যথাক্রমে ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও গজ দ্বারা যথাক্রমে উচ্চারিত হয়; এই সমস্ত পশুপক্ষীর নিকট হইতেই মানুষ ষড়্জাদি সপ্তস্বর শিক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তন্ত্রের প্রভাব

সঙ্গীতশাস্ত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন লেখক স্বর, নাদ প্রভৃতির উৎপত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন নাড়ী ও চক্র ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দামোদরবর্ণিত নাড়ী ও চক্রগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চক্র

আধার—চতুর্দলবিশিষ্ট। ইহা গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গের মধ্যভাগে অবস্থিত।

স্বাধিষ্ঠান—ষট্‌দলযুক্ত। ইহা লিঙ্গমূলে আছে।

মণিপূরক—নাভিদেশের দশদলবিশিষ্ট চক্র।

১. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তরভাগ)—পৃঃ ৩৬১।

অনাহত—হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বাদশদলযুক্ত।
বিশুদ্ধি—ইহা ষোড়শদলবিশিষ্ট ও কণ্ঠে অবস্থিত। ইহাতে ষড়্জ—
আদি স্বর থাকে।
ললনা—দ্বাদশদলবিশিষ্ট। ইহা কপালে অবস্থিত।
আজ্ঞা—ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে। ইহা ত্রিদলবিশিষ্ট।
মনশ্চক্র—আজ্ঞাচক্রের উপরে ষট্দলযুক্ত চক্র।
সোমচক্র—মনশ্চক্রের উপরে স্থিত ও ষোড়শদলযুক্ত।
সুধাধর—সহস্রপর্ণবিশিষ্ট ও ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত।

নাড়ী

দামোদর বলিয়াছেন যে, নাড়ীগুলি অসংখ্য। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চৌদ্দটি নাড়ী মুখ্য ঃ—

সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, কুহু, পয়স্বিনী, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, বারণা, যশস্বিনী, বিশ্বোদরা, শঙ্খিনী, পূষা, সরস্বতী, অলম্বুষা।

দামোদরের মতে, প্রথমোক্ত তিনটি মুখ্যতম। সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রাণ বায়ুতে আরূঢ় জীবাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ করে ও তথা হইতে অবরোহণ করে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে দামোদর বলিয়াছেন যে, আত্মা দ্বারা চালিত মন দেহজ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। সেই অগ্নি ব্রহ্মগ্রন্থি-স্থিত প্রাণবায়ুকে চালিত করে। ঐ বায়ু এইরূপে চালিত হইয়া ক্রমে ঊর্ধ্বপথে বিচরণ করিয়া নাভিদেশে অতিসূক্ষ্ম, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, কণ্ঠে পুষ্ট, শিরোভাগে অপুষ্ট ও মুখে কৃত্রিম ধ্বনি জন্মায়; ঐ ধ্বনির নাম নাদ॥

বায়ু

দামোদর দেহমধ্যস্থ নিম্নলিখিত দশটি বায়ুর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রাণবায়ু নাভিকন্দের অধোদেশ অবস্থান পূর্বক মুখ, নাসারন্ধ্র ও হৃৎপদ্মে বিচরণ করে। শব্দের উচ্চারণের কারণ অপানবায়ু; ইহা গুহ্যদ্বার, লিঙ্গ, কটিদেশ, ঊরু ও উদরে অবস্থান করে।

উক্ত বিষয়গুলির আলোচনায় তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। মার্গসঙ্গীতের আভিচারিকরূপ দৃষ্টফল তান্ত্রিক প্রভাবেরই পরিচায়ক। দেহভাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী, চক্র প্রভৃতির বিশ্লেষণ ঐ শাস্ত্রেই বিস্তৃতভাবে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভরত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে সঙ্গীতের বিশদ আলোচনা করিলেও দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও চক্র প্রভৃতির বা উহাদের মধ্য হইতে নাদ স্বরাদির উৎপত্তির কোন উল্লেখ করেন নাই।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ঐ সমস্ত ব্যাপার প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রের বিষয়ীভূত ছিল না। পরবর্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রও নিষ্কৃতি পায় নাই। ভিন্টারনিৎস্ প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের মতে, মূল তন্ত্রগ্রন্থগুলি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের পূর্বেকার রচনা নহে। ভরতের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও অনেকের মতেই তিনি উক্ত কালের পূর্বের লেখক। সুতরাং, তাঁহার পক্ষে তন্ত্রপ্রভাবমুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভারতীয় সঙ্গীত ও বৈদেশিক প্রভাব

সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক শাখায় কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গ্রীক্ প্রভাব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে, সংস্কৃতের নাটক বহুলাংশে গ্রীক্ প্রভাবিত। কিন্তু, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরূপ প্রভাব যে নাই তাহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন১। তবে, আরবীয় ও পারসিক সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে কেহ কেহ ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ঐ দুই দেশের সঙ্গীতের যোগ আছে বলিয়া মনে করেন২; এ ক্ষেত্রে কোন্ দেশ ঋণী, বা কোন দেশই ঋণী কিনা, সেই সম্বন্ধে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই।

বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে, অন্ততঃ ভায়োলিন (violin) এবং ফ্লুটের (flute) জন্য যে প্রতীচী ভারতের বীণা ও বংশের নিকট ঋণী, তাহা প্রতীচ্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন৩।

এ পর্যন্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে সঙ্গীতমন্দাকিনী চিরপ্রবহমানা। সংস্কৃত সাহিত্যে সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে। সজীব নদী যেমন দেশদেশান্তর প্লাবিত করিয়া প্রচুর পলিমাটি বহন করিয়া ভূমিকে উর্বরা করিয়া তুলে এবং অবশেষে সাগরে বিলীন হইয়া যায়, সঙ্গীতস্রোতোবহাও তেমনই বৈদিক, এপিক্ ক্লাসিক্যাল প্রভৃতি যুগযুগান্তর ধরিয়া দুর্বার গতিতে আর্যঋষির ধর্মজীবনের প্রভাব, হিন্দু রাজগণের সভার আনন্দমুখর ভাব ও মুসলমান বাদ্শাহ্গণের বিলাস-ঋদ্ধি আত্মস্থ করিয়া "মহামানবের সাগরে" আসিয়া উপনীত হইয়া[illegible]। কিন্তু, ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ ও স্বাজাত্য ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্যরক্ষণীয়। মানুষ যেমন অনেক সময়ে জীবনের তরঙ্গাভিঘাতে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া

১, দ্রঃ—*The Legacy of India*—ed. G. T. Garratt, পৃঃ ৩২৫।
২. দ্রঃ—ঐ।
৩. দ্রঃ—ঐ।

ফেলিয়া কৃপাপাত্র হইয়া পড়ে, এই বিশাল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সঙ্গীত সেই দশা যাহাতে প্রাপ্ত না হয় তৎপ্রতি আমাদের, বিশেষতঃ ভারতীয় সঙ্গীতরসিক ব্যক্তিগণের, অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাজাত্য রক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন, এই সঙ্গীতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি? ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার অধ্যাত্মপ্রকৃতি। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, সাধনার পীঠস্থান। প্রকৃতির অপরূপ রূপমাধুরী ও বিশালত্ব দর্শনে বিস্ময়বিহ্বল আর্যঋষি-চিত্ত সঙ্গীতের মাধ্যমেই দেবদেবীর উদ্দেশ্যে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এবং পুরাণাদিতেও দেবপূজা উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতের দেবমন্দিরে দেবতার প্রীতির জন্য দেবদাসীর নৃত্য সুপ্রাচীন প্রথা। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী, বাগ্‌দেবীর বীণা প্রভৃতি প্রতীক হইতেই বুঝা যায় যে, সঙ্গীত দেবারাধনার অপরিহার্য অংগ। 'গানাং পরতরং নহি' প্রভৃতি উক্তিতে গানের হৃদয়-দ্রাবী শক্তি ও মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিবার ক্ষমতারই ইংগিত রহিয়াছে। ইদানীন্তন কালেও রামপ্রসাদের মত সাধক গানের মাধ্যমেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্মের অভিজাত বংশে যাহার জন্ম, দেবতার পবিত্র মন্দিরে ও রাজার জনাকীর্ণ সভায় যাহার পরিপুষ্টি, সেই ভারতীয় সঙ্গীত বৈদেশিক প্রভাবে ও ইতরবংশীয় সঙ্গীতের সংসর্গে যেন স্বীয় আভিজাত্য না হারায়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টির সময় আসিয়াছে। সঙ্গীতের অপপ্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রে ইহাকে ব্যসনের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে; সঙ্গীতের পবিত্র স্বরূপের নিন্দা করা হয় নাই।

সঙ্গীত ও সুরসাধনা প্রভৃতি কতিপয় বিলাসপরায়ণ ধনী ব্যক্তির অবসর-বিনোদনের উপায় হিসাবে উদ্ভূত হয় নাই। সঙ্গীতের জ্ঞান সাধনালভ্য এবং ইহা বিজ্ঞানসম্মত—এই কথাটি আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।

ভারতীয় সঙ্গীতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। বৈদিক গানের প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃতির রূপ ও মহিমায় মুগ্ধ ঋষির হৃদয় হইতে গান স্বতউৎসারিত হইয়াছিল। সুতরাং, প্রকৃতির ক্রোড়েই সঙ্গীতের জন্মলাভ হইয়াছিল। ষড়জাদি যে সপ্তস্বর গানের মূলে রহিয়াছে, তাহারাও প্রকৃতির জীবজন্তু হইতে প্রাপ্ত। প্রভাত ও সন্ধ্যা প্রভৃতি কালের এবং গ্রীষ্ম বসন্তাদি ছয় ঋতুর উপযোগী বিশিষ্ট রাগরাগিণীর উল্লেখ সঙ্গীতশাস্ত্রে আছে। এই ব্যাপারেও সঙ্গীতে প্রাকৃতিক প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভারতীয় সাধক সঙ্গীতকে শুধু চিত্তবিনোদনের সহায়ক বলিয়াই মনে করেন নাই; সঙ্গীতসাধনায় লভ্য শক্তি সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মেঘরাগ ও দীপকরাগের সাধনাদ্বারা

যথাক্রমে বৃষ্টিপাত করান যায় এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়—এই বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল। ইহাও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ভারতীয় সঙ্গীতের ঐকাত্ম্য-বোধের পরিচায়ক। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দিক্‌টি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, এই দেশের সঙ্গীতবিশারদগণ Music of the Spheresএর তত্ত্বটি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন; আকাশে বাতাসে ও মানুষের চতুষ্পার্শ্বে যে-সঙ্গীত সতত ভাসমান, তাহা যেন ভারতীয় সাঙ্গীতিকের কানের ভিতর দিয়া তাহার মরমে পশিয়াছিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের অবস্থা আজ সঙ্কটময়। দেশবিদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং সংঘর্ষে আমাদের মন স্বীয় সংস্কৃতি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। অনেক সময়ে আমরা অপর দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজদেশের সংস্কৃতিকে ধীরভাবে তুলনা না করিয়া বৈদেশিক সংস্কৃতির আপাতরমণীয়রূপে মুগ্ধ হইয়া যাই। যে সংস্কৃতভাষার আকরে অমূল্য ভারতীয় রত্ন নিহিত আছে, তাহা আমাদের অনেকেরই অগোচর। যে রাজা মহারাজারা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞগণের পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা, যুগধর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে, অন্ন-চিন্তায় ক্লিষ্ট; তাঁহাদের সঙ্গীতচিন্তার আগ্রহ থাকিলেও অবসর আর নাই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিপন্ন ভারতীয় সঙ্গীতের রক্ষা ও পরিপুষ্টির জন্য অকুণ্ঠ সাহায্য না করিলে সম্ভবতঃ ভারতের বিশাল ঐতিহ্যবাহী অমূল্য সঙ্গীতসম্পদ বিলুপ্তির তমসায় দ্রুত বিলীন হইয়া যাইবে।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অগণিত গ্রন্থরাজি অদ্যাবধি পুঁথি আকারে বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় আছে। বহু গ্রন্থ কালের কবলিতও হইয়াছে। এই সঙ্গীতশাস্ত্রকে বিস্মৃতির গুহা হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে স্থাপন করিতে পারিলেই আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে। আমাদের এই কথা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, বৈদেশিক সঙ্গীতের যাহা কিছু গ্রহণীয় তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা ভারতীয় সঙ্গীতেরই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিব। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপটি সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া তাহার বর্জন বা শোধন অসঙ্গত, বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা 'ভারতীয় সঙ্গীতে'র কথা বলিতেছি, 'হিন্দু সঙ্গীতে'র নহে। 'হিন্দু সঙ্গীত' শব্দটির তাৎপর্য বুঝা সহজ নহে; কেননা, ভারতবর্ষে নানা অবস্থান্তরের মধ্যে যে সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে. তাহাকে খাঁটি হিন্দু সঙ্গীত বলা চলে না; উত্তর ভারতের সঙ্গীতে মুসলমানের প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতে তেমনই দ্রাবিড় প্রভাব সম্ভবপর। ভারতের সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত; ইহাকে হিন্দু-সঙ্গীত বা মুসলমান সঙ্গীত বা দ্রাবিড় সঙ্গীত নামে অভিহিত করা যায় না। এই সঙ্গীত বিমিশ্র (Composite)।

গজশাস্ত্র

ভারতীয় পশুগণের মধ্যে হস্তীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন কালে রাজা বাদশাহগণের পশুশালায় গজ ছিল অবশ্যপালনীয় জন্তু। ইহা রাজকীয় জাঁকজমকের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। শোভাযাত্রাসমূহে হস্তীর ব্যবহার সুবিদিত। তাহা ছাড়া, মৃগয়া ও যুদ্ধে ইহা ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে হস্তীর উল্লেখ নানা প্রসঙ্গে আছে। ইহা যে সম্পন্ন ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ রাজগণের, অতিশয় আদর ও যত্নের বস্তু ছিল তাহার প্রমাণ গজশাস্ত্র। হস্তীর শুভাশুভ লক্ষণ, খাদ্য পানীয়, রোগ ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধেই শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' (২।৩১, ৩২) হস্ত্যধ্যক্ষ নামে একজন রাজকর্মচারীর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এই গ্রন্থের এই প্রকরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গজশাস্ত্র তৎকালেই যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। এই শাস্ত্রের প্রাচীনত্বের অপর প্রমাণ 'রামায়ণ" (১।৬।২৪); ইহাতে নানা জাতির গজের উল্লেখ আছে। 'শুক্রনীতি'তে (৪।৭।৭৯ হইতে)ও বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় গজশাস্ত্রের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সোমদেবের 'যশস্তিলকচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থে (কাব্যমালা সংস্করণের ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮২) এই শাস্ত্রের কিছু তথ্যের উল্লেখ আছে। প্রধানতঃ উপরিলিখিত গ্রন্থগুলিতে গজশাস্ত্রের নানা বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। তাহা ছাড়া, গজশাস্ত্র অবলম্বনে স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরীতে ১২২৯৫ সংখ্যক পুঁথি এই শাস্ত্রের গ্রন্থ। গজশাস্ত্রের নিম্নলিখিত দুইটি গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

(১) নীলকণ্ঠের 'মাতঙ্গলীলা'[১],

(২) পালকাপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ'[২]।

যে নীলকণ্ঠে[৩]র নামের সঙ্গে ইহা যুক্ত আছে, তাঁহার পরিচয় বা জীবনকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কেরলে গ্রন্থটি সুবিদিত বলিয়া গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ঐ অঞ্চলেরই লোক ছিলেন; ইহা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ।

---

১. সং গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম্, ১৯১০। এই গ্রন্থের জার্মাণ অনুবাদ করিয়াছেন Zimmer, Berlin, 1929। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন Franklin Edgerton (New Haven, Yale University Press, 1931)।

২. আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী, পুনা, ১৮৯৪।

৩. Keith ভ্রমবশতঃ ইঁহার নাম লিখিয়াছেন 'নারায়ণ'। (*History of Sanskrit Literature*, পৃঃ ৪৬৫)।

'মাতঙ্গলীলা' দ্বাদশ পটল বা অধ্যায়ে রচিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৬৩। 'মাতঙ্গলীলা'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। প্রথম পটলে হস্তীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে 'হস্তী' শব্দের নাগ, গজ, বারণ, সিন্ধুর প্রভৃতি বহু পর্যায়শব্দ ও তাহাদের ব্যুৎপত্তির উল্লেখ আছে। সর্বত্র গমন করে বলিয়া ইহার নাম 'নাগ' (ন+অগ), জয় করে বলিয়া গজ (√জি), শত্রুরাজগণকে দূর করে বলিয়া বারণ এবং সিন্ধু বা নদীতে হৃষ্ট হয় বলিয়া ইহার এক নাম সিন্ধুর (সিন্ধু+√ রম্)।

দ্বিতীয় পটলে হস্তীর শুভ লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। শুভ লক্ষণসমূহের মধ্যে কয়েকটি এইরূপঃ—

উচ্চ দন্ত ও মেরুদণ্ড, রক্তবর্ণ শুণ্ডাগ্র, জিহ্বা, ওষ্ঠ, বিংশতিসংখ্যক নখ, দেহে স্বস্তিক ও চক্রাদি চিহ্ন, সিংহ বা মৃগের ন্যায় গতিবিশিষ্ট।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ ও ভয় জনিত বৃংহণ অমঙ্গলসূচক।

তৃতীয় পটলে হস্তীর অশুভ লক্ষণের আলোচনা আছে। কয়েকটি অশুভ লক্ষণ এইরূপঃ—

হীন বা অধিক অঙ্গ, অতিকৃশ, বক্রলাঙ্গুল।

চতুর্থ পটলে হস্তীর আয়ু নির্ধারণের সহায়ক চিহ্ন বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘায়ুসূচক কতক চিহ্ন নিম্নলিখিতরূপঃ—

মসৃণ দন্ত ও নখ, দীর্ঘ কর্ণ ও লাঙ্গুল, শুভ চিহ্ন।

পঞ্চম পটলে হস্তীর বয়স ও বিভিন্ন অবস্থাসূচক লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। হস্তীর জীবনের কয়েকটি অবস্থা ও তাহাদের লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইলঃ

বাল—জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্যন্ত; তাম্রবর্ণ, স্তন্যাপিপাসু, অপুষ্ট অঙ্গ যুক্ত ইত্যাদি১।

পুচ্ছক—দ্বিতীয় বৎসর; জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি অতিরক্তবর্ণ, অত্যন্ত শর্করাপ্রিয়।

উপসর্প—তৃতীয় বৎসর; পুষ্ট নখ ও কর্ণ প্রভৃতি, দৃঢ় দন্ত।

বর্বর—চতুর্থ বৎসর; তৃণপ্রিয়, দুগ্ধপানে বিমুখ।

হস্তীর আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর২।

১. শ্লক্ষ্ণঃ সুতাম্রো মৃদুগাত্ররোমা
অব্যক্তরূপাঙ্গযুতঃ স্তনার্থী
বালাহ্বয়োঽয়ং প্রথমে তু বর্ষে॥ ৫।২

২. এবং বর্ষশতং বিংশমবস্থায় মহীপতে।
কৃত্বা বহুবিধং কর্ম স্বর্গং গচ্ছতি বারণঃ॥ ৫।২৩

ষষ্ঠ পটলে হস্তীর দেহের পরিমাপ দেওয়া আছে। চক্ষু হইতে লাঙগুলাগ্র পর্যন্ত উহার দৈর্ঘ্য এবং নখ হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত উচ্চতা। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের গজের দেহের পরিমাপ বর্ণিত হইয়াছে।

হস্তীর মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সপ্তম পটলে আছে। বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে গজমূল্য নির্ধারিত হইবে। গজের বামদন্ত দক্ষিণ দন্ত অপেক্ষা উঁচু হইলে উহা মূল্যহ্রাসের কারণ হইবে। গজের অন্যান্য দোষও নর কারণ।

অষ্টম পটলে হস্তীর বিভিন্ন প্রকৃতি ও তাহার বাহ্যিক লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতি অনুসারে হস্তীকে দেব, দানব ও গন্ধর্ব প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে১। সুরূপ ও সুগন্ধ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট গজ দেব-শ্রেণীভুক্ত। দানবশ্রেণীর গজ যুদ্ধপ্রিয়, দুর্গন্ধি ও অপর গজহন্তা। গন্ধর্ব প্রকৃতির গজ সঙ্গীতপ্রিয়; উহার গতি রমণীয় এবং দন্ত ও কুম্ভ প্রভৃতি অতি সুন্দর। প্রকৃতিভেদে গজসমূহকে ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণেও বিভক্ত করা হইয়াছে। শান্তিপ্রিয়, স্নানশীল ও সুগন্ধি হস্তী ব্রাহ্মণ। যুদ্ধে নির্ভীক গজ ক্ষত্রিয়। কষ্টসহিষ্ণু, মৎস্যাশী এবং যাহার কোপ সহজে প্রশমিত হয় —এইরূপ হস্তী বৈশ্য। দুর্গন্ধি, উচ্ছিষ্টভোজী, কোপনস্বভাব ও ভীরু গজকে বলা হয় শূদ্র। দেব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গন্ধর্বরূপ হস্তীকে বলা হয় সাত্ত্বিক, বৈশ্য ও শূদ্র রাজসিক; অপর সকল শ্রেণীর হস্তী তামসিক। পিঙ্গল, পীত, কৃষ্ণ ও শ্বেত—হস্তী এই চারি বর্ণের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মর্ত্যে শুধু কৃষ্ণবর্ণ হস্তীই দেখা যায়২।

নবম পটলে গজদেহ হইতে দানবারি-প্রস্রবণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আনন্দাতিশয্যে বা উত্তেজনাকালে উহার দেহ হইতে দানবারি নির্গত হয়। দানবারি নির্গত হইতে থাকিলে গজের গণ্ডস্থল আপ্লুত হয়, সে মেঘের ন্যায় গর্জন করে এবং বন্ধনস্থান হইতে ছুটিয়া যাইতে চায়। গজের এই অবস্থায় সহা, মধুক, শাল্মলী প্রভৃতি নির্দিষ্ট কতক গাছের ছালের বড়ি মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাকে সেবন করান বিধেয়৩।

দশম পটলে বন্য হস্তী ধরিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই উপায় পঞ্চবিধ৪ ঃ—

১. দেবদানবগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসমানুষান্
পিশাচোরগসত্ত্বাংশ্চ লক্ষয়েৎ স্বস্বলক্ষণৈঃ॥ ৮।১
২. কালস্ত্বেক ইহাবনৌ ভবতি শেষাস্ত্রয়ঃ স্বঃস্থলে। ৮।১৫
৩. মাতুলুঙ্গসূবহাসহাকণাসপ্তপর্ণবিজয়েঙ্গুদীমধু।
দুগ্ধপিষ্টমিদমঙ্গলেপিতং মত্তবারণবরং বশং নয়েৎ॥ ৯।২৩
৪. বারীকর্নবশাবিলোভনবিধিভ্যাং চানুগত্যাতথৈ-
বাপাতেন ততোঽবপাতিত ইতীহেভগ্রহঃ পঞ্চধা। ১০।১

(১) ফাঁদ পাতা, (২) হস্তিনীর সাহায্যে প্রলোভন, (৩) অনুধাবন, (৪) তাড়ন, (৫) গর্তে পাতন।

শেষোক্ত দুইটি উপায়, বিশেষতঃ গর্তে পাতন, নিন্দিত; কারণ তাহাতে হস্তীর অনিষ্ট এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। উপায়গুলি সংক্ষেপে এইরূপ।

ফাঁদ—প্রায় ক্রোশ-পরিমিত ভূমিকে দৃঢ় বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া উহার মধ্যে ইক্ষু প্রভৃতি লোভনীয় খাদ্য রাখিবে এবং বাহিরে দুরতিক্রমণীয় পরিখা খনন করিতে হইবে। একদিকে একটি প্রবেশ পথ রাখিয়া উহাতে একটি দ্বার উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ঐ দ্বারে সুদৃঢ় কপাট উত্তোলিত অবস্থায় থাকিবে। পটহাদির সাহায্যে বন্য হস্তীগুলিকে বিতাড়িত করিয়া ঐ বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করাইতে হইবে এবং হস্তীগুলি প্রবেশ করিবামাত্র উক্ত দ্বার-কপাটটি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। পোষা হাতী সহ এবং পেটী, বর্শা, অংকুশ ও শৃঙ্খল লইয়া ধীরে ধীরে বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিয়া ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কৌশলে হস্তীগুলিকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিবে এবং বন্ধনস্থানে নিয়া যাইবে।

প্রলোভন—পাঁচ কি ছয়টি পোষা হস্তিনীর পৃষ্ঠ চর্মাবৃত করিয়া হস্তিচালকেরা রজ্জু প্রভৃতি লইয়া ঐ চর্মে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিবে। এই অবস্থায় হস্তিনীগুলিকে বন্যগজের দলের মধ্যে লইয়া গিয়া কৌশলে পাঁচ ছয়টি বন্য হস্তীকে রজ্জুবন্ধ করিয়া ফেলিবে। 'বরা', ক্ষীরস্রাবী বৃক্ষ, 'মালেয়, 'কালেয়ক' প্রভৃতি বৃক্ষের ত্বক্ শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে স্নান করাইলে হস্তিনী হস্তীর প্রলোভনের যোগ্য হয়। হস্তিনীকে হস্তীর প্রলোভনোপযোগী করিবার অন্যান্য পদ্ধতিও বর্ণিত হইয়াছে।

অনুধাবন—পটহ ও বাদ্যযন্ত্রাদির সাহায্যে এক দল লোক বন্যগজযূথের ভীতি উৎপাদন করিলে গজসমূহ ধাবিত হইবে। তখন ঐ লোকেরা উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে। ধাবিত হইতে হইতে যখন শিশু হস্তীগুলি ক্লান্তিবশতঃ খঞ্জপ্রায় হইবে তখন তাহারা উহাদিগকে কৌশলে শৃঙ্খলাবন্ধ করিবে।

তাড়ন—বহুমুখ বিশিষ্ট রজ্জুসমূহে পাশ প্রস্তুত করিয়া ঐ পাশগুলি এক হস্ত পরিমিত প্রশস্ত 'কেরী' বৃক্ষের ত্বক্ ও পত্রাদিদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। তদুপরি কলাগাছ, ইক্ষু প্রভৃতি লোভনীয় খাদবস্তু রাখিতে হইবে এবং লোকজনেরা লুক্কায়িত হইয়া থাকিবে। ঐ খাদ্যবস্তু ভোজনরত হস্তীগুলিকে তাহারা উক্ত পাশযুক্ত রজ্জুগুলি আকর্ষণ করিয়া ভূপাতিত করিবে।

গর্তে পতন—চার হাত গভীর, দুই হাত চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা গর্ত খনন করিয়া উহার উপরে হস্তীর ভোজ্য ছড়াইয়া রাখিতে হইবে। তৎপর শিশুহস্তী খাদ্যলোভে আসিয়া ঐ গর্তে পতিত হইলে উহাকে ধরিতে হইবে।

একাদশ পটলে গজের পালন ও উহার খাদ্যাখাদ্য আলোচিত হইয়াছে। মোটামুটি ব্যবস্থাগুলি লিখিত হইতেছে। বন্য হাতীগুলিকে সযত্নে প্রতিদিন শীতল জলে সকালে সন্ধ্যায় স্নান করাইতে হয়। হস্তীর শয্যা, ব্যায়াম, ঔষধ প্রভৃতির পরিদর্শন প্রত্যহ করণীয়। পদ্মের মৃণাল, কদলী, দূর্বা, ডুমুরগাছ, ইক্ষু, বটের পাতা ও ফল, বাঁশপাতা, চাউল, ভাত—এই সমস্ত দ্রব্য হস্তীর প্রিয় ও উপকারী খাদ্য। ঘৃতপ্রয়োগে গজের চক্ষু ও দন্ত ভাল থাকে। প্রচুর লবণ ভক্ষণে গজের কৃমি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। তৃণের সহিত বচ রশুন, লবণ, আদা প্রভৃতি তৈলমিশ্রিত করিয়া দিলে হস্তীর বাত ও কফ প্রশমিত হয়। ঋতুভেদে হস্তীকে বিভিন্ন খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। হস্তীর জ্বরাদি কতক রোগের চিকিৎসা মানুষের চিকিৎসারই অনুরূপ[১]।

দ্বাদশ এবং অন্তিম পটলে আধোরণ (=চালক বা মাহুত) ও পরিদর্শক প্রভৃতির গুণাগুণের বিচার করা হইয়াছে। পরিদর্শক বা অধ্যক্ষ হইবেন বুদ্ধিমান্, রাজসদৃশ, ধার্মিক এবং অন্যান্য সদ্গুণের অধিকারী[২]। হস্তীর চালককে হস্তীতে আরোহণ ও উহা হইতে অবতরণ, হস্তীর চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে পটু হইতে হইবে[৩]। এই সমস্ত ব্যবস্থাদি এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যে পালকাপ্যের নামের সহিত 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' গ্রন্থটি যুক্ত হইয়াছে, তিনি মুনি। গজগণের পালনহেতু এবং কাপ্যগোত্রসম্ভূত বলিয়া তাঁহার ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছিল[৪]। গ্রন্থোৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, অঙ্গরাজ রোমপাদের অনুরোধে পালকাপ্যমুনি এই হস্ত্যায়ুর্বেদ সবিস্তারে বলিয়াছিলন। সুতরাং এই গ্রন্থের রচনাকালনির্ণয় দুরূহ ব্যাপার।

গ্রন্থটি পদ্য ও গদ্যে রচিত। শ্লোকগুলি অনেক স্থলে উদ্ধৃত বলিয়া

১. তস্মাৎ তজ্জ্ঞৈর্ব্যাধিভেদং বিদিত্বা
মর্ত্যানামেবাত্র কার্যা চিকিৎসা ॥ ১১। ৫১
২. নাগাধ্যক্ষোঽস্তু ধীমান্ নবপতিসদৃশো ধার্মিকঃ স্বামিভক্তঃ। ১২।১
৩. শিক্ষাপ্রক্রমদক্ষমঙ্কুশগদাসঞ্চারণপ্রক্রিয়া

আরোহেষ্ববরোহণেষু কুশলং............
............মুনয়োবদন্তি নৃপতেরাধোরণং দন্তিনাম্ ॥ ১২। ২
৪. পালয়িষ্যতি ধর্মাত্মা রোগার্তান্ ভৃশদুঃখিতান্।
পালনাদ্ গজযূথস্য কাপ্যো গোত্রেণ এব চ॥ হস্ত্যায়ুর্বেদ, ১। ১। ১৫৫

মনে হয়। সমগ্র গ্রন্থটিই সম্ভবতঃ সংগ্রহ। গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক বাক্যে ইহাকে 'হস্ত্যায়ুর্বেদসংহিতা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

'হস্ত্যায়ুর্বেদ' চারিটি ভাগে বিভক্ত; যথা—মহারোগস্থান, ক্ষুদ্ররোগ-স্থান, শল্যস্থান ও উত্তরস্থান। প্রতিটি স্থান কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। মহারোগস্থান অংশে হস্তীর কঠিন ব্যাধিগুলির লক্ষণ ও চিকিৎসা আলোচিত হইয়াছে। ইহার রোগবিভক্তি নামক অধ্যায়ে রোগসমূহকে প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ও আগন্তুক ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাতজনিত ৭৬টি, পিত্তজ ২৭টি এবং শ্লেষ্মাজনিত ৩২টি।

ক্ষুদ্ররোগস্থানে বহু সাধারণ রোগের লক্ষণ ও উহাদের চিকিৎসা আলোচিত হইয়াছে।

শল্যস্থানে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কতক হস্তিরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দশপ্রকার শস্ত্রের বর্ণনা আছে ঃ—
(১) বৃদ্ধিপত্র, (২) কুশপত্র, (৩) মণ্ডলাগ্র, (৪) ব্রীহিমুখ, (৫) কুঠারাকৃতি, (৬) বৎসদন্ত, (৭) উৎপলপত্র, (৮) শলাকা, (৯) সূচী, (১০) রম্পক।

উত্তরস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য-পানীয়াদির বিচার, দানপ্রস্রবণ, গজশালা নির্মাণ, নানাবিধ গজের বর্ণনা, গজের নীরাজনাবিধি, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই অংশে পাংশুদান নামক ত্রিংশ অধ্যায়ে আরণ্য, দম্যমান, দান্ত ও পুরাণ ভেদে গজসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

অশ্বশাস্ত্র

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে অশ্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঋগ্বেদে অশ্বের উল্লেখ বহুস্থলে আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনের একটি স্মরণীয় ব্যাপার। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বের ব্যবহার সুবিদিত। রাজাদের মৃগয়াদিতে অশ্ব অপরিহার্য ছিল। কৃষি-কর্মে ও পত্রাদি প্রেরণে অশ্বের ব্যবহার ভারতের নানা স্থানে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। জীবনে এত প্রয়োজনীয় জন্তু সম্বন্ধে জ্ঞানী ভারতীয়েরা যে গ্রন্থ রচনা করিবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অশ্ব সম্বন্ধে কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না। অধুনাপ্রাপ্ত গ্রন্থগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর গ্রন্থে অশ্বের জাতি, শুভাশুভ লক্ষণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অপর শ্রেণীর গ্রন্থে অশ্বের নানাবিধ রোগ ও চিকিৎসার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত কাব্যনাটকাদিতে অশ্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' অশ্বাধ্যক্ষ একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী।

অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধে প্রথমোক্ত শ্রেণীর একটি মাত্র গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার নাম 'অশ্বশাস্ত্রম্'১। যে পুঁথি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদিত হইয়াছে উহা চিত্রিত; বিভিন্ন প্রকার অশ্বের একুশটি চিত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা নকুল। গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক হইতে মনে হয় পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম নকুল গ্রন্থ-প্রণেতা। ইহার রচনাকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি যে একটি সংগ্রহ মাত্র২, মৌলিক রচনা নহে তাহা গ্রন্থমধ্যেই উক্ত হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে, সংকলয়িতা নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থটিতে প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব আরোপিত করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডব নকুলের নামের সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়াছেন। 'মহাভারত' অনুসারে নকুল ছিলেন অশ্বচিকিৎসক; সুতরাং অশ্বশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার নাম যুক্ত হইলে ইহা জনসাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিবে।

১. সং S. Gopalan, Sarasvati Mahal Library, Tanjore, 1952. এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন যে, তাঞ্জোরের সরস্বতীমহল গ্রন্থাগারে অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধে বহু সংখ্যক পুঁথি আছে।

২. দ্রষ্টব্য সমস্তং.......... .শাস্ত্রং. ....।
ব্রুতে তত্ত্বার্থং............শাস্ত্রংকৃত্বা সমাসতঃ ॥ (শ্লোক ৫)

নকুলসংগৃহীতং অশ্বশাস্ত্রং সমাপ্তম্ (সমাপ্তিসূচক বাক্য)। গ্রন্থমধ্যে কোন কোন অধ্যায় যে গ্রন্থ হইতে নেওয়া হইয়াছে সেই গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে; যেমন, পুণ্ড্রলক্ষণাধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে—ইতি গণগ্রন্থে গণকৃত পুণ্ড্রাধ্যায়ঃ।

গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে এইরূপঃ—

বাজিপ্রশংসাধ্যায়—ইহাতে প্রথমেই গণেশাদি দেবতার বন্দনার পর অশ্বশাস্ত্রে প্রামাণ্য ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ আছে। এই ব্যক্তিগণ সূর্য, চন্দ্র, ঋষি শালিহোত্র, সুশ্রুত, গর্গ প্রভৃতি। অশ্বের প্রশংসা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ইহা যুদ্ধে অপরিহার্য। 'অশ্বৈর্হস্তগতা পৃথ্বী'—অশ্বসমূহের সাহায্যে পৃথিবী বশীভূত হইতে পারে। ইহা নির্ভীক, প্রভুভক্ত, আশুগামী ইত্যাদি। অশ্ব সর্বঋতুতে ব্যবহার্য এবং ক্ষুৎপিপাসা-সহিষ্ণু।

রৈবতস্তোত্রম্—সূর্যের ঔরসে ছায়াদেবীর গর্ভে রৈবতের জন্ম। এই প্রকরণে রৈবত, পার্থিব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি নাম প্রাতে যে স্মরণ করে তাহার অশ্বগণের কোন অনিষ্ট হয় না।

প্রশ্নাধ্যায়—ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পূর্বে অশ্বগণের পক্ষ ছিল; তাহারা গন্ধর্বগণের সঙ্গে উড়িয়া বেড়াইত। ইন্দ্রের অনুরোধে শালিহোত্র তাহাদের পক্ষচ্ছেদ করেন। এইরূপে অশ্ব মানুষের ব্যবহারোপ-যোগী হয়।

প্রদেশাধ্যায়,

অঙ্গলক্ষণ প্রকরণাধ্যায়,

অশ্বলক্ষণোপোদঘাতাধ্যায়—অশ্বনির্বাচনের পূর্বে অশ্বের আকৃতি, অঙ্গ-গঠন ও লক্ষণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অশুভ লক্ষণযুক্ত অশ্ব বর্জনীয়। ওষ্ঠ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি বিশেষ স্থলে অশুভলক্ষণযুক্ত অশ্ব বিশেষভাবে গর্হিত। অশ্বের কয়েকটি শুভ-লক্ষণ এইরূপঃ—

রক্তবর্ণ, লোমহীন ও কোমল ওষ্ঠ, কোমল মুখপার্শ্ব, দৃঢ় স্কন্ধ ইত্যাদি। 'দ্বাত্রিংশদায়ুষে বাজী', অর্থাৎ, অশ্বের আয়ু বত্রিশ বৎসর। এই পরমায়ু দশটি দশায় বিভক্ত, এক একটি দশার স্থিতিকাল তিন বৎসর, দুই মাস ও বার দিন। অশ্বদেহ নিম্নলিখিত দশটি প্রদেশে বিভক্তঃ—

(১) নাসিকা হইতে ললাট,
(২) মস্তক হইতে গ্রীবা,
(৩) গ্রীবা, কেশ ও স্কন্ধ,
(৪) বক্ষ, ককুদ ও তৎপার্শ্ব,
(৫) গাত্রের পূর্বভাগ (পূর্বগাত্রবিভাগঃ),

(৬) হৃৎপার্শ্ব, কক্ষ,
(৭) উদর, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড,
(৮) দেহের গুহ্যস্থান,
(৯) উরু, জানু, কটি,
(১০) সখুর জঙ্ঘা।

আবর্তাধ্যায়—কোন কোন অশ্বের দেহে বৃত্তাকার লোমশ চিহ্ন থাকে; এই-রূপ চিহ্নের নাম 'আবর্ত'। চন্দ্র, ত্রিভুজ, শর প্রভৃতি নানা আকৃতির আবর্ত হয়। এইগুলি ছাড়াও নিম্ন লিখিতরূপ চিহ্নগুলি দেখা যায়ঃ—(১) শুক্তি, (২) সংখাত (knotty formations), (৩) মুকুল, (৪) জিহ্বাকৃতি, (৫) শতপাদী, (৬) পাদুকা, (৭) পাদুকার্ধ। এই চিহ্ন-গুলি ছাড়াও, অশ্বগাত্রে পদ্ম, ধনু, মৎস্য প্রভৃতি নানা-বিধ আকারের রোমরাজি থাকে। আবর্তগুলির নিম্ন-লিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ—

ধ্রুব, 'নিন্দ্য', শুভ ও অশুভ।

শুভ ও অশুভ আবর্ত একত্র থাকিলে অশুভ চিহ্নগুলিকে উত্তপ্ত স্বর্ণের দ্বারা দগ্ধ করিলে আর কোন দোষ থাকে না।

মিশ্রিতলক্ষণাধ্যায়—উৎকৃষ্ট অশ্বের লক্ষণ এইরূপ—সর্বশ্বেত, খুর ও মুখ প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে শ্বেতবর্ণ, সুগঠিত দেহ, শোভনগতিবিশিষ্ট ইত্যাদি। কোন কোন রূপ মিশ্রিত বর্ণের অশ্ব উত্তম· যথা—রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু শ্বেতবর্ণ কর্ণ, খুর, মুখ ও পদবিশিষ্ট ইত্যাদি। আবার কোন কোন রূপ মিশ্রিতবর্ণ অশ্ব নিকৃষ্ট; যথা—কৃষ্ণ খুর এবং শ্বেত পদ।

পুণ্ড্রলক্ষণাধ্যায়—নাকের উপরে কিন্তু কানের নীচে যে সাদা চিহ্ন থাকে, তাহাকে পুণ্ড্র বলে। নিম্নলিখিত আকৃতিবিশিষ্ট পুণ্ড্র অশ্বস্বামীর ধনসম্পদ ও জয়লাভ সূচনা করেঃ—

পদ্মদল, কলস, লাঙ্গল, পতাকা, অঙ্কুশ, বিল্ববৃক্ষ, শঙ্খ, ছত্র, স্বস্তিক প্রভৃতি।

চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ অথবা শৃঙ্খল প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট হইলে উহা অশুভসূচক। ওষ্ঠ, মুখের বামপার্শ্ব প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি স্থলে পুণ্ড্র অমঙ্গল সূচনা করে।

অশ্বের কপালের চিহ্নকে 'ললাম' নামে অভিহিত করা হয়। চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, সূর্য, তারা প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট ললাম

যে অশ্বের থাকে, তাহাকে শুভজনক বুঝিতে হইবে। পটহ বা কাকপদের ন্যায় ললাম অশুভের সূচনা করে। একবর্ণ অশ্বের মস্তক, কর্ণ, ককুদ প্রভৃতি স্থলে চিহ্ন থাকিলে উহাকেও ললাম বলা হয়। ঐরূপ ললাম শ্বেতবর্ণ হইলে শুভবহ। এইরূপ অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চিহ্ন থাকিলে উহা অশুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়।

পুষ্পলক্ষণম্—অশ্বদেহে কতক চিহ্ন কিছুদিন দেখা যায় এবং পরে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ চিহ্নকে পুষ্প বলা হয়। দেহের স্থানবিশেষে এই চিহ্ন শুভ ও অশুভ সূচনা করে।

হেষিতশুভলক্ষণম্—পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কতিপয় বস্তু ও ব্যক্তিদর্শনে অশ্বের যে হেষা তহা শুভাবহ। অত্যল্পবয়স্ক, অতিবৃদ্ধ, ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত প্রভৃতি অশ্বের হেষার বিশেষ কোন তৎপর্য নাই। শূকর, শৃগাল, গর্দভ প্রভৃতির ধ্বনিসদৃশ হেষা অমঙ্গলজনক।

গন্ধলক্ষণম্—যে অশ্বের দেহগন্ধ পদ্ম, চন্দন প্রভৃতির সৌরভের ন্যায় তাহা শুভসূচক। উষ্ট্র, গদভ, কচ্ছপ প্রভৃতির ন্যায় গন্ধ অশুভ।

ছায়ালক্ষণম্—মেঘ যেমন সূর্যকে অচ্ছাদিত করে, ছায়াও তেমন অশ্বদেহকে আবৃত করিয়া থকে। এই ছয়া পঞ্চবিধ—(১) পৃথ্বীজা—নানা মনোরমবর্ণযুক্তা, (২) বারুণী—অর্থাৎ জলজা; মেঘাভা, (৩) সৌরী—উদীয়মান সূর্যের ন্যায়,
(৪) বায়ব্যা—বায়ুজা,
(৫) নাভসী—আকাশজা।
অশ্ব জলপানরত বা তৃণভক্ষণরত অথবা নিদ্রিত থাকিলে এই ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

গতিলক্ষণম্—অশ্বের সেই গতি শুভসূচক যাহাতে 'সম পদবিন্যাস' আছে এবং যাহা নয়নমন তৃপ্ত করে। ময়ূর, বৃষ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির গতিসদৃশ যাহার গতি, সেই অশ্ব স্বামীর মঙ্গলজনক। যে অশ্ব চলিতে চলিতে পদাঘাত করে অথবা লম্ফ দেয়, তাহা অশুভ।

সত্ত্বলক্ষণম্—অশ্বের প্রকৃতি ত্রিবিধ; যথা—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার নিম্নলিখিতরূপ উপবিভাগ আছেঃ—

সাত্ত্বিক

(১) ব্রাহ্ম—কামরহিত, 'স্মৃতিমান্' ও 'অকোপী',

(২) আর্ষ—দ্বেষ, রোগ ও মোহাদিরহিত,
(৩) ঐন্দ্র—তেজস্বী,
(৪) যাম্য—'মায়াবিমুক্ত',
(৫) কৌবের—স্মৃতিমান্, কামী ও ব্যক্তপ্রসাদকোপ অর্থাৎ, যাহার আনন্দ ও ক্রোধ প্রকাশিত হয়,
(৬) বারুণ—শৌর্যযুক্ত ও কেলিপরায়ণ,
(৭) গন্ধর্ব—সংগীতপ্রিয়।

রাজস

(১) আসুর—কোপ ও ঔদ্ধত্যযুক্ত,
(২) রাক্ষস—নিদ্রা ও ভোজনপরায়ণ,
(৩) পৈশাচ—ভোজনপরায়ণ ও ভীরুস্বভাব,
(৪) সার্প—'ক্ষিপ্রপ্রকুপিত',
(৫) পৈত্র—'দুঃশীল', ভীরু,
(৬) শাকুন—ভোজনপরায়ণ ও পুনঃ পুনঃ ভ্রূকুঞ্চনকারী।

তামস

(১) পাশব—ভীরু, অলস ও জড়বুদ্ধি,
(২) মাৎস্য—ভোজনপরায়ণ, জলপ্রিয় ও ভীরু,
(৩) বৈরুধ—লতার ন্যায় নিদ্রালু ও অলস।

মহাদোষাধ্যায়—অশ্বের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি অশুভসূচকঃ—কৃষ্ণবর্ণ, অসমান, হ্রস্ব অথবা ভগ্ন দন্তরাজি, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ ইত্যাদি। যে অশ্ব মৃতদেহ বহন করিয়াছে অথবা দগ্ধ-চর্মের ন্যায় যাহার গন্ধ তাহা বর্জনীয়।

তালুরঙ্গাধ্যায়—তালুর বর্ণ নানাপ্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে রক্ততালু শুভ, অপর সকল বর্ণ দোষাবহ।

কুললক্ষণাধ্যায়—এই অধ্যায়ে অশ্বের ৫৪ প্রকার 'কুল' বা জাতির নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির মাত্র নাম লিখিত হইলঃ—

কম্বোজ, বনায়ুজ, গান্ধার আরট্টক, সৈন্ধব, পার্বতীয়, অবন্ত্য, কাশ্মীর, দাক্ষিণেয়, সৌবীর, দারদ, মালব, কালিঙ্গ, মাথুর, সৌরাষ্ট্র, মাগধ।

ইহাদের মধ্যে ২৬টি 'কুলের' বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন কুলের উপকুলের কথাও বলা হইয়াছে।

বয়োজ্ঞানম্—বাহ্য ও আভ্যন্তর লক্ষণের সাহায্যে অশ্বের বয়স অনুমান করা যায়। দুই একটি নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে।

বাহ্যলক্ষণ

অশ্ব সম্পূর্ণ দন্তহীন হইলে উহার বয়স বত্রিশ।

আভ্যন্তরলক্ষণ

দন্তের আকৃতি ও বর্ণ হইতে বয়স অনুমিত হইতে পারে। যেমন, কিঞ্চিৎ উদ্গতদন্ত প্রথম মাস নির্দেশ করে। সমস্ত দন্ত সুস্পষ্ট হইলে বয়স সাত মাস বুঝিতে হইবে। সকল দন্ত শ্বেত হইলে অশ্বের বয়স এক বৎসরের মধ্যে বুঝা যায়।

বর্ণলক্ষণম্—শ্বেত, শোণ, কৃষ্ণ, হরিৎ ও চিত্র—অশ্বের এই পাঁচ প্রকার বর্ণ হইতে পারে। অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও লোমের বিভিন্ন বর্ণ অনুসারে উহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে; যথা—

সার, কর্ক, কুক্কুট, ক্রৌঞ্চপত্র, সিন্ধুবারক, অঞ্জনকেশক, শুক্লরোমক, শ্বেতাক্ষিক।

ইহা ছাড়া, বিশেষ কতক বর্ণের অশ্বকে বিশিষ্ট দেবতার নামের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে; যথা—চন্দ্রের অশ্ব শ্বেত, ইন্দ্রের অশ্ব সবুজ ইত্যাদি।

রাজবাহাধ্যায়—রাজার উপযোগী অশ্ব হইবে শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত বা বহু-বর্ণযুক্ত। উহার সুগঠিত অঙ্গ, মনোজ্ঞ গতি, শুভ-সূচক আবর্ত ও ললাম প্রভৃতিও থাকিতে হইবে। বিভিন্ন কার্যের উপযোগী অশ্বগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ—

পরমাশ্ব—দেবগণের উপযোগী। ঈদৃশ অশ্ব আরোহণার্থ নিষিদ্ধ এবং পূজ্য।

আভিষেচনিক—রাজার অভিষেক কালে আরোহণযোগ্য।

ক্ষাত্রিয়াশ্ব—ক্ষত্রিয়ের উপযোগী।

সান্নাহ্য—যুদ্ধে ব্যবহার্য।

ঔপবাহ্য—আরোহণোপযোগী।

ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীরই বিশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণ আছে।

আয়ুর্লক্ষণাধ্যায়—কতক লক্ষণের সাহায্যে অশ্বের আয়ুষ্কাল অনুমান করা যায়। যেমন, হ্রস্ব কর্ণ, মধুর স্বর, প্রশস্ত বক্ষ প্রভৃতি

দীর্ঘায়ু সূচনা করে। যে অশ্বের দেহের সম্মুখভাগ অবনত, উহা দীর্ঘজীবী হয় না।

উৎপাতপ্রকরণধ্যায়—অশ্বদেহের কতকগুলি লক্ষণ ও অশ্বের বিভিন্ন কার্য নানাপ্রকার অমঙ্গল সূচনা করে; যথা—অশ্ব বামপদে দ্বারা ভূমিকে আঘাত করিলে বুঝা যায় যাত্রা শুভ নহে। যদি অশ্বদেহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে এক বৎসর অনাবৃষ্টি নিশ্চিত॥

বাহনশিক্ষাধ্যায়—শিক্ষার ব্যাপারে অশ্বকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ—

(১) ব্রাহ্মণ—ভীরু ও লোভী,
(২) ক্ষত্রিয়—তেজস্বী ও সাহসী,
(৩) বৈশ্য—বন্য ও ধূর্ত,
(৪) শূদ্র—রুক্ষ, ভীরু ও নিষ্ঠুর।

অশ্বেব প্রকৃতি অনুসারে উহাকে সাম, দান ও দণ্ড প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে।

অশ্বের শিক্ষাস্থান হইবে প্রস্তরহীন, কোমল ও শুষ্ক। কোপনস্বভাব ও স্থূলদেহ ব্যক্তি এবং যে বিনা কারণে অশ্বকে প্রহার করে, সে অশ্বকে শিক্ষাদানের অযোগ্য। অশ্বশিক্ষক হইবে ধীর, আরোহণ পটু ও সতর্ক; অশ্বের মন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাকে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। অশ্বের বিভিন্ন দোষের জন্য তাহাকে দেহের নির্দিষ্ট স্থানে প্রহার করা বিধেয়; যেমন, অত্যন্ত হেষার জন্য জানুতে এবং বিপথে গেলে মুখে ইত্যাদি। অনুপযুক্ত-কালে ও স্থানে প্রহার করিলে অশ্ব-শিক্ষা ভাল হয় না।

ধারাধ্যায়—অশ্বের ধারা বা গতি নিম্নলিখিতরূপঃ—

(১) বিক্রমা—সাধারণ চলা,
(২) পুলকা—?
(৩) পূর্ণকণ্ঠী—মুখ সোজা রাখিয়া চলা,
(৪) ত্বরিতা—স্বয়ং দ্রুতধাবন,
(৫) নিরালম্বা—'তাড়িত' হইয়া চলা।

আরোহবিধানাধ্যায়—আরোহী স্থির হইয়া বসিবেন, কোন পার্শ্বে দুলিবেন না বা ভূমির দিকে অবলোকন করিবেন না। তিনি ধীরে ধীরে অশ্বকে প্রোৎসাহিত করিবেন। দক্ষিণপদের দ্বারা তিনি আরোহণ করিবেন। এই অধ্যায়ে আরোহণের

উপযোগী শুভ তিথি ও নক্ষত্রাদির আলোচনা আছে এবং
আরোহীর জন্য কতক মন্ত্রের ব্যবস্থাও দেওয়া হইয়াছে।

তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের নিম্নলিখিত পুঁথি হইতে অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধে কতক জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুঁথিটি মল্লদেব পণ্ডিতের 'সারসিন্ধু' বা শালিহোত্র বৈশম্পায়নীয়। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে এইরূপ।

বিকৃত অংগাদিযুক্ত অশ্ব

অন্ধ, বধির মূক, জড়, ক্লীব, 'কাশমোহী',[১] 'কুমারিকা'[২] প্রভৃতি অশ্ব বর্জনীয়। এইরূপ দোষযুক্ত অশ্বকে চিনিয়া লইবার জন্য কতক লক্ষণ আছে। যথা—যে অশ্ব আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং সমভূমিতে লম্ফ প্রদান করে উহাকে অন্ধ বুঝিতে হইবে। যে অশ্বকে ডাকিলে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে উহা বধির, ইত্যাদি।

এই প্রসংগে উত্তম ও অধম অশ্বের অংগ প্রত্যংগের পরিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অশ্বের মনস্তত্ত্ব

লৌহদণ্ড দর্শনে অশ্ব ভীত হয়। ভোজনকালে, রাজার অভিষেকে, ঘন্টাধ্বনিশ্রবণে ও উত্তম আরোহী লাভে অশ্ব পুলকিত হয়। আরোহী বিনা কারণে অশ্বকে আঘাত করিলে বা উহার গললগ্ন হইলে অশ্ব বিরক্তিবোধ করে।

অশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

(১) কশা (চাবুক)—ইহা হইবে কোমল, গোলাকার ও ছাগচর্মাবৃত।

(২) পাননলিকা—ইহা বংশনির্মিত ও অশ্বকর্ণাকৃতি। ইহাদ্বারা অশ্বকে জল ও দুগ্ধ পান করান হয়।

(৩) অক্ষিমালা—মশকদংশাদি নিবারণের জন্য অশ্বচক্ষুর উপযোগী চর্মাবরণ।

(৪) খুরত্র—লৌহনির্মিত ও খুরপার্শ্বের আচ্ছাদক। ইহাতে খুরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না। ইহা সম্ভবতঃ বর্তমান কালের নালের (horse-shoe) অনুরূপ কোন বস্তু।

(৫) খলীন (বল্গা বা রশ্মি)—ইহা হইবে কোমল, লৌহ বা হস্তিদন্তনির্মিত। ইহা অশ্বের মুখপার্শ্বের পরিমাপ অনুযায়ী হইবে।

১. যে অশ্বের সন্তানোৎপাদক শক্তি নাই।
২. পুং অশ্বের সহিত যে ঘোটকী একত্র থাকে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত 'অশ্বচিকিৎসিত' নামক একটি গ্রন্থ নকুলের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়১। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত।

গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র শালিহোত্রীয় শাস্ত্র আলোচনা অশ্বের দন্তজ্ঞান, অবয়বপ্রমাণ, বেগ, আরোহরণপদ্ধতি, ঋতুভেদে অশ্বের জাতিভেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ, অঙ্গের বর্ণবিচার, অশ্বের শুভাশুভলক্ষণ, অশ্বের দন্তজ্ঞান, অবয়বপ্রমাণ, বেগ, আরোহণপদ্ধতি, ঋতুভেদে অশ্বের পরিচর্যা, নস্যপ্রয়োগ, অশ্বের রোগ ও চিকিৎসা, অশ্বশালাবিধি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধে অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'অশ্ববৈদ্যক'২। ইহার রচয়িতা জয়দত্তসূরি বিজয়দত্তের পুত্র। গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের 'মহাসামন্ত' বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির উৎপত্তিস্থল অজ্ঞাত। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া আর কিছুই নাই। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ কতক প্রমাণ হইতে সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন যে, গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ, এমন কি পঞ্চদশ শতকেরও পরবর্তী হইতে পারেন।

'অশ্ববৈদ্যক' আয়তনে বিশাল; ইহার অধ্যায় সংখ্যা ৬৮। গ্রন্থস্থিত কয়েকটি উক্তি৩ হইতে মনে হয়, ইহা অশ্বচিকিৎসাবিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের সারসংকলনমাত্র। গ্রন্থটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে ঃ—

অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা, অশ্বদেহে শুভাশুভলক্ষণ, অশ্বের বিভিন্ন বর্ণ, স্বল্প ও দীর্ঘ আয়ুর লক্ষণ, অশ্বের দন্তদর্শনে উহার বয়স নির্ধারণ, পারসীক, তুরস্ক, সৈন্ধব প্রভৃতি ভেদে বিবিধ শ্রেণীর অশ্ব, দীর্ঘ ও বক্র গ্রীবাবিশিষ্ট, হ্রস্বকর্ণযুক্ত, মহাজব, মহাকায় ও নিস্ত্রাস তাজিক শ্রেণীর অশ্বের সর্বাধিক উৎকর্ষ, অশ্বসমূহের চারি বর্ণে ভাগ, অশ্বার বন্ধ্যাত্বের প্রতিকার, অশ্বের উপযুক্ত খাদ্য, অশ্ব-শালা নির্মাণ, অশ্বের নানাবিধ রোগ ও চিকিৎসা। অশ্বের রোগ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বায়ুরোগ হয় বর্ষায় ও হেমন্তে, পিত্তরোগ শরতে ও গ্রীষ্মকালে, এবং কফ হয় শীতে ও বসন্তে। অশ্বোদরে কীটের উৎপত্তি একটি বিশিষ্ট রোগ। ব্রণ, শূল, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ ও উন্মাদ প্রভৃতি অশ্বরোগের উল্লেখও আছে।

১. সং উমেশ গুপ্ত, কলিকাতা, ১৮৮৭ (বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা)।
২. বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।
৩. যথা ঃ—চিকিৎসা চ সমাসেন সিদ্ধৌষধসমন্বিতা।
মুনিপ্রোক্তানি শাস্ত্রাণি সম্যগালোচ্য বাজিনাম্॥ ১।৩।
ব্রহ্মণৈব যথোদ্দিষ্টো বাহনানাং বাহনে বিধিঃ।
সারং তস্য সমুদ্ধৃত্য সর্বং তৎ কথয়াম্যহম্॥ ৭।১।

'অশ্ববৈদ্যকে' অশ্বরোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল ভেষজের নামোল্লেখ আছে, উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভেষজগুলি প্রধান ও সুপরিচিত ঃ—

(অ-কারাদিক্রমে)

অগুরু—	Aquilaria agallocha.
অতসী—	Linum usitatiesimum.
অপামার্গ—	Achyranthes aspera.
অর্জুন—	Pentaptera arguna or Terminalia arjuna.
অহিফেন—	Opium.
আমলক—	Phyllanthus emblica.
উদুম্বর—	Ficus glomerata.
এরণ্ড—	Ricinus communis.
কন্টকারী—	Solanum jacquinii.
করবীর—	Neruim odorum.
কুলত্থ—	Dolichos uniflorus.
গুগ্গুলু—	Burseraceae.
তুলসী—	Ocimum sanctum.
ধুস্তূর—	Datura fastuosa.
নিম্ব—	Azadirachta indica.
পটোল—	Trichosanthes diocia.
পিপ্পলী—	Piper longum.
রসোন— (লশুন)	Allium sativum.
সপ্তপত্র—	Alstonia scholarsis.
হরিতকী—	Terminalia chabula.
হিঙ্গু—	Ferula assafoetida.

বাগ্ভটের নামাঙ্কিত 'অশ্বায়ুর্বেদ' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উহা অপ্রকাশিত[১]।

১. পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্টিটিউটের ১৮৯৯—১৯১৫ সালের পুথি-সংখ্যা ৫৮১ (লিপিকাল ১৬৫১ খৃষ্টাব্দ)। দ্রষ্টব্য ঃ—P. K. Gode রচিত Instructions regarding......hoise stables ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধ (MadrasUniversity Journal)।

পত্রসাহিত্য[১]

কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদান আবশ্যক, তাহাদের মধ্যে সেই দেশবাসীর লিখিত চিঠিপত্র অন্যতম। চিঠিপত্র অনেক প্রকারের হইয়া থাকে—বিভিন্ন রাজকর্মচারীর নিকট লিখিত রাজার পত্র, এক রাজা কর্তৃক অপর রাজার নিকট প্রেরিত পত্র। জনসাধারণের মধ্যে স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য ও প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতির মধ্যে যে পত্রাদির বিনিময় হইয়া থাকে সেগুলিও নগণ্য নহে। রাজাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি লিখিত পত্র হইতে এক রাজার সহিত অপর রাজার রাজনৈতিক সম্বন্ধ অনুমিত হইতে পারে। কর্মচারিগণের প্রতি রাজা কর্তৃক লিখিত পত্রাদি হইতে শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে যে পত্রসমূহের বিনিময় হয়, সেগুলিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পত্রলেখকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চিঠিপত্রে মানুষের মনের যেমন নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই মিলে না। সেইজন্যই কোন জাতির অন্তরলোকের সম্যক্ চিত্র লাভ করিতে হইলে, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু ধারণা করিতে হইলে চিঠিপত্রের সাক্ষ্য অপরিহার্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি বহুমুখী। সাহিত্য, লেখমালা, মুদ্রা, বৈদেশিকের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা উপাদান হইতে এই বিশাল ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন-ধারা ঐতিহাসিকগণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু, এ যাবৎ ভারতবাসিগণের চিঠিপত্রগুলির দিকে তাঁহাদের মনোযোগ বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। বর্তমান প্রসঙ্গে ভারত-ইতিহাসের এই উপেক্ষিত উপকরণের প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব।

ধর্ম ও নীতি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সুপ্রাচীন যুগে ভারতে যে চিঠিপত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহার কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। মাতৃচিত্রের নামাঙ্কিত 'মহারাজকণিকলেখ' এই জাতীয় একখানি লিপি। ইহাতে ৮৫টি শ্লোক আছে। রাজা কণিকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া লেখক এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর টমাসের (Thomas) মতে, মাতৃচিত্র মাতৃচেট হইতে অভিন্ন এবং কণিষ্কেরই নাম কণিক। ইহা যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে এই লিপির রচনাকাল খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতক।

নাগার্জুনের 'সুহৃল্লেখ' অপর একখানি লিপি। ইহা ১২৩টি শ্লোকে

১. এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থকার রচিত প্রবন্ধ A Study of the Epistolary and Documentary Literature in Sanskrit (*Indian Historical Quarterly*, 1958).

রচিত। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন কর্তৃক তদীয় সুহৃদ রাজা উদয়নকে ইহা লিখিত। ইহাতে বৌদ্ধদর্শনের সারমর্ম সংক্ষেপে মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ আছে। নাগার্জুনের কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়।

চন্দ্রগোমীর 'শিষ্যলেখধর্মকাব্য' ১১৪টি শ্লোকে রচিত। ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্বের মোহগ্রস্ত রত্নকীর্তি নামক রাজকুমারের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত। লেখক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

সংস্কৃত পুঁথির বিভিন্ন তালিকায় চিঠিপত্র বিষয়ক কয়েকটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ যে তিনটি গ্রন্থ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

(১) বররুচির নামাঙ্কিত 'পত্রকৌমুদী',

(২) অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত 'লেখপদ্ধতি',

(৩) দলপতি রায়ের 'যাবনপরিপাটী-অনুক্রম'।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও Aufrecht-এর Catalogus Catalogorum নামক তালিকায় (II. 70) 'পত্রপ্রশস্তিকাব্য' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

পত্রকৌমুদী[১]

এই গ্রন্থের অধিকাংশই শ্লোকে রচিত, কতক অংশ গদ্যে লিখিত।

'পত্রকৌমুদী' বররুচির নামাঙ্কিত। কিন্তু, ভারতের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যে ছয়জন বররুচির নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইনি যে কে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। 'পত্রকৌমুদী'র কোন একটি পুঁথির প্রারম্ভিক

---

১. এই নামের নিম্নলিখিত পুঁথিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়ঃ—
(ক) Jayaswal-এর Descriptive Catalogue of Manuscripts in Mithila নামক তালিকার ৭১ সংখ্যক পুঁথি,
(খ) ঐ, ৭২ নং,
(গ) ঐ, ৭২ এ,
(ঘ) ঐ, ৭২ বি,
(ঙ) ঐ, ৭২ সি,
(চ) পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত রাজসাহী গভর্ণমেন্ট কলেজে প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথি,
(ছ) A. B. Keith-এর Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in India Office, Vol. II, Pt. II-এর ৭২০৩ (৩০২৯) সংখ্যক পুঁথি।

এই গ্রন্থটির বর্তমান গ্রন্থকারকৃত সংস্করণ ও ইংরাজী অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য Bulletin of Deccan College Research Institute, Poona. (ডঃ সুশীল দের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপহৃত।)

শ্লোকে গ্রন্থকার স্বীয় পৃষ্ঠপোষক 'কীর্তিসিন্ধু বিক্রমাদিত্যে'র নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতেও গ্রন্থকারের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না; কারণ, ভারতের অনেক রাজাই এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের একটি শ্লোক হইতে মনে হয়, ইহার রচনাকালে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল১।

গ্রন্থকার ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের লোক ছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

গ্রন্থারম্ভে দেবদেবীর প্রতি নমস্কারান্তে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত, গুরু, পতি, পত্নী, পিতা, পুত্র, সন্ন্যাসী, ভৃত্য ও শত্রু প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে লিখিত পত্র সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পত্রের রঞ্জন, আকার, ভাঁজ করিবার প্রণালী, লেখকের গুণাবলী, পত্ররচনাপদ্ধতি, শব্দবিন্যাস, প্রশস্তি এবং 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ—এই সমস্ত বিষয় তাঁহার আলোচ্য। সমাসেন' অর্থাৎ সংক্ষেপে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; ইহা হইতে মনে হয় যে, সেই সময়ে এই সমস্ত নিয়মপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত গ্রন্থাদি ছিল এবং তাহাদের সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

পত্র সোণালী বা রূপালী প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতে পারে। উত্তম পত্রের আকার হইবে এক হাত ছয় অঙ্গুল দীর্ঘ, মধ্যমের ঠিক এক হাত এবং সাধারণ পত্র মুষ্টিহস্তপরিমিত হইবে।

পত্রে তিনটি ভাঁজ থাকিবে। প্রথম দুইটি ভাঁজ শূন্য রাখিয়া নিম্নতম অংশে পত্রের বিষয় লিখিত হইবে।

রাজকীয় পত্রলেখকের নিম্নলিখিত গুণাবলী আবশ্যক ঃ—

(১) মন্ত্রণাভিজ্ঞতা,

(২) রাজনীতিতে দক্ষতা,

(৩) নানা ভাষা ও লিপির জ্ঞান,

(৪) সন্ধি, বিগ্রহ ও রাজকার্য সম্বন্ধে জ্ঞান,

(৫) রাজার হিতৈষিতা,

(৬) সত্যপরায়ণতা, সংযম, বিবেচনা ও অকুটিলতা।

রাজাদিষ্ট লেখক প্রথমে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত পরামর্শক্রমে চিঠির খসড়া প্রস্তুত করিবেন। উহা রাজার অনুমোদিত হইলে চূড়ান্তভাবে লিখিত হইবে।

পত্রে সর্বপ্রথম থাকিবে মঙ্গলসূচক অংকুশ-চিহ্ন; এই চিহ্নের মধ্যভাগে একটি বিন্দু ও নিম্নে '৭' সংখ্যাটি লিখিত হইবে। ইহার পরে 'স্বস্তি'

১. ভাষয়াং সংস্কৃতনৈব কুশলং বিলিখেৎ সুধীঃ।
ততঃ শুভাশুভাং বার্তাং সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈস্তথা॥

শব্দটি এবং তৎপর 'শ্রী' থাকিবে। তৎপর পত্রপ্রাপকের যোগ্য প্রশস্তি লিখনান্তে লেখক সংস্কৃত ভাষায় তদীয় কুশলপ্রশ্নাদি লিখিবেন। ইহার পরে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় 'শুভাশুভ বার্তা' লিখিত হইবে। নিম্নে প্রাপকের হর্ষজনক একটি শ্লোকে তাহার যশ কীর্তন করিতে হইবে। ইহার পরে 'কিমধিকম্' বা এইরূপ কোন কথা লিখিয়া সর্বশেষে পত্রটির তারিখ, প্রেরণ পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি শ্লোক লিখিতে হইবে।

রাজকীয় পত্রের উপরিভাগ হইতে ছয় অঙ্গুলি পরিমিত স্থান শূন্য রাখিয়া নিম্নে চন্দ্রবিম্বসদৃশ বৃত্তাকার একটি চিহ্ন কস্তুরী এবং কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিত করিতে হইবে। মন্ত্রী, পতি, পত্নী, ভৃত্য ও শত্রুর পত্রে এই চিহ্ন অঙ্কিত হইবে যথাক্রমে কুঙ্কুম, সিন্দুর, অলক্তক, রক্তচন্দন ও রক্তের দ্বারা। পণ্ডিত, আচার্য, পিতা, পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্রে চন্দনের (শ্বেতচন্দন ?) দ্বারা এই চিহ্ন অঙ্কিত হইবে।

বিভিন্ন প্রকার পত্র ধারণ করিবার স্থান স্পষ্টভাবে গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন। রাজকীয় পত্রের, আচার্য, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও স্বামীর পত্রের স্থান শিরোদেশ, মন্ত্রিপত্রের স্থান ললাট এবং স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুর পত্রের যোগ্য স্থান বক্ষঃস্থল। শত্রুর পত্র রক্ষিত হইবে কণ্ঠদেশে।

রাজাকে লিখিত পত্রের সূচনা হইবে 'মহারাজাধিরাজ', 'দানশৌণ্ড', 'সচ্চরিত' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা। মন্ত্রীকে লিখিত পত্র তদীয় গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। পণ্ডিতব্যক্তির নিকট লিখিত পত্রের প্রারম্ভে থাকিবে তাঁহার উদ্দেশ্যে লেখকের প্রণিপাতের সংখ্যা ও তদীয় শাস্ত্রজ্ঞতার উল্লেখ। লেখকের 'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত' ও প্রাপকের বিদ্যার উল্লেখের দ্বারা আচার্য-পত্রের সূচনা হইবে। স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের প্রারম্ভে থাকিবে তদীয় গুণাবলীর উল্লেখ, স্ত্রীর প্রণিপাত ও 'প্রাণপ্রিয়' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ। 'প্রাণপ্রিয়া', 'সাধ্বী', 'সচ্চরিতা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা স্বামী স্ত্রীর পত্র লিখিতে আরম্ভ করিবেন। 'প্রভু' শব্দ ও প্রণিপাতাদির উল্লেখ করিয়া পুত্র পিতাকে লিখিবে। 'সর্ববাঞ্ছাবিনির্মুক্ত' ও 'সর্বশাস্ত্রার্থপারগ' প্রভৃতি শব্দ সাধু সন্ন্যাসীকে লিখিত পত্রের সূচনায় থাকিবে।

ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে 'শ্রী' শব্দের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আচার্য, পতি, শত্রু, বন্ধু ও ভৃত্যের নামের পূর্বে এই শব্দটির সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ছয়, পাঁচ, চার, তিন ও দুই। পুত্র ও পত্নীর নামের পূর্বে প্রতিক্ষেত্রেই এই শব্দটি একবার মাত্র লিখিতব্য।

'পত্রকৌমুদী'র এইটুকু শ্লোকাকারে রচিত। অবশিষ্ট অংশ গদ্যে রচিত। ইহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির উপযুক্ত প্রশস্তিসমূহের নির্দেশ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজার যোগ্য প্রশস্তিটি নিম্নে আংশিক উদ্ধৃত হইল ঃ—

স্বস্তি......প্রচণ্ডভুজদণ্ড......প্রার্থিতানুকম্পাসুধাসংপাতানবরত
বিশ্বদ্দারিদ্র্যবিদ্রাবণ......সঞ্চিতযশোমৃণালজালভূপালকুল-
তিলকশ্রীযুতমহারাজাধিরাজেষু......।

'পত্রকৌমুদী'তে আলোচিত বিষয়গুলি অনুধাবন করিলে মনে হয়, সেই যুগে পত্রলিখন একটি কলাস্বরূপ গণ্য হইত এবং এই সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

লেখপদ্ধতি১

এই গ্রন্থটি গদ্যে রচিত; স্থানে স্থানে শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইহাতে গ্রন্থকার বা সংকলয়িতার নাম নাই। ইহার রচনা বা সংকলন-কালও নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না। এই গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় মনে করেন যে, পুঁথিগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুইটির লিপিকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক। পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্ট্যাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টি-টিউটে রক্ষিত পুঁথিটির তারিখ ১৫৩৬ সম্বৎ (=১৪৮০ খৃষ্টাব্দ)। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে মূল গ্রন্থটির রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্বভাগে স্থাপন করা যায়। গ্রন্থটিতে যে সমস্ত দলিলপত্রের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কোন কোনটিতে ৮০২, ১২৮৮, ১৩৩২, ১৩৯৯, ১৪০৭ ও ১৫৩৩ প্রভৃতি সংবৎ-এর উল্লেখ রহিয়াছে। এইগুলি সম্ভবতঃ সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত যে মূল দলিলপত্রাদি সংকলয়িতা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাদের তারিখ।

এই গ্রন্থে যে সকল রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন বলিযা জানা যায়। ইহাতে এমন কতক শব্দের ব্যবহার আছে, যেগুলি গুজরাটী ভাষায় অদ্যাবধি প্রচলিত। তদুপরি, গুজরাটের সোমনাথের এবং গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত কতক স্থানের উল্লেখ ইহাতে রহিয়াছে। এই সকল কারণে, গ্রন্থটির উৎপত্তি গুজরাটেই হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়।

গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, ইহাতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও স্থানের নাম লিখিত আছে২। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঃ—

অজয়পাল, কর্ণদেব, কুমারপাল, চামুণ্ডদেব, জয়সিংহ, দুর্লভদেব, নাগপাল, প্রতাপসিংহ, মূলদেব, লাবণ্যদেব, বল্লভদেব, বিজয়সিংহ, সিংহণ-

১. গাইকোয়ার ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজে প্রকাশিত (সং—সি. ডি. দালাল ও জি. কে. শ্রীগোন্দেকর, বরদা, ১৯২৫)। কোন কোন পুঁথিতে এই গ্রন্থটির নাম 'লেখপঞ্চাশিকা', যদিও পুঁথিভেদে লেখসংখ্যা ৫৪ হইতে ৬১। একটি পুঁথিতে লেখসংখ্যা মাত্র ২৫ (দ্রষ্টব্য—লেখপদ্ধতি, ভূমিকা, পৃঃ ১১।

২. ব্যক্তি ও স্থান সমূহের পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য—'লেখপদ্ধতি', পৃঃ ১২৯।

দেব ইত্যাদি[১]।

এই গ্রন্থোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে প্রধান ঃ—

অর্ণাহিল্লপত্তন, আশাপল্লী, জাম্বুগ্রাম, পঞ্চাল, পত্তন, প্রভাস, লাটাপল্লী, বর্ধমান, শাকম্ভরী, সীতাপুর ইত্যাদি[২]।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ইহাতে রাজকীয় ঘোষণা ও আদেশপত্র, তাম্রশাসন, সন্ধিপত্র, ক্রয় ও আধি সংক্রান্ত দলিল, দাসপত্র প্রভৃতি নানাবিধ দলিল দস্তাবেজের আদর্শ লিখিত আছে। তৎপর গুরু-শিষ্য, পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্য, শ্বশুর-জামাতা, গোপন প্রেমিক-প্রেমিকা প্রভৃতিব মধ্যে যে সকল পত্রবিনিময় হইত, তাহাদের নমুনাও লিপিবদ্ধ আছে। স্বামী-স্ত্রীর পত্রের নমুনাতে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু ব্যাপার রহিয়াছে। স্বামী ও স্ত্রীর মানসিক অবস্থাভেদে পত্রের রচনা-প্রণালী ভিন্ন হইবার নির্দেশ আছে; যেমন, তুষ্টা ভার্যা প্রবাসী পতিকে লিখিবেন যে, তিনি গৃহকর্ম নিপুণভাবে সম্পাদন করিতেছেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি নিতান্ত দুঃখার্তা এবং পতি যেন শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আবার, রুষ্টা পত্নী লিখিবেন যে, স্বামীর অত্যন্ত দীর্ঘায়িত প্রবাসে তাঁহার সন্দেহ হইতেছে—স্বামী সম্ভবতঃ অপর কোন নারীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আরও লিখিবেন যে, স্বামী যাত্রার পূর্বে তাঁহাকে যেটুকু সম্বল দিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিঃশেষ হইয়াছে; স্বামী যদি অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহা হইলে তিনি পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে গমন করিবেন।

এই গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থার কিছু ধারণা করা যায়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

শাসনসৌকর্যের জন্য রাজ্যকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইত। এক একটি অঞ্চল 'দণ্ডনায়ক' নামক রাজ-প্রতিনিধির শাসনাধীন ছিল। সেই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও দণ্ডনায়কের শাসন মানিতে হইত।

ব্রাহ্মণদিগকে গ্রামদান করিবার প্রথা ছিল। এই দান সংক্রান্ত শাসন-পত্রে দাতা ও গ্রহীতার নাম, দেয়বস্তুর বিবরণ, দানের তারিখ এবং গ্রহীতার ভোগে ব্যাঘাত না জন্মাইবার জন্য দাতার উত্তরাধিকারী ও জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ প্রভৃতি লিখিত থাকিত। এইরূপে প্রদত্ত ভূমি দ্বিবিধ ছিল

১. ইঁহাদের মধ্যে, কর্ণদেব, কুমারপাল, জয়সিংহ ও লাবণ্যপ্রসাদ (=লবণপ্রসাদ?) গুজরাটের স্বনামধন্য রাজা ছিলেন। দ্রষ্টব্য ঃ—M. S. Commissariat-এর *History of Gujarat*, 1938.

২. অর্ণাহিল্লপত্তন (=অণহিলবাদ পাটন) ছিল গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী। আশাপল্লী (=অশবল), প্রভাস (=প্রভাস পাটন), বর্ধমানপুর প্রভৃতি গুজরাটের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। দ্রষ্টব্য—উক্ত M. S. Commissariat এর গ্রন্থ।

—ব্রহ্মদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ভোগ্য ও ধর্মদায় বা কোন দেবতার পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত।

প্রতিটি গ্রাম একটি রক্ষপালের অধীনে থাকিত। তিনি গ্রামের অভ্যন্তরীণ 'ক্ষুদ্র উপদ্রবে'র প্রতিকার করিতেন এবং রাজাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করিতেন। তাঁহার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

'দেশোত্তার' নামে একপ্রকার ঘোষণাপত্রে রাজা মহন্তক (হিসাবরক্ষক), বৃহদ্বাজিক (পুলিশ কর্মচারী) ও হিণ্ডীপক (রাজস্বকর্মচারী) প্রভৃতির প্রতি এই বলিয়া নির্দেশ দিতেন যেন কতক বণিক্‌কে নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যসহ একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে যেন শুল্ক আদায় করা না হয়।

'সমকর' শ্রেণীর গ্রামগুলিতে রাজস্বের হার নির্দিষ্ট ছিল এবং 'উদ্ধ শ্রেণীর গ্রামে মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল।

কতকপ্রকার অপরাধীর নিকট হইতে দণ্ড (=জরিমানা) আদায়ের ব্যবস্থা ছিল; অবশ্য দণ্ডের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে কিস্তিবন্দীতেও উহা দেওয়া যাইত।

রাষ্ট্রের হিতকারী কোন কোন ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে ভোগ করিবার জন্য গৃহ দেওয়া হইত। গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত ভাড়া বা খাজানা দিতে হইত। এতৎসংক্রান্ত দলিলের নাম ছিল 'গুপ্তপট্টক'।

কোন হিসাবরক্ষক কর্মচারী স্থানান্তরে বদলীর আদেশ পাইলে তাঁহার জিম্বায় যে সকল মুদ্রা (seal), হিসাবের বহি ও সংগৃহীত রাজস্বাদি থাকিত তিনি তাহা বুঝাইয়া দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেন।

অশ্ববিক্রয়ের জন্য দলিল সম্পাদন করিতে হইত।

পণ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিবার জন্য বণিক্‌দিগকে 'টিম্পনক' নামক প্রমাণপত্র (certificate) নিতে হইত। 'মাগাক্ষর' নামক প্রমাণপত্রে বণিক্‌দের মালবাহী শকটের সংখ্যা ও তাঁহাদের দেয় শুল্কের পরিমাণ ধার্য থাকিত। সেই অনুসারে, পথিমধ্যস্থ কর্মচারিগণ তাঁহাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতেন।

বিচারালয়ে বাদীর যে অভিযোগপত্র দাখিল করিতে হইত, তাহার নাম ছিল 'ভাষা'। 'ভাষা' দাখিলের পরে প্রতিবাদীকে 'উত্তর' দাখিল করিতে হইত। চাক্ষুষ সাক্ষী বা স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হইত না। 'ন্যায়বাদে' (judgment) বিচারের তারিখ, মাস ও বৎসর, বিচার্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং পরিশেষে বিচারকের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকিত। কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্র সংক্রান্ত বিচারে বিচারক পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন; ইহা

অনেকাংশে বর্তমান কালের জুরীর বিচারের অনুরূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে দিব্যপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। 'ধর্মচীরিকা'য় অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষগুণ ঘোষণার্থে দেবদেবীর আবাহন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকিত।

'গুণপত্র' নামক দলিলের দ্বারা রাজা কৃষকদিগকে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। এই গুণপত্র হইতে তদানীন্তন কালে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ—

(১) রাজস্বের হার বা, কোন কোন ক্ষেত্রে, মোট পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইত,

(২) প্রত্যেকের দলিলে নির্দিষ্ট কিস্তিবন্দী অনুসারে রাজস্ব দিতে হইত,

(৩) কৃষিজাত দ্রব্যের ২/৩ ছিল রাজার প্রাপ্য; অবশিষ্ট ১/৩ ও সম্পূর্ণ তৃণ কৃষকের ভোগ্য,

(৪) প্রধান কৃষকেরা রাজদত্ত ব্রাহ্মণের এবং দেবতার ভূমি কর্ষণ করিতে পারিত না,

(৫) রাজার প্রাপ্য অংশে ব্যতিক্রমের অপরাধে প্রথমতঃ কৃষককে সতর্ক করা হইত; পুনঃপুনঃ ঐরূপ অপরাধের জন্য গ্রাম হইতে তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থাও ছিল,

(৬) যে কৃষক পলায়ন করিত, তাহার জমি, শস্য ও গবাদি রাজা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইত।

গবাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধারের প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে ছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে, অধমর্ণ অক্ষম হইলে প্রতিভূকে উত্তমর্ণের অর্থ পরিশোধ করিতে হইত। কোন দ্রব্য বন্ধক না রাখিয়া যে ঋণ গ্রহণ করা হইত, তাহার জন্য অধমর্ণ উত্তমর্ণকে 'হস্তাক্ষর' নামক দলিল করিয়া দিত; ইহা সম্ভবতঃ বর্তমানকালের হ্যান্ড্‌নোটের অনুরূপ।

শস্য ধার দিবার প্রথাও সমাজে ছিল। ঐ শস্য এবং বৃদ্ধি স্বরূপ উহার চতুর্থভাগ অধমর্ণ পরিশোধ করিত; এইরূপ ব্যাপারেও প্রতিভূর ব্যবস্থা ছিল।

যে সকল ভূমির স্বত্বাধিকারী সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিত, তাহাদিগকে 'ডোহলিকা' বলা হইত। ঐরূপ ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত এবং প্রকৃত স্বত্বাধিকারী উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া ঐ ভূমি মুক্ত করিতে পারিত।

যে সর্তাবলীতে গ্রামদান করা হইত, সেই সর্ত ভঙ্গ হইলে গ্রামগুলি সরকারে ফিরাইয়া নেওয়া হইত; এই ব্যবস্থার নাম ছিল 'ব্যাষেধ'।

শত্রুর সহিত যুদ্ধরত রাজা মিত্রশক্তির নিকট হইতে সাহায্যলাভের জন্য তদীয় 'সান্ধিবিগ্রহিক' মন্ত্রীকে পত্র প্রেরণ করিতেন।

তৎকালে ক্রীতদাস প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

লক্ষণীয় এই যে, ক্রীতদাসীর বিক্রয় সংক্রান্ত দলিলের আদর্শ আছে, কিন্তু ক্রীতদাসের উল্লেখ কোথাও নাই। বিক্রেতব্য ক্রীতদাসীর যৌবন ও রূপ তাহার গুণাবলীর অন্যতম। তাহাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইত যে, সে প্রভুর জন্য গৃহমার্জনা, ইন্ধনসংগ্রহ, জলবহন, মলমূত্রশোধন, গোদোহন, শস্যক্ষেত্রের নিস্তৃণীকরণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য করিবে। প্রভু তাহাকে অন্নবস্ত্রদ্বারা পোষণ করিতেন বটে; কিন্তু, ক্রীতদাসীর কোন আত্মীয়ের, এমন কি তাহার স্বামীরও তাহার উপর কোন অধিকার থাকিত না। অপর একপ্রকার দাসীকে বলা হইত 'স্বয়মাগতা'। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, স্বজন কর্তৃক পরিত্যাগ, ম্লেচ্ছের অত্যাচার—এই সকল কারণে কতক স্ত্রীলোক দাসীত্ব বরণ করিত। প্রভুর নিকট তাহাদের লিখিত অঙ্গীকার করিতে হইত যে, তাহাদের রূপমুগ্ধ কোন প্রেমিক থাকিলেও তাহারা মুক্তি প্রার্থনা করিবে না।

সম্প্রতি জনসাধারণের পত্রাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নাম ছিল 'কুঙ্কুমপত্রিকা'; সম্ভবতঃ উহাতে বর্তমান কালের সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় কুঙ্কুমবিন্দু স্থাপন করিবার প্রথা ছিল। ঐ পত্রে শুধু যে আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করা হইত তাহা নহে, তদীয় গৃহবাসী যাবতীয় 'কুটুম্ব'কেও সাদর আহ্বান জানান হইত; ইহা বর্তমান যুগের 'সবান্ধব' আগমনের নিমন্ত্রণের অনুরূপ।

'লেখপদ্ধতি'তে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে গোপন প্রণয়িনীর লিখিত পত্রের আদর্শ স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তৎকালের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের গোপন বা অবৈধ প্রণয় প্রচলিত ছিল।

স্বামী-স্ত্রীর পত্রের আদর্শগুলি তৎকালের সামাজিক অবস্থার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রবাসী পতি কর্তৃক পত্নীর নিকট লিখিত পত্র হইতে মনে হয় যে, তিনি স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষণের জন্য সর্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে স্ত্রীর চরিত্রবিষয়ে দুশ্চরিত্রা নারীর কোন কলঙ্ক না রটাইতে পারে, তৎপ্রতি সতর্ক করিয়া তিনি স্ত্রীকে পত্র লিখিতেন[১]। এই সকল পত্র হইতে আরও মনে হয় যে, গৃহপরিচালনায় স্ত্রীর ব্যয়বাহুল্য স্বামীর অত্যন্ত বিরক্তিজনক ছিল। প্রায়ই দেখা যায়, প্রবাসী পতি ব্যয়-বাহুল্যের জন্য স্ত্রীর প্রতি তিরস্কারাত্মক পত্র লিখিতেছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তৎকালে গৃহে অর্থব্যয় ব্যাপারে স্বামীর সহিত স্ত্রীর সমান অধিকার ছিল না; এই ব্যাপারে স্বামীই ছিলেন সর্বময় কর্তা, স্ত্রী ছিলেন শুধু তাঁহার আজ্ঞাকারিণী।

১. যথা গতায়াতকুলটিকাপ্রভৃতিজনো বহিবপ্রসিদ্ধিং নারোপয়তি তথানুষ্ঠেয়ম্—পৃঃ ৬৪।

সমাজে বহু স্ত্রী বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় এবং ইহার কুফলেরও অভাব ছিল না। একটি পত্রে দেখা যায়, প্রবাসী পতি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিতেছেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃবধূগণের বিবাদে সে পক্ষপাতিত্ব না করিয়া যেন উহা মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করে।

যাবনপরিপাটী-অনুক্রম১

এই গ্রন্থের রচয়িতার (সংকলয়িতার?) নাম দলপতি রায়। তিনি মাধবেন্দ্র নামক জনৈক রাজাধিরাজের পরিচারক বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত ও ইস্‌লাম শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, পণ্ডিতগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং হিন্দু ও ম্লেচ্ছ রাজগণের সেবা করিয়াছেন। তিনি নাকি স্বীয় গুরু ব্রজভূষণ শর্মার অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মনে হয়, তাঁহার পিতা জনৈক মুসলমান শাসনকর্তার কর্মচারী ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে রাধাকৃষ্ণের স্তুতি হইতে দলপতি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

গ্রন্থটির রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। গ্রন্থমধ্যে যে মাধবেন্দ্রসিংহের নাম আছে, সেই মাধব সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। আদর্শ পত্রের দুইটি স্থানে গ্রন্থকার ১৮২০ বিক্রমাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। একই অব্দের পুনরুল্লেখ হেতু ইহা গ্রন্থরচনাকাল বলিয়া মনে হয়। যদি এই অনুমান ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোটামুটি খৃষ্টীয় ১৭৬৪ অব্দে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, দলপতি যে মূল পত্রগুলি আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটির তারিখ ছিল এইরূপ।

‘বর্ত্মপাল’ নামে অভিহিত জনৈক কর্মচারীকে রাজা এক পত্রে নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি যেন বঙ্গাভিমুখে প্রস্থিত ধনপাল নামক বণিকের যাত্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটান। ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, গ্রন্থটির উৎপত্তি হইয়াছিল বঙ্গদেশের বহির্ভূত কোন স্থানে।

গ্রন্থটি সাতটি পরিচ্ছেদে রচিত; প্রতিটি পরিচ্ছেদকে বলা হইয়াছে ‘অধিকার’, চতুর্থ পরিচ্ছেদটি ‘অধ্যায়’ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে দলপতি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক ‘সার্বভৌম’ মাধবসিংহের ভূয়সী

১.পুনার ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউটের 409 of 1882-83 (New No. 33) সংখ্যক পুঁথি। এই গ্রন্থটিই ‘লেখপদ্ধতি’র সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক ‘প্রশস্তিরত্নাকর’ নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় (‘লেখপদ্ধতি’র ২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। *Catalogus Catalogorum* গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে দলপতিরায়ের নামে ‘পত্রপ্রশস্তি’ নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

প্রশস্তি করিয়া তদীয় সভার বর্ণনা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ পত্রসমূহকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) সন্দেশাত্মক, (২) ব্যবহারাত্মক ও (৩) নির্দেশাত্মক। প্রথম প্রকার পত্রে সুখ দুঃখপূর্ণ সন্দেশ বা বার্তা থাকে। দ্বিতীয় প্রকার পত্রের উদ্দেশ্য বিবাদের মীমাংসা এবং শেষোক্ত পত্রে থাকে রাজার কোন নির্দেশ। সন্দেশাত্মক পত্র ত্রিবিধ—(ক) উত্তম—রাজা, আচার্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লিখিত, (খ) মধ্যম—সমপর্যায়েব ব্যক্তিকে লিখিত, (গ) অবম—পুত্র, ছাত্র বা ভৃত্যকে লিখিত।

সন্দেশাত্মক পত্র সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, ইহাতে পত্রলিখনের তিথি, দিবস, মাস ও বর্ষ, লিখনের স্থান ও কাল প্রভৃতির উল্লেখ থাকিবে এবং প্রাপকের কুশলপ্রশ্নাদি লিখিত হইবে। 'উত্তম' চিঠিতে প্রাপকের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা, বিনয় ও প্রণিপাত প্রভৃতির উল্লেখও থাকিবে। 'মধ্যম' চিঠিতে লেখক প্রাপকের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও তজ্জন্য চিন্তা প্রকাশ করিবেন। 'অবম' শ্রেণীর পত্রে লেখক প্রাপকের প্রতি আশীর্বাদ, অনুগ্রহ প্রভৃতি ব্যক্ত করিবেন। কোন কোন পত্র গালা দিয়া বন্ধ করিবার বিধানও আছে।

ঋণ, আধি, প্রতিভূ, সাক্ষী, দান, বিক্রয় প্রভৃতি সম্বন্ধে চিঠিপত্র ও দলিলাদি ব্যবহারাত্মক শ্রেণীর পত্র। ন্যায়াধিকারী (judge), সীমাধ্যক্ষ ও গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান কর্মচারীকে রাজা যে পত্রসমূহে নির্দেশ দান করেন, সেগুলি নির্দেশাত্মক শ্রেণীর অন্তর্গত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে সন্দেশাত্মক কতগুলি পত্রের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রাজা কর্তৃক লিখিত পত্রসমূহের আদর্শ আছে। দ্বিতীয়ভাগে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রসমূহের আদর্শ দেওয়া আছে। উপলক্ষ্যগুলি এইরূপ ঃ—

বন্ধুর সাধারণ চিঠির উত্তর, বন্ধুর পুত্রের বিবাহোপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণপত্রের উত্তর, বন্ধুর স্বজনবিয়োগে তাহার প্রতি সান্ত্বনাপত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহারাত্মক পত্রাদির আদর্শ লিখিত আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে রাজা, পণ্ডিত, বন্ধু, পিতাপুত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশস্তির নমুনা। রাজার প্রশস্তিটির অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

স্বস্তি শ্রীমৎপ্রবলতর হয়গজ রথপদাতিবল প্রতাপানির্জিত—
প্রচণ্ডপ্রোদ্দণ্ডারাতি......সুধাংশুদীধিতিধারা-
ধবলযশঃপূরপূরিতাদিঙ্মণ্ডলেষু......বিস্তারিতসুনিপুণ-
নীতিপ্রকাবসমাবর্জিতানেকবিষয়াধিপপ্রণতমৌলিমুকুট-
মাণিক্যমরীচিচয়চর্চিতচরণারবিন্দেষু। দানবারিপ্রবাহ-

বিপ্লাবিত বিম্বন্মণ্ডলীদারিদ্র্যদ্রুমখণ্ডেষু ইত্যাদি।

সপ্তম এবং সর্বশেষ পরিচ্ছেদে বিভিন্ন রাজকীয় বিভাগের নাম ও উহাদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারিগণের আখ্যা লিখিত আছে। প্রধান প্রধান বিভাগ ও বিভাগীয় অধ্যক্ষের আখ্যা নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

বিভাগ

আস্তাবল—অশ্বশালা,
কিতাবখানা—গ্রন্থাগার,
কোষখানা—কোষাগার,
গুসলখানা—স্নানাগার,
চিরাগখানা—প্রদীপাগার,
তস্‌বিরখানা—চিত্রশালা,
দবাইখানা—ভেষজাগার,
পাল্কিখানা—পাল্কি রাখিবার স্থান,
ফরাসখানা—গালিচা, চাদর প্রভৃতি রাখিবার স্থান,
বাবর্চিখানা—রন্ধনাগার,
মেওয়াখানা—ফল রাখিবার স্থান,
শিকারখানা—মৃগয়ার সরঞ্জাম রাখিবার স্থান।

বিভাগীয় অধ্যক্ষ

কাজী—বিচারক,
কোতোয়াল—নগরে প্রধান পুলিশ কর্মচারী,
দারোগা—পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর,
দেওয়ান—মন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী,
নাজির—পরিদর্শক,
ফৌজদার—সেনাবাহিনীর পরিদর্শক,
বক্‌শি—সেনাপতি বা যিনি বেতনাদি প্রদান করেন,
মীরবহর—শুল্ক আদায়কারী অথবা নৌবাহিনীপতি।

সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষভাগে নগরের অধিবাসী কারুক ও শিল্পিগণের শ্রেণীভাগ আছে। তৎপর, বস্ত্র পরিমাপের এবং অশ্ব ও মণিমুক্তা পরীক্ষার উপায় প্রভৃতি লিপিবন্ধ আছে। অবশেষে দেশের শাসন সৌকর্যার্থে সুবা, সরকার, মৌজা, বন্দর, দুর্গ ও পরগণা প্রভৃতি যে সকল ভাগ বিভাগ ছিল তাহাদের উল্লেখ আছে। চৌধুরী, কানুনগো, আমীন, খাজাঞ্চী ও তহ্‌বিলদার প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মচারিগণের উল্লেখও এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে রহিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান*

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সভ্যতার ইতিহাসেই নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান দেখা যায়। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে নারী দুহিতা, পত্নী ও মাতারূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। বৈদিক যুগে নারী যে শুধু গৃহে উচ্চাসনের অধিকারিণী ছিলেন তাহা নহে। সামাজিক জীবনে, ধর্মজীবনে এবং বিদ্যাচর্চাতেও তাঁহার অধিকার পুরুষের সমানই ছিল। পতির সঙ্গে যাগযজ্ঞে তাঁহার সহযোগিতার জন্যই তিনি পত্নী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন১। ঋগ্বেদে অনেক ব্রহ্মবাদিনী বা নারী ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলের রচনা পাওয়া না গেলেও ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত কতক ব্রহ্মবাদিনীর নামের সহিত যুক্ত আছে। যে সকল নারী-ঋষির রচনা ঋগ্বেদে অদ্যাবধি পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ঘোষা (১০।৩৯), বিশ্ববারা (৫।২৮) অপালা (৮।৯১), গোধা (১০।১৩৪), রোমশা (১।১২৬) ও লোপামুদ্রা (১।১৭৯)।

উপনিষদের যুগেও যে নারীর ব্রহ্মবিদ্যাদি চর্চার অধিকার অব্যাহত ছিল, তাহার প্রমাণ কোন কোন উপনিষদেই রহিয়াছে। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে'র গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথা সুবিদিত।

কালক্রমে নারী বেদবিদ্যায় ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতে স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসনে স্ত্রীলোকের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কিছুতেই অধিকার ছিল না; পতিশুশ্রূষাই ছিল তাঁহার চরম ও পরম ধর্ম, স্বর্গলাভের সোপান২। পুরুষশাসিত

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) Sanskrit Poetessess—J. B. Chaudhuri, Pts., A & B, Calcutta, 1939.

(২) Dvarakapattala and Gangavakyavali—J. B. Chaudhuri, Calcutta, 1940.

(৩) নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে, কলিকাতা, ১৯৫৪।

(৪) Poems by Indian Women—M. Macnicol.

(৫) History of Classical Sanskrit Literature,—M. Krishnamachariar.

১. পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে—পাণিনি ৪।১।৩৩।

২. নাস্তি স্ত্রীণং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্‌।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ মনুস্মৃতি—৫।১৫৫।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উক্ত অনুষ্ঠানাদিতে নারীকে অধিকার না দিলেও, শাস্ত্রকার নারীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। যে 'মনুসংহিতা'তে নারী-বিরোধী উক্তপ্রকার অনুশাসন আছে, সেই গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। মনুস্মৃতি—৩।৫৬।

সমাজে পুরুষের অতিপ্রাধান্যই ছিল উক্ত বিষয়গুলিতে নারী-বিদ্বেষের মূল। বেদাধিকারবঞ্চিত স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের ধর্মজিজ্ঞাসা ও ধর্মানুষ্ঠান-প্রবণতা বিশাল পুরাণ গ্রন্থগুলির সৃষ্টির অন্যতম কারণ হইয়াছিল। পৌরাণিক ধর্মে নারীর অধিকার পুনরায় স্বীকৃত হইল।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুরুষ-রচিত শাস্ত্রে বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানাদিতে নারীর স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নতর হইলেও, তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ম্লান হয় নাই এবং সেই প্রতিভার স্ফুরণে পুরুষ কোন বাধা জন্মায় নাই। 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রাজশেখর (খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতক) মুক্তকণ্ঠেই বলিয়াছেন—পুরুষবদ্ যোষিতোঽপি কবীভবেয়ুঃ। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্যদুহিতরো......শাস্ত্রপ্রহত-বুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ। অর্থাৎ, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও কবি হওয়া বিধেয়। রাজকন্যাগণের ও মহামাত্যদুহিতাদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং কবিত্বের নিদর্শন দৃষ্টও হয় শ্রুতও হয়।

ক্লাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত কাব্যে নারীর দানের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। কামলীলা, ললিতাঙ্গী, সুনন্দা, বিমলাঙ্গী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলাকবির নামমাত্র আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে; তাঁহাদের রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কোষকাব্যসমূহে (anthology) নারী-কবির রচিত কতক শ্লোক সংরক্ষিত আছে। কোষকাব্যগুলিতে যে সকল নারী-কবির নামাঙ্কিত শ্লোক রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

> ইন্দুলেখা, গন্ধদীপিকা, শীলাভট্টারিকা, বিকটনিতম্বা, গৌরী, চণ্ডালবিদ্যা, চন্দ্রকান্তা, জঘনচপলা, পদ্মাবতী, ভাবদেবী, মদালসা, মদিরেক্ষণা, বিজ্জা, সরস্বতী, চিন্নম্মা, ভিক্ষুণী।

ইঁহাদের রচিত শ্লোকগুলির বৈচিত্র্য উপভোগ্য। দেবতা, মানুষ, প্রকৃতি, প্রেম, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে তাঁহারা শ্লোক রচনা করিয়াছেন; অবশ্য প্রেমাত্মক রচনাই সর্বাধিক। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার, প্রণয়কলহ, দূতীর কার্যকলাপ, নায়কনায়িকার মিলন প্রভৃতি প্রেমের যাবতীয় ভাবপরম্পরাই তাঁহারা রূপায়িত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকই প্রেমের কেন্দ্রীভূত বলিয়া সম্ভবতঃ এই বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ সর্বাপেক্ষা অধিক। নারীর দেহলাবণ্য তাঁহাদের কতক কবিতার উপজীব্য। রাজা, কবি, কৃপণ, কুটিল, লোভী প্রভৃতি পুরুষের চরিত্র-চিত্রণেও তাঁহারা কখনও কখনও তৎপর হইয়াছেন।

কোষকাব্যে সংকলিত এই শ্লোকগুলির রচনাশৈলী উচ্চকোটির না হইলেও ইহাদের সরল সাবলীল ভাব চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই। নারী-হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি কোন কোন শ্লোকে মনোজ্ঞভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কতক শ্লোকে রচয়িত্রীর ছন্দনৈপুণ্য ও অলঙ্কার-চাতুর্য লক্ষণীয়। নারী-

কবি-রচিত কয়েকটি শ্লোক বিভিন্ন অলঙ্কার-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; এইরূপ শ্লোকসমূহের মধ্যে শীলভট্টারিকার 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ।

কোষকাব্যে ও অলঙ্কার গ্রন্থাদিতে বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়াও মহিলা-কবিগণের রচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি যে অবহেলিত হইয়া কালের কবলিত হয় নাই, তাহাতেই মনে হয় ইহারা সুধীসমাজে নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। প্রধান প্রধান মহিলা-কবিগণের ও তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

কবি	কাব্য	বিষয়বস্তু
গঙ্গাদেবী (চতুর্দশ শতক)	মধুরাবিজয় বা বীরকম্পরায়চরিত	স্বীয় পতি কম্পরায়ের মাদুরা-বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
তিরুমলাম্বা (ষোড়শ শতক)	বরদাম্বিকাপরিণয়	বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায়ের সহিত বরদাম্বিকার পরিণয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
রামভদ্রাম্বা (সপ্তদশ শতক)	রঘুনাথাভ্যুদয়	কবির প্রেমিক তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের মহিমাকীর্তন।
দেবকুমারিকা (রাজপুতনার সংগ্রাম-সিংহের মাতা)	বৈদ্যনাথপ্রাসাদ প্রশস্তি	
মধুরবাণী (তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথের সভাকবি)	রঘুনাথ-রচিত আন্ধ্র রামায়ণের সংস্কৃত অনুবাদ	
লক্ষ্মীরাজ্ঞী (মালাবারের রাণী —খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতক)	সন্তানগোপালকাব্য	মূল কাহিনীটি এইরূপ। এক ব্রাহ্মণের একাদশ পুত্রের মধ্যে দশটি মৃত হইলে অর্জুন অবশিষ্ট পুত্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাতে অক্ষম হইলে

		অর্জুন অগ্নিপ্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইলে কৃষ্ণ সকল মৃত পুত্রকে বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরাইয়া আনেন।
সুন্দরবল্লী (খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতক)	রামায়ণচম্পূ	
জ্ঞানসুন্দরী (খৃষ্টীয় ১৯শ-২০শ শতক)	হালাস্যচম্পূ	

বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় এই যে, মহিলাকবিগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই-জন ছিলেন বাংলাদেশের[১]। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরজিলানিবাসিনী প্রিয়ম্বদা ছিলেন (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক) শিবরামের কন্যা ও রঘুনাথের পত্নী। ইনি 'শ্যামারহস্য' নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ফরিদ-পুরের অন্তর্গত পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম কোটালিপাড়ার দুর্গাদাস তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র কৃষ্ণনাথের বিদুষী ভার্যা ছিলেন বৈজয়ন্তী (খৃঃ ১৭শ শতক)। 'আনন্দলতিকাচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণনাথ স্ত্রীর নিকট স্বীয় ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—আনন্দলতিকাচম্পূর্যেনাকারি স্ত্রিয়া সহ; অর্থাৎ, যিনি স্ত্রীর সহযোগিতায় 'আনন্দলতিকাচম্পূ' রচনা করিয়াছিলেন। জয়ন্তী নাম্নী জনৈকা বঙ্গীয় নারীকবির কাব্যরচনারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহিলাকবি-রচিত কোষকাব্যস্থ কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল এবং উহাদের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

(ভাবদেবী-রচিত)

কিং পাদান্তে পতসি বিরম স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কংচিৎ কালং ক্বচিদপি রতস্তেন কস্তেঽপরাধঃ।
আগস্কারিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি ননু ত্বং ময়ৈবানুনেয়ঃ॥

অনুবাদ—(তোষণরত নায়কের প্রতি মানিনীর উক্তি)

পদপ্রান্তে কেন পতিত হইতেছ, স্বামীরা ত স্বাধীন। কোথাও কিয়ৎকালের জন্য রমণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার কী অপরাধ! নারী পতিপ্রাণা; তোমার বিরহে আমি বাঁচিয়া আছি। আমিই ত অপরাধিনী; তোমারই অনুনয় আমার কর্তব্য।

১. দ্রঃ M. Krishnamachariar-এর History of Classical Sanskrit Literature, পৃঃ ৩৯২।

(গৌরীকৃত)

অপাঙ্গস্তব তন্বঙ্গি বিচিত্রোঽয়ং ভুজঙ্গমঃ।
দৃষ্টমাত্রঃ সুমনসামপি মূর্ছাবিধায়কঃ॥

অনুবাদ—অয়ি কৃশাঙ্গি, তোমার এই কটাক্ষ বিচিত্র সর্পসদৃশ; দৃষ্ট হইবা-মাত্র ইহা দেবগণেরও মূর্ছা জন্মায়।

(মোরিকাকৃত)

লিখতি ন গণয়তি রেখাং নির্ঝরবাষ্পাম্বু ধৌতগণ্ডতটা।
অবধিদিবসাবসানং মাভূদিতি শঙ্কিতা বালা॥

অনুবাদ—অবিরত অশ্রুবর্ষণে (এই বিরহিণীর) গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছে। তিনি রেখাসমূহ অঙ্কিত করিতেছেন, কিন্তু উহাদিগকে গণনা করিতেছেন না। কি জানি, যদি বিরহদিবসের অবসান না হয় —এই আশঙ্কা।

(বিজ্জকারচিত)

উন্নিদ্রকোকনাদরেণুপিশঙ্গিতাঙ্গা
গায়ন্তি মঞ্জু মধুপা গৃহদীর্ঘিকাসু।
এতচ্চকাস্তি চ রবের্নববন্ধুজীব-
পুষ্পচ্ছদাভমুদয়াচলচুম্বিবিম্বম্॥

অনুবাদ—গৃহদীর্ঘিকাসমূহে বিকচপদ্মপরাগে রঞ্জিতদেহ অলিকুল মধুর গুঞ্জন করিতেছে, আর উদয়াচলস্পর্শী তরুণ তপন বন্ধুজীব পুষ্পচ্ছদের আভায় শোভা পাইতেছে।

(শীলাভট্টারিকাকৃত)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

অনুবাদ—যে (আমার) কুমারীভাব হরণ করিয়াছিল, সেই আমার বর, সেই চৈত্ররজনী, সেই প্রস্ফুটিত মালতীসৌরভ, সেই কদম্বসংসৃষ্ট পরিণত বায়ু, আমিও সেই; তথাপি সেই রেবাতটস্থ বেতসী-বৃক্ষতলে রতিলীলার স্মৃতিতে চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।

শেষোক্ত শ্লোকটি যে রসিক ও ভক্তচিত্তে নানাভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী', কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও শ্রীজীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' নামক গ্রন্থে। রূপ ইহাকে সখীর প্রতি রাধার উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতা-মৃতে' (মধ্য—১ম। ১৩শ পরিচ্ছেদ) চৈতন্যদেবের মুখে এই শ্লোক উচ্চারিত হইয়াছে। নীলাচলের আড়ম্বরে বীতস্পৃহ চৈতন্যদেব বৃন্দাবনদর্শনোৎসুক

হইয়া এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। 'গোপালচম্পূ'তে রাধার মুখে এই শ্লোকটি উচ্চারিত হইয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রেও নারীর কীর্তি উপেক্ষণীয় নহে। বর্তমানে মহিলার নামাঙ্কিত অন্ততঃ দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য এই যে, দুইখানি গ্রন্থই রাজমহিষীর নামের সহিত যুক্ত।

'দ্বারকাপত্তল' নামক গ্রন্থটি পাটলিপুত্রের রাজা হরসিংহের মহিষী বীনবায়ীর রচনা। ইঁহার জীবনকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে। চারিটি অধ্যায়ে গ্রন্থটিতে দ্বারকাতীর্থের মাহাত্ম্য, ঐ তীর্থে গমনের ফল, তথায় অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ, স্নান, দান, মন্ত্র, কৃষ্ণ-পূজা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ইহাতে পুরাণের বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অপর গ্রন্থটির নাম 'গঙ্গাবাক্যাবলী'। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা মিথিলার রাজা পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাসদেবী কর্তৃক রচিত। ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক। ঊনত্রিশটি অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থে গঙ্গাস্নান, গঙ্গার পূজা, দর্শন ও শ্রবণজনিত পুণ্য, গঙ্গাতীরস্থ প্রয়াগাদি বিশিষ্ট স্থানসমূহের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থটি যে এক সময়ে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ মিত্রমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র ও রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্মৃতিকারগণের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ।

শেষোক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা বিদ্যাপতি-রচিত; স্বীয় পৃষ্ঠপোষিকা বিশ্বাসদেবীর নামের সহিত তিনি গ্রন্থটি যুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থটিও রাজসভাশ্রিত কোন পণ্ডিতের রচনা হইতে পারে। তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মহিষীগণ গ্রন্থগুলি নিজেরা রচনা করিয়া থাকুন বা না থাকুন, গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ে তাঁহাদের অসীম উৎসাহ ছিল এবং এইপ্রকার গ্রন্থরচনায় তাঁহারা পণ্ডিতগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধগণের দান[১]

প্রচলিত ভাষায় স্বীয় বাণী প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধদেব তদীয় শিষ্য-বর্গকে আদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই জন্যই বোধ হয় বৌদ্ধধর্মবিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই পালিভাষায় রচিত। কিন্তু, সমাজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল প্রগাঢ় ও ব্যাপক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণের ধর্মশাস্ত্র ছিল সংস্কৃতে, সংস্কারাদি ক্রিয়াকাণ্ডে প্রচলন ছিল সংস্কৃত মন্ত্রাদির, বেদাঙ্গাদি নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত সংস্কৃতে এবং সমাজের উচ্চস্তরের কথ্য ভাষাও ছিল সংস্কৃত। সুতরাং, এই অভিজাত দেবভাষার প্রতি বৌদ্ধগণ উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। অনেক হিন্দু পণ্ডিত সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু বৌদ্ধগণের অনেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রাদি নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন বৌদ্ধগণ গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়া সংস্কৃতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, সংস্কৃতে রচিত না হইলে বৌদ্ধগণের রচিত গ্রন্থাদির পাঠকশ্রেণী বৌদ্ধ-গোষ্ঠীতেই সীমায়িত থাকিবে—এই বোধও হয়ত গ্রন্থকর্তৃগণের ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিতে হইলে ঐ সাহিত্যে বৌদ্ধগণের দানের আলোচনা অপরিহার্য। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ কোন শাখা নাই যাহাতে বৌদ্ধগণের উল্লেখযোগ্য দান নাই। বর্তমান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। অতএব সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বৌদ্ধগণের দান সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ধর্মগ্রন্থ

বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই ত্রিপিটক বৌদ্ধগণের বেদ বা বাইবল্ স্বরূপ। অনেকেব ধারণা, ইহা শুধু পালিভাষায়ই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, ত্রিপিটকের সংস্কৃত রূপের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে নেপালে ও মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত পুঁথিসমূহের মধ্যে। মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কার প্রসঙ্গে ষ্টাইন, কক্ (Coq), পেলিও (Pelliot) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের নাম অগ্রগণ্য।

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ—
(ক) History of Indian Literature, Vol. II.—Winternitz, pp. 226-423.
(খ) বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম—নলেনী দাশগুপ্ত।
(গ) ভারত ও মধ্য এশিয়া—প্রবোধ বাগচী।

তিব্বতীয় ও-চীনা অনুবাদ হইতে সংস্কৃত ত্রিপিটকের কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। 'মহাবস্তু', 'দিব্যাবদান', 'ললিতবিস্তর' প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে সংস্কৃত ত্রিপিটকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে মনে করা অসঙ্গত নয় যে, এককালে সমগ্র ত্রিপিটকেরই একটি সংস্কৃত রূপ ছিল। সংস্কৃত ও পালি ত্রিপিটকের মধ্যে রচনাক্রমে এবং শব্দপ্রয়োগে সাদৃশ্য থাকিলেও এই উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট। সুতরাং একটিকে অপরটির অনুবাদ বলা চলেনা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সম্ভবতঃ উভয়বিধ গ্রন্থেরই মূল ছিল মাগধীভাষায় রচিত ত্রিপিটক; অবশ্য মাগধী ত্রিপিটকের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন নাই।

সংস্কৃত ত্রিপিটকের যে সকল অংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান অংশগুলির কথা সংক্ষেপে বলিব। সর্বাস্তিবাদিগণের 'প্রাতি-মোক্ষসূত্র' এবং সংস্কৃত বিনয়পিটকের অপর কতক অংশ মধ্য এশিয়া ও নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'প্রাতিমোক্ষে'র চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। পালি 'সিক্‌খা' ও 'কম্মবাচা'র অনুরূপ সংস্কৃত বিনয়পিটকের 'শিক্ষা' ও 'সঙ্ঘকর্ম'-এর অংশবিশেষ মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে।

পালি 'নিকায়'গুলির অনুরূপ সংস্কৃত 'আগম'; যেমন, পালি 'দীঘ-নিকায়'=সংস্কৃত 'দীর্ঘাগম', পালি 'মজ্ঝিমনিকায়'=সংস্কৃত 'মধ্যমাগম'। পালি 'খুদ্দকনিকায়ে'র অনুরূপ সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রক'। 'ক্ষুদ্রকে' খুদ্দকনিকায়ে'র সকল অংশ অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকিলেও ইহাতে যে উদান, ধর্মপদ (=পালি ধম্মপদ), স্থবিরগাথা (=পালি থেরগাথা), বিমানবস্তু (=পালি বিমান-বত্থু) ও বুদ্ধবংশ ছিল, তাহা সংশয়াতীত।

যে সাতটি 'অভিধর্ম' চীনদেশীয় ত্রিপিটকে অনূদিত হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে পালি 'অভিধম্মপিটকে'র বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ কোন মূল সংস্কৃত গ্রন্থই চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

নেপালে ব্যাপকভাবে আদৃত 'বৈপুল্যসূত্রে'র অন্তর্গত নিম্নলিখিত নয়টি গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিতঃ—

অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর,
লঙ্কাবতার বা সদ্ধর্মলঙ্কার, সুবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যূহ,
তথাগতগুহ্যক বা তথাগতগুণজ্ঞান, সমাধিরাজ, দশভূমীশ্বর।

চীনা ত্রিপিটক ও তিব্বতীয় তেঞ্জুর হইতে জানা যায় যে, বৌদ্ধদার্শ-নিক নাগার্জুন, বসুবন্ধু ও অসঙ্গ প্রজ্ঞাপারমিতাসমূহের বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ অভিধান 'মহাব্যুৎপত্তি'তে 'বুদ্ধাবতংসক' নামক একখানি মহাযানসূত্রের উল্লেখ আছে। চীনা ত্রিপিটক ও তিব্বতীয় তেঞ্জুরে এই নামের অনেক রচনা সংরক্ষিত আছে; কিন্তু মূল সংস্কৃত

গ্রন্থ লুপ্ত। ইহার অংশবিশেষ পাওয়া যায়। 'রত্নকূট' নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধানও উক্ত চৈনিক ও তিব্বতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'রত্নকূটে'র কতক অংশ মধ্য এশিয়ায় খোটানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আখ্যান উপাখ্যান

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অবদান গ্রন্থাবলী বৌদ্ধগণের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। 'অবদান' (=পালি 'অপদান') শব্দে বুঝায় বুদ্ধদেবের বিগত জীবনসমূহের বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ। মানুষের জীবনে কর্মফলের দুর্নিবারতা এবং বুদ্ধদেব ও তন্মতানুবর্তী মহাপুরুষগণের প্রতি ভক্তিদ্বারা কর্মফল খণ্ডনের উপায়—এই নীতিশিক্ষাদানই গ্রন্থগুলির রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। ইহারা শ্লোকমিশ্রিত গদ্যে রচিত। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক, ইহারা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনাভঙ্গীর পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'অবদানশতক'১ প্রাচীনতম। ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে। 'দিব্যাবদান'২, 'মহাবস্তু'৩ ও 'ললিতবিস্তর'৪ অপর কয়েকটি বিশিষ্ট অবদানগ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির সংকলনকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতক বা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়। 'ললিতবিস্তরে'র সংকলনকাল অজ্ঞাত।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত কতক অবদানসংগ্রহ আছে। কতগুলি সংস্কৃত অবদানসংগ্রহ বা বিক্ষিপ্ত অবদানের সন্ধান পাওয়া যায় তিব্বতীয় ও চীনা অনুবাদে; যেমন, তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে 'কর্মশতক' নামক একটি সংস্কৃত অবদানগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

'অবদানশতক' ও অন্যান্য কতক মূল সংস্কৃত অবদানগ্রন্থ অবলম্বনে কতক পদ্যকাব্যও রচিত হইয়াছিল। 'কল্পদ্রুমাবদানমালা', 'রত্নাবদানমালা' ও 'অশোকাবদানমালা' অবদানসমূহের পদ্যরূপ। এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্রের (খৃঃ ১১শ শতক) রচিত 'অবদানকল্পলতা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থে এই মহাপণ্ডিত বহু আখ্যানকে পদ্যরূপ দান করিয়াছেন।

মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত কতক সংস্কৃত পুথিখণ্ডের নাম, লুডার্সের মতে,

১. সং (ক) J. S. Speyer, St. Petersburg, 1902-09,
(খ) P. L. Vaidya, Darbhanga, 1958.
২. সং (ক) E. B. Cowell and R. A. Neil, Cambridge, 1886,
(খ) P. L. Vaidya, Darbhanga, 1958.
৩. সং E. Senart, Paris, 1882-97.
৪. সং R. L. Mitra, Calcutta 1877.

'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালঙ্কৃতিকা'। তিনি মনে করেন, ইহা কুমারলাতরচিত। গ্রন্থটি পদ্যমিশ্রিত এবং নৈতিক আখ্যান উপাখ্যানের সংগ্রহ। কুমারজীব-কৃত চীনা অনুবাদে এই গ্রন্থেরই নাম 'সূত্রালঙ্কার' এবং অশ্বঘোষ-রচিত বলিয়া কথিত।

আর্যশূরের 'জাতকমালা'[১] বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা' গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য জাতকের আখ্যান। জাতক-বহির্ভূত কতক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। ইহা পদ্যমিশ্রিত গদ্যে রচিত। ইসিং বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে (খৃঃ ৭ম শতক) 'জাতকমালা' বৌদ্ধগণের অতি উপাদেয় গ্রন্থ ছিল। অজন্তার কতক চিত্রে 'জাতকমালা'র প্রভাব বিদ্যমান। আর্যশূরের একখানি চীনা অনুবাদ হয় ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে। এই সকল প্রমাণ হইতে তাঁহাকে খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের লেখক বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। আর্যশূরের ভাষা মার্জিত ও সহজবোধ্য এবং বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। তাঁহার ভাষায় স্বভাবতঃই পালির প্রভাব বিদ্যমান; কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিশুদ্ধ। গ্রন্থটিতে ছন্দনৈপুণ্যেরও পরিচয় আছে।

পদ্যরচনা

অবদানের পদ্যরূপ ছাড়াও উৎকৃষ্ট পদ্যকাব্য বৌদ্ধগণ সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পদ্যকাব্যের ইতিহাসে অশ্বঘোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। বস্তুতঃ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী কোন পদ্যকাব্যরচনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে রচিত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'[২] শুধু ভারতেই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও কাব্যরসিকগণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। চৈনিক পরিব্রজক ইসিং (খৃঃ ৭ম শতক) এর বিবরণ হইতে জানা যায়, এই কাব্য অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত। ইহার চীনা এবং তিব্বতীয় অনুবাদেও সর্গসংখ্যা অনুরূপ। কিন্তু, বর্তমান সংস্কৃত রূপে প্রথম ও চতুর্দশ সর্গের আংশিক এবং দ্বিতীয় হইতে ত্রয়োদশ সর্গ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত আছে। 'সৌন্দরনন্দ'[৩] অশ্বঘোষের অপর একখানি কাব্য। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বে বুদ্ধদেব কর্তৃক তাঁহাকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষাদান এই কাব্যের উপজীব্য বিষয়। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত। গণ্ডীর (Monastery gong) প্রশংসায় ঊনত্রিশটি শ্লোকে রচিত 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা'[৪] অশ্বঘোষ-রচিত। অশ্বঘোষকে

১. সং H. Kern, Harvard Oriental Series, 1891.
২. ইহার সংস্করণগুলির মধ্যে Johnston এর সংস্করণ সর্বাধিক পরিচিত।
৩. সং (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯১০,
(খ) Johnston, 1928, 1932.
৪. সং (ক) Holstein, St., Petersburg, 1913.
(খ) Johnston, Indian Antiquary, 1933, pp. 61-70.

সাধারণতঃ কনিষ্কের (খৃঃ প্রথম শতাব্দ) সমসাময়িক মনে করা হয়। অশ্বঘোষের রচনায় পরবর্তী যুগের রচনার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোন প্রয়াস দেখা যায় না। তাঁহার রচনা প্রসাদগুণযুক্ত। 'বুদ্ধচরিতে' জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির চিত্র জীবন্ত ও এই সকল দৃশ্য দর্শনে গৌতমের নির্বেদের বর্ণনা মর্মস্পর্শী।

'চিত্তশুদ্ধিপ্রকরণ' নামক একখানি বৌদ্ধনীতিমূলক সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থের অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে আছে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কতক আচার অনুষ্ঠানের ব্যঙ্গাত্মক নিন্দা। এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাস্নানে যদি মুক্তিলাভ হইত তাহা হইলে ধীবর ও মৎস্যগণের পক্ষে মোক্ষ সুলভ হইত। গ্রন্থটি আর্যদেবরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও, এ বিষয়ে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই।

শ্লোকাকারে রচিত 'মহাযানসূত্রালঙ্কার' নামক গ্রন্থটি কাহারও মতে অসঙ্গ-রচিত, কাহারও মতে মৈত্রেয়নাথ-প্রণীত। ইহাতে বোধি, বুদ্ধত্ব ও বুদ্ধের পারমিতা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অসঙ্গের জীবনকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে। মৈত্রেয়নাথ ছিলেন অসঙ্গের আচার্য।

পত্রের আকারে নৈতিক উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কতক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। কনিষ্ক নাকি মাতৃচেত নামক এক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। 'মহারাজকনিকলেখ' নামক পত্রে মাতৃচেত বার্ধক্যনিবন্ধন কনিষ্কের সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে রাজাকে বুদ্ধদেবের আদিষ্ট মার্গে জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে ৮৫টি শ্লোক আছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে, মাতৃচেত অশ্বঘোষেরই নামান্তর। ভিন্টারনিৎস্ মনে করেন, মাতৃচেত অশ্বঘোষের বয়োজ্যেষ্ঠ জনৈক পণ্ডিত ছিলেন। নাগার্জুনের 'সুহৃল্লেখ' কাব্যে কোন রাজার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মমত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার কতক শ্লোক 'ধর্ম্মপদে'র শ্লোকের অনুরূপ। যে রাজার উদ্দেশ্যে পত্রকাব্যটি লিখিত হইয়াছিল, তিনি সম্ভবতঃ সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী (খৃঃ ২য় শতক)। 'সুহৃল্লেখে'র মূল সংস্কৃত রূপ লুপ্ত। ইহার চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র আছে। নাগার্জুন সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লেখক এবং অশ্বঘোষের শিষ্য। চন্দ্রগোমিরচিত 'শিষ্যলেখধর্মকাব্যে' পত্রাকারে শিষ্যকে বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। চন্দ্রগোমীকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের লোক বলিয়া মনে করা হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বৌদ্ধকবি শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার'[১]

১. সং de la Valle'e Poussin, Calcutta, 1901 f.f.

একখানি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। হীনযানমতে আদর্শ সন্ন্যাসী না হইয়াও কিরূপে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়, তাহা এই গ্রন্থর উপজীব্য। এই কাব্যের এগারখানি টীকাই ইহার জনপ্রিয়তার সাক্ষী। কথিত আছে, শান্তিদেব ছিলেন রাজ-কুমার; তারাদেবীর অনুপ্রেরণায় তিনি রাজত্ব পরিত্যাগ করেন। তিব্বতীয় তেঙ্গুরের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন জাহোরের লোক। কাহারও কাহারও মতে, পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত সাভার নামক স্থানের তিব্বতীয় নাম জাহোর। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ইঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিতেন।

সংস্কৃত কোষকাব্যের ইতিহাসে বিদ্যাকরের নাম অবিস্মরণীয়। তাঁহার 'সুভাষিতরত্নকোষ'১ নামক গ্রন্থটি বর্তমান কোষকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীন-তম। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন কবির বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ১৭৩৯টি শ্লোক সংকলিত হইয়াছে। এই বিদ্যাকর ছিলেন বাংলা দেশের মালদহ জিলাধীন জগদ্দলবিহারনিবাসী বৌদ্ধ। তাঁহার জীবনকাল খৃষ্টীয় ১১শ—১২শ শতকে নিরূপিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ পুঁথির অভাবে এই গ্রন্থই F. W. Thomas এর সম্পাদনায় 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ স্তবস্তোত্রের সংখ্যাও কম নহে। মাতৃচেত নামক জনৈক কবির 'শতপঞ্চাশৎকস্তোত্র' ও 'চতুঃশতকস্তোত্রের অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই মাতৃচেত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তিব্বতীয় অনুবাদে নাগার্জুনের চারিটি স্তব (চতুঃস্তব) সংরক্ষিত আছে। 'সুপ্র-ভাতস্তোত্র' ও 'অষ্টমহাশ্রীচৈত্যস্তোত্র' হর্ষবর্ধনের নামাঙ্কিত। রাজা দেবপালের (খৃঃ ৯ম শতক) আশ্রিত বজ্রদত্ত 'লোকেশ্বরশতক' রচনা করিয়া-ছিলেন। বৌদ্ধ দেবী তারার উদ্দেশ্যে বহু স্তব স্তোত্র রচিত হইয়াছিল। এইরূপ স্তোত্রের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরী সর্বজ্ঞমিত্রের (খৃঃ ৮ম শতক) 'আর্যতারাদেবীস্রগ্ধরাস্তোত্র'। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর সময়ে (১২৪৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) সিংহলে গিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি 'ভক্তিশতক' নামক স্তোত্রে বুদ্ধের স্তুতিগান করেন।

নাট্যসাহিত্য

'শারিপুত্রপ্রকরণ' বা 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ' নামে অশ্বঘোষ-রচিত এক-খানি নাট্যগ্রন্থের অংশমাত্র মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধদেব কর্তৃক শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

পূর্বে যে চন্দ্রগোমীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার রচিত 'লোকানন্দ' নামক সংস্কৃত নাটকের তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়।

১. সং Kosambi and Gokhale, Harvard Oriental Series, 1957.

দর্শন

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ শুধু যে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধেই সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। হিন্দুদর্শনেও তাঁহাদের রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অনেক দার্শনিক গ্রন্থের মূল লুপ্ত। চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে ঐ সকল লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্থ শতকের বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোশ' নামে বৌদ্ধ-দর্শনের একখানি অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ৬০০ শ্লোকে তত্ত্ববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান ও মোক্ষতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে ইহার একটি ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। 'অভিধর্মকোশে'র অংশমাত্র সংস্কৃতরূপে সংরক্ষিত আছে। চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদে ইহার সম্পূর্ণরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' নামক গ্রন্থটি অশ্বঘোষ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাহারও কাহারও মতে, খৃষ্টীয় ৫ম শতকের অশ্বঘোষ নামধারী অপর কোন ব্যক্তি ইহার রচয়িতা। ইহাতে বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ ও মাধ্যমিক মতবাদের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা রহিয়াছে।

আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের বৈভাষিক মতাবলম্বী দিঙ্‌নাগ 'প্রমাণসমুচ্চয়' এবং অপর কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু, একমাত্র 'ন্যায়প্রবেশ' ছাড়া দিঙ্‌নাগের অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। অপর গ্রন্থগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে।

যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধান একখানি গ্রন্থ 'লঙ্কাবতার'। ইহার ঈদৃশ নামকরণের কারণ এই যে, ইহা এইরূপে রচিত হইয়াছে যেন বুদ্ধদেব স্বয়ং রাবণকে বৌদ্ধদর্শনে শিক্ষা দিতেছেন। ইহা অংশতঃ পদ্যে রচিত, অংশতঃ গাথামিশ্রিত গদ্যে রচিত। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে টানা যায়।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রধান সমর্থক নাগার্জুনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইঁহার 'মূলমধ্যমকারিকা' শুধু বৌদ্ধদর্শনে নহে, সংস্কৃতে রচিত সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অতিশয় মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কয়েকটি টীকার মধ্যে চন্দ্রকীর্তি-রচিত টীকা প্রসিদ্ধ। তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে জানা যায় যে, নাগার্জুন নিজেও এই গ্রন্থের 'অকুতোভয়া' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে 'শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' নাগার্জুন-কৃত। নাগার্জুন-রচিত অপর কতক সংস্কৃত

গ্রন্থের নাম 'যুক্তিষষ্টিকা', 'শূন্যতা-সপ্ততি', 'প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়', 'মহাযানবিংশক'। 'ধর্মসংগ্রহ' নামক গ্রন্থটি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দকোষ। ইহা নাগার্জুনের লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

এই সম্প্রদায়ের অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চতুঃশতক' (বা,—শতিকা) অথবা 'শতশাস্ত্র'। ইহা নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব-রচিত। এই গ্রন্থে আর্যদেব বৌদ্ধমত সমর্থন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের কতক আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। চৈনিক ত্রিপিটকে আর্যদেবের নামাঙ্কিত দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থের বোধিরুচি (খৃঃ ষষ্ঠ শতক) কৃত অনুবাদ আছে। এই দুইটি গ্রন্থ 'লঙ্কাবতারে'র কোন কোন অংশের টীকাস্বরূপ। 'হস্তাবল-প্রকরণ' বা 'মুষ্টিপ্রকরণ' নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থটিও আর্যদেবের নামের সহিত যুক্ত।

পদ্যরচনাপ্রসঙ্গে যে শান্তিদেবের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার 'শিক্ষা-সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ সংক্ষেপে অথচ সযত্নে আলোচনা করিয়াছেন। তারনাথের মতে, 'সূত্রসমুচ্চয়' নামক একখানি গ্রন্থও শান্তিদেব-রচিত।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বাঙালী শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধ ও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 'পঞ্জিকা' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন বাঙালী কমলশীল। তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে জানা যায় যে, শান্তরক্ষিত 'মধ্যমকালঙ্কারকারিকা' নামক গ্রন্থ এবং উহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী ধর্মকীর্তি দিঙ্‌নাগের মতবাদের ব্যাখ্যাতৃরূপে প্রসিদ্ধ। ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু' ন্যায়শাস্ত্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ। ইহার উপর ধর্মোত্তরের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা আছে।

বিক্রমশীলার রত্নকীর্তি খৃঃ একাদশ শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি ছিলেন বৌদ্ধদর্শনে মহাপণ্ডিত। 'রত্নকীর্তিনিবন্ধাবলী'১ নামক গ্রন্থে তদ্রচিত বা তাঁহার রচনা বলিয়া অনুমিত প্রবন্ধগুলি বৌদ্ধ ন্যায়-দর্শন বিষয়ক। রত্নকীর্তি ছিলেন জ্ঞানশ্রীমিত্রের শিষ্য। গৌড়ীয় জ্ঞানশ্রীমিত্র সম্বন্ধে তিব্বতীয় গ্রন্থাদিতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই জ্ঞানশ্রীমিত্রের রচিত বৌদ্ধদর্শনবিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান২।

অভিধান

বৌদ্ধশাস্ত্রাদির বোধ-সৌকর্যের উদ্দেশ্যে কতক অভিধান রচিত হইয়া-

১. সং অনন্তলাল ঠাকুর, পাটনা, ১৯৫৭
২. দ্রঃ—রত্নকীর্তিনিবন্ধাবলী, Introduction, p. 20.

ছিল। এই অভিধানগুলির রচনাপদ্ধতি বৈদিক নিঘণ্টুর অনুরূপ। এইরূপ অভিধানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 'মহাব্যুৎপত্তি'১। ইহা ২৮৪ অধ্যায়ে রচিত; ইহাতে প্রায় ৯০০০ শব্দ আছে। এই অভিধানে বুদ্ধের নামাবলী এবং বৌদ্ধগণের পারিভাষিক শব্দ ছাড়াও পশু, বৃক্ষ ও ব্যাধি প্রভৃতির নাম সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রতিশব্দ, ক্রিয়াপদ, বাক্যাংশ, এমন কি কতক সম্পূর্ণ বাক্যেরও সংগ্রহ আছে।

অনেক সাধারণ সংস্কৃত অভিধানও বৌদ্ধগণ রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিধান 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র রচয়িতা অমরসিংহ ছিলেন বৌদ্ধ। কিম্বদন্তী অনুসারে ইনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একরত্ন। বিক্রমাদিত্য নাম বা উপাধিধারী বহু রাজাই ভারতবর্ষে ছিলেন এবং নবরত্নের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সুতরাং, অমরসিংহের জীবৎকাল সম্বন্ধে সংশয়াতীত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 'অমরকোষ' শ্লোকাকারে রচিত এবং স্বরাদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড—এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। গুণরাত নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই অভিধানের চীনা অনুবাদ করেন। 'অমবকোষে'র টীকাকার ক্ষীরস্বামীর মতে, অমরসিংহ চন্দ্র বা চন্দ্রগোমীর পূর্ববর্তী। চন্দ্রগোমীর কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং, অমরসিংহের নিম্নতর কালসীমা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মনে করা যাইতে পারে।

অমরসিংহের পরেই পুরুষোত্তমদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি নিম্নলিখিত অভিধানগুলি রচনা করিয়াছিলেন—'ত্রিকাণ্ডশেষ'২, 'হারাবলী'৩, 'বর্ণদেশনা৪' ও 'দ্বিরূপকোষ'৫। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' শ্লোকাকারে তিন অধ্যায়ে রচিত এবং 'নামলিঙ্গানুশাসনে'র পরিশিষ্টস্বরূপ। 'হারাবলী' ২৭৮টি শ্লোকে রচিত। ইহাতে সাধারণতঃ অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 'বর্ণদেশনা' গদ্যে রচিত; ইহাতে বিভিন্নরূপ বর্ণবিন্যাসবিশিষ্ট শব্দের সংগ্রহ আছে। গৌড়ীয় লিপিরূপের জন্য যে সকল শব্দের বানানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে, সেইজাতীয় অনেক শব্দের আলোচনাও ইহাতে আছে। 'দ্বিরূপকোষ' ৭৫টি শ্লোকে রচিত। ইহাতে এমন শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে যাহাদের বর্ণবিন্যাস-

১. সং J. P. Minayeff, St. Petersburg (দ্বিতীয় সংস্করণ), Bibliotheca Buddhica, XIII, 1911.

২. টীকাসহ প্রকাশিত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই।

৩. 'অভিধানসংগ্রহে'ব প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, বোম্বাই, ১৮৮৯।

৪. India Office Catalogue, p. 295.

৫. উক্ত 'অভিধানসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত।

পদ্ধতি দ্বিবিধ। উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া 'দ্বিরূপকোষ'১ নামক একটি অভিধানও পুরুষোত্তমের নামাঙ্কিত। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি'২ নামক টীকার প্রণেতাস্বরূপে পুরুষোত্তম অধিকতর খ্যাতিমান্। পুরুষোত্তমকে বাঙ্গালী মনে করিবার কয়েকটি কারণ আছে। 'ভাষাবৃত্তি'র টীকাকার সৃষ্টিধরের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণসেনের আদেশে এই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সর্বানন্দ 'অমরকোষে'র টীকায় (১১৫৯ খৃঃ) পুরুষোত্তমের উল্লেখ করিয়াছেন। এই টীকায় বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই; ইহা বাঙ্গালী লেখকের বৈশিষ্ট্য। পাণিনির ৬।২।১১০ সংখ্যক সূত্রের টীকায় 'পদ্মাবতী' নদীর উল্লেখ আছে; ইহা বাংলাদেশের পদ্মানদী বলিয়া মনে হয়। 'ভাষাবৃত্তির' প্রারম্ভিক শ্লোকে পুরুষোত্তম বুদ্ধদেবের বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন উদাহরণে তিনি বৌদ্ধদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় তিনি বৌদ্ধ ছিলেন।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও 'গণবৃত্তি' ও 'পরিভাষাবৃত্তি' নামক ব্যাকরণগ্রন্থ, 'সুভাষিতমুক্তাবলী' নামক কোষকাব্য এবং 'বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা'খ্য স্তোত্র গ্রন্থ পুরুষোত্তমের নামে প্রচলিত। কিন্তু, এই পুরুষোত্তম ও 'ভাষা-বৃত্তি'কার পুরুষোত্তম অভিন্ন কিনা সেই সম্বন্ধে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। 'ললিতবৃত্তি' ও 'জ্ঞাপকসমুচ্চয়' নামক দুইটি গ্রন্থও পুরুষোত্তম-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ব্যাকরণ

অভিধান প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম-রচিত ব্যাকরণগ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কয়েকজন বাঙালী বা বাঙালী বলিয়া অনুমিত বৌদ্ধ বৈয়াকরণ ও তাঁহাদের গ্রন্থের আলোচনা সংক্ষেপে করিব।

বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি বাঙ্গালী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আলঙ্কারিক ভামহ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন; ভামহ খৃষ্টীয় ৭ম-৮ম শতকের মধ্যবর্তী কালের লেখক। সুতরাং, জিনেন্দ্রের কালের নিম্নতর সীমারেখা সম্ভবতঃ ৭ম শতকের মধ্যভাগ। তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন, 'জিনেন্দ্র' নামই তাহার সাক্ষী। তাহা ছাড়া, তিনি 'বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন পুথিতে তাঁহার 'স্থবিররাজেন্দ্র' আখ্যাও আছে।

জিনেন্দ্র 'কাশিকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'৩ বা ন্যাস।

১. ঐ।
২. সং শ্রীশ চক্রবর্তী, রাজসাহী, ১৯১৮।
৩. সং শ্রীশ চক্রবর্তী, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯১৩।

জিনেন্দ্রের গ্রন্থের উপরে টীকা রচনা করেন মৈত্রেয়রক্ষিত; এই টীকার নাম 'তন্ত্রপ্রদীপ'। 'তন্ত্রপ্রদীপে'র কোন সম্পূর্ণ পুঁথি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। রক্ষিতের অপর গ্রন্থের নাম 'ধাতুপ্রদীপ'১; ইহা পাণিনির ধাতু-পাঠ অবলম্বনে রচিত। 'ধাতুপ্রদীপটীকা' নামে ইহার একটি টীকা আছে।

সায়ণাচার্য (খৃঃ ১৪শ শতক) 'মাধবীয়ধাতুবৃত্তি'তে মৈত্রেয়রক্ষিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পুরুষোত্তমদেব (খৃঃ ১২শ শতক) 'ললিতবৃত্তি' ও 'জ্ঞাপকসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে মৈত্রেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মৈত্রেয় স্বয়ং কজ্জট বা কৈয়টের (খৃঃ ১১শ শতকের পূর্বভাগ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে রক্ষিতকে ১১শ শতকেব মধ্যভাগ হইতে ১২শ শতকের মধ্যভাগেব অন্তবর্তী কালের লোক বলিয়া মনে করা যায়।

রক্ষিতের গ্রন্থের উপলভ্যমান সকল পুথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 'তন্ত্র-প্রদীপে'র একখানি পুঁথিও বাংলাদেশের বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে মনে করা যায়, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। 'ধাতুপ্রদীপে'র প্রারম্ভে তিনি মঞ্জুঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

চন্দ্রগোমীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাব রচিত 'চান্দ্রব্যাকরণ'২ প্রখ্যাত। 'অষ্টাধ্যায়ী'র সংক্ষিপ্তী-করণই সম্ভবতঃ এই ব্যাকরণ রচনার মূল উদ্দেশ্য। পাণিনির ব্যাকরণের আট অধ্যায়ের স্থলে এই ব্যাকরণে আছে ছয়টি; পাণিনির প্রায় ৪০০০ সূত্রের পরিবর্তে ইহার সূত্রসংখ্যা ৩১০০। 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক প্রকরণ ও স্বরপ্রক্রিয়া চন্দ্রগোমী বর্জন করিয়াছেন। 'চান্দ্রব্যাকরণ'কে 'অসংজ্ঞক' আখ্যা দেওয়া হয; ইহার কারণ সম্ভবতঃ দ্বিবিধ। 'অষ্টাধ্যায়ী'র ন্যায় সংজ্ঞাবিধায়ক পৃথক্ সূত্র ইহাতে নাই। পাণিনি-প্রযুক্ত 'সংজ্ঞা' শব্দের পরিবর্তে চন্দ্র 'নামন্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিব্বতে এই ব্যাকরণ অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। কাশ্যপ নামে জনৈক বৌদ্ধ এই ব্যাকরণের 'বালাববোধ' নামক একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন।

তিব্বতীয় ঐতিহ্যে চন্দ্রগোমীর জীবনী ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ইঁহার জন্ম হয় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি কোন কারণে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে শেষ জীবন অতি-বাহিত করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিব্বতীয় তেঞ্জুরে ইঁহাকে দ্বৈপ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রগোমী নাকি নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থির-

১. সং ঐ, ১৯১৯।
২. সং B. Liebich, Leipzig, 1902.

মতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং কালক্রমে নালন্দার আচার্যপদ অলঙ্কৃত করেন।

চন্দ্রগোমীর কাল অনুমানের বিষয়। ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়ে' এবং কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে চন্দ্রাচার্য নামক এক বৈয়াকরণের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে, চন্দ্রাচার্য ও চন্দ্রগোমী অভিন্ন ব্যক্তি। বামন-জয়াদিত্যের 'কাশিকাবৃত্তি'তে চান্দ্রব্যাকরণের ৩৫টি সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; অবশ্য চন্দ্রগোমীর নামোল্লেখ নাই। এই সকল প্রমাণ হইতে চন্দ্রগোমীর জীবনকালের নিম্নতর সীমারেখা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে স্থাপিত হইতে পারে। 'চান্দ্রব্যাকরণে'র একটি সূত্রের বৃত্তিতে গুপ্তরাজকর্তৃক হূণবিজয়ের উল্লেখ হইতে কেহ কেহ মনে করেন ইহা চন্দ্রগোমীর সমকালীন ঘটনা; সুতরাং তাঁহার জীবনকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে।

'মনোহরকল্প', 'আর্যতারাদেবীস্তোত্রমুক্তিকামাল' প্রভৃতি স্তোত্রগ্রন্থ এবং 'ন্যায়সিদ্ধ্যালোক' নামক তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ চন্দ্রগোমীর নামাঙ্কিত। বৌদ্ধ ঐতিহ্য হইতে জানা যায় যে, ইনি বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযান সাধনাবিষয়ক ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী এক ব্যক্তি কিনা ইহা পণ্ডিতগণের বিতর্কের বিষয়।

ব্যাকরণপ্রসঙ্গে শরণের নাম উল্লেখযোগ্য। 'দুর্ঘটবৃত্তি'[১] নামক গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক প্রয়োগের পাণিনি-সম্মত শুদ্ধিবিচার এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক কোষকাব্যে শরণের নামাঙ্কিত ২০টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। জয়দেবের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শরণ ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি (খৃঃ দ্বাদশ শতক)। জয়দেব ইঁহার রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ[২]। শরণ বা শরণদেব ছিলেন বৌদ্ধ।

তন্ত্র

বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ। পালপূর্ব যুগে কতক বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইয়া থাকিলেও পালযুগেই এই জাতীয় বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় এই যে, বৌদ্ধতন্ত্রের অধিকাংশ মূল তন্ত্রই লুপ্ত। তিব্বতীয় অনুবাদ না থাকিলে আমরা এই মূল্যবান্ গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতাম

১. Trivandrum Sanskrit Series-এ প্রকাশিত, ১৯০৯।
২. "শরণসংজ্ঞঃ কবিঃ দুরূহদ্রুতেঃ শ্লাঘ্যো দুর্বিচার-পদপদার্থজ্ঞানাৎ প্রশস্যঃ" -'গীতগোবিন্দে'র রসিকপ্রিয়াটীকা।

না এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, একটা গৌরবময় অধ্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকিত।

বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অনেকাংশে শৈবতন্ত্রদ্বারা প্রভাবিত। এই গ্রন্থগুলিকে প্রধান চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) ক্রিয়াতন্ত্র—মন্দির ও দেবতাদির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিহিত অনুষ্ঠানাদির বিবরণ,
(২) যোগতন্ত্র—যোগসাধনপদ্ধতির নির্দেশ,
(৩) চর্যাতন্ত্র—তান্ত্রিক আচারাদির বর্ণনা,
(৪) অনুত্তরযোগ—উচ্চতর রহস্যময় তত্ত্বাদির বিশ্লেষণ।

বৌদ্ধতন্ত্রগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—'আদিকর্মপ্রদীপ', 'অষ্টমী-ব্রতবিধান', 'তথাগতগুহ্যক' বা 'গুহ্যসমাজ', 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প', 'চণ্ডমহা-রোষণতন্ত্র', 'শ্রীচক্রসম্ভারতন্ত্র', 'মহাকালতন্ত্র'।

বৌদ্ধতন্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থপ্রণেতা প্রধান কয়েকজন বাঙালী ও তদ্রচিত গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

[গ্রন্থকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক]

গ্রন্থকার	কাল	গ্রন্থ
অতীশ দীপাঙ্কর	৯৮০-১০৫৩ খৃষ্টাব্দ	বোধিমার্গপঞ্জিকা, একবীরসাধন, প্রজ্ঞাপারমিতাপিণ্ডার্থপ্রদীপ, রত্নকরণ্ডোদ্ঘাটনাম মধ্যমকোপদেশ, লোকাতীতসপ্তাঙ্গবিধি। তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, দুই শত বৌদ্ধগ্রন্থের রচয়িতা।
অভয়াকরগুপ্ত	খৃষ্টীয় ১১শ শতক	মর্মকৌমুদী, বোধিপদ্ধতি, শ্রীমঞ্জুবজ্রাদিক্রমাভিসময়সমুচ্চয়নিষ্পন্ন (যোগাবলীনাম), বজ্রযানাপত্তিমঞ্জরী, আম্নায়মঞ্জরী। তেঙ্গুরের সাক্ষ্য অনুসারে, ইনি কুড়িখানি বজ্রযানী গ্রন্থের প্রণেতা।

গ্রন্থকার	কাল	গ্রন্থ
কুমারবজ্র	খৃষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের মধ্যবর্তী	চক্রসম্বরমণ্ডনবিধি-তত্ত্বাবতার
জেতারি (অতীশের গুরু)	রাজা মহীপালের সমকালীন	তিনখানি ন্যায়গ্রন্থ ও এগারখানি বজ্রযানী সাধন গ্রন্থের প্রণেতা।
জ্ঞানশ্রীমিত্র	দীপঙ্করের সমসাময়িক	কার্যকারণভাবসিদ্ধি (বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ)
দানশীল	?	পুস্তকপাঠোপায়। অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় সংস্কৃত-তিব্বতীয় অভিধান প্রণয়ন।
দিবাকরচন্দ্র	খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্বার্ধ	হেরুকসাধন ও অন্যান্য গ্রন্থ।
প্রজ্ঞাবর্মা	?	তন্ত্রশাস্ত্রের টীকা—বিশেষতঃ স্বতটীকা ও দেবাতিশয়স্তোত্রটীকা। 'উদানবর্গে'র উপরে ধর্মত্রাতের অসম্পূর্ণ টীকা ইনি সমাপ্ত করেন।
বিভূতিচন্দ্র	?	তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুসারে টীকাটিপ্পনী ও কতক মূল গ্রন্থের রচয়িতা।
শীলভদ্র	খৃঃ সপ্তম শতক	আর্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান।

শান্তিদেব ও শান্তরক্ষিতের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র দোহাবলীর রচয়িতা হিসাবে যে সকল সিদ্ধাচার্যগণের নাম বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—এই তথ্য জানা যায় তিব্বতীয়-তেঙ্গুরের সাক্ষ্য হইতে। কুক্কুরিপাদের নামাঙ্কিত ছয়টি তন্ত্রগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। শবরির নামের সহিত যুক্ত দশখানি বজ্রযানী গ্রন্থ আছে। 'অভিসময়বিভঙ্গ' ছাড়া লুই-পা আরও তিনখানি বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' ব্যতীত অনেক সংস্কৃত

তন্ত্রগ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'অবতারিত' বলা হইয়াছে। 'বায়ুতত্ত্বভাবনোপদেশ' গোরক্ষ-রচিত। জালন্ধরীপাদের নামাঙ্কিত চারিটি বজ্রযানী গ্রন্থের অন্যতম সরোরুহবজ্র-কৃত 'হেবজ্রসাধনে'র 'শুদ্ধিবজ্রপ্রদীপ' নামক টীকা। এতদ্‌ভিন্ন বিরূপ, তিলোপা, সরহ প্রভৃতির রচিত বলিয়া অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ তেঙ্গুরে আছে।

বিবিধ

'বজ্রসূচী' ব্রাহ্মণবর্ণ সম্বন্ধে বিতর্কমূলক গ্রন্থ। ইহা অশ্বঘোষ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় দশম শতকে কৃত ইহার চীনা অনুবাদে ইহাকে ধর্মকীর্তি-রচিত বলা হইয়াছে।

অর্যচন্দ্রের 'মৈত্রেয়ব্যাকরণ' গ্রন্থটির সঙ্গে ব্যাকরণের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে গৌতমবুদ্ধ ও শারিপুত্রের (মতান্তরে আনন্দের) মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে বুদ্ধমৈত্রেয়ের জন্ম, রূপ ও তাঁহার অধীনে সুখশান্তির ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের একখানিমাত্র খণ্ডিত সংস্কৃত পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীনা, তিব্বতীয় ও মধ্য এশিয়ার নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বৌদ্ধগণের দানের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ পর্যন্ত করা গেল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, সর্বপ্রকার সাহিত্যেই তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যকৃতিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের বিশাল প্রাঙ্গণে অশ্বঘোষ পুরোবর্তী হইয়া বিরাজমান। তাঁহার পূর্ববর্তী কোন পণ্ডিতের কাব্য বা নাটকের নিদর্শন আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। অশ্বঘোষের পূর্বে কাব্য নাটক রচিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। 'সুভাষিতরত্নকোষ', 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি কোষকাব্যে পাণিনির (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক) নামাঙ্কিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, পাণিনি 'পাতালবিজয়' ও 'জাম্ববতীবিজয়' নামে দুইটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সকল কাব্য অশ্বঘোষের কাল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল কিনা জানা নাই। এইগুলির সঙ্গে অশ্বঘোষের পরিচয় থাকিলেও তিনি বিষয়বস্তুর নির্বাচনে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 'রামায়ণে'র রচনাশৈলী অশ্বঘোষকে প্রভাবিত করিয়া থাকিলেও বুদ্ধদেবের জীবনচরিত অবলম্বনে তিনি মহাকাব্য রচনা করিয়া গতানুগতিক কবিকৃতিকে অনুসরণ করেন নাই। তৎপূর্ববর্তী উক্ত যে দুইখানি কাব্যের নাম ও সামান্য অংশমাত্র পওয়া যায়, উহাদের বিষয়বস্তু কাল্পনিক ও আখ্যানমূলক। নাটকের ক্ষেত্রেও অশ্বঘোষ অনেকাংশে

পথিকৃৎ। অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী কোন নাট্যকারের রচনা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামে যে দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান 'মহাভাষ্যে' (খৃঃ পূঃ ২য় শতক) পাওয়া যায়, উহারা কি জাতীয় রচনা ছিল জানিবার কোন উপায় নাই। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, উহাদের উপজীব্য কৃষ্ণ-বিষ্ণুর উপাখ্যান। এক্ষেত্রেও অশ্বঘোষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'শারিপুত্রপ্রকরণে' তিনি প্রকৃত ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিক্ষায় স্বর্গ বা দেবদেবীর স্থান নাই। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গে' শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞার উন্নতিসাধনই, তাঁহার মতে, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই কারণেই বোধ হয় বৌদ্ধ অশ্বঘোষ বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবনচরিত ও উপদেশাবলী অবলম্বন করিয়া কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধগণের চিন্তাধারা ও গ্রন্থাদি হিন্দুদার্শনিকগণের প্রচলিত বিচারপদ্ধতিকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যদি গতানুগতিক হিন্দুদর্শনকে নির্বিচারে মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে হিন্দুদর্শনের বিচার বিশ্লেষণ এত নিখুঁত হইত না। এক শঙ্করাচার্যই বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিতে বহু নূতন যুক্তিতর্কের ও দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করিয়াছেন। এই দিক্ হইতে লক্ষ্য করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুদর্শন বৌদ্ধদর্শনের দ্বারা অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

পত্রের আকারে সংক্ষিপ্ত রূপে যে ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা যায়, ইহার প্রবর্তক বৌদ্ধ পণ্ডিত। এই জাতীয় একখানি গ্রন্থও হিন্দুগণের সংস্কৃত সাহিত্যে মিলে না।

কোষকাব্যের ইতিহাসে দেখি বৌদ্ধ বিদ্যাকরই এই জাতীয় গ্রন্থের সর্বপ্রথম সংকলয়িতা। তৎপূর্ববর্তী কোন কোষকাব্যকারের সন্ধান যদি কোন কালে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে বিদ্যাকরের নাম চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে এবং এ ক্ষেত্রে চির-উড্ডীন পতাকা বৌদ্ধগণের গৌরব ঘোষণা করিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বৌদ্ধগণের দান অসামান্য। অধিকাংশ স্থলে শৈবতন্ত্রদ্বারা প্রভাবিত হইলেও স্বীয় মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে বিশাল তন্ত্রশাস্ত্রের রচনায় তাঁহাদের পাণ্ডিত্য নগণ্য নহে। এ ক্ষেত্রে বাঙালী বৌদ্ধগণের কীর্তিই সর্বাধিক উজ্জ্বল। সুদূর চীন ও তিব্বতের সহিত বঙ্গের তথা ভারতের যোগসূত্র ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ইতিহাসে বৌদ্ধতন্ত্র ও দর্শন অমূল্য।

মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য

এই অধ্যায়ের নামকরণটি পাঠকের মনে বিরোধাভাসের সৃষ্টি করিতে পারে। উত্তরমেরুর সহিত দক্ষিণমেরুর যে সম্বন্ধ, মুসলমান জাতির সহিত সংস্কৃত সাহিত্যেরও তদ্বৎ—এইরূপ ধারণাই স্বাভাবিক। কিন্তু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রকৃত সাহিত্য-রসিক ও বিদ্যানুরাগী মুসলমানগণ হিন্দুর দেবভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না।

ভারতের এবং ভারতীয় প্রদেশবিশেষের অনেক বিদ্যোৎসাহী মুসলমান শাসকই সংস্কৃত সাহিত্যের অকুণ্ঠ পোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শুধু পোষকতা নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা করিয়া বৈদগ্ধ্য ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

মুসলমানরচিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে আব্দুর রহমানের 'সন্দেশরাসক' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রহমান ছিলেন তন্তুবায়; তাঁহার জন্মকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন সময়ে। গ্রন্থটি 'মেঘদূতে'র অনুকরণে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। বিজয়নগরের বিরহিণী কোন নারীকর্তৃক প্রবাসী প্রেমিকের নিকট প্রেরিত সংবাদ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

আহম্মদ খাঁ লোদীর পুত্র লাদ খাঁর মনোরঞ্জন-কল্পে কল্যাণমল্ল নামক জনৈক ব্যক্তি 'অনঙ্গরঙ্গ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শের শাহ্ ও নিজাম শাহ্-এর পোষকতায় গণপতিপুত্র ভানুকর বা ভানুদত্ত 'গীতগৌরীশ', 'রসমঞ্জরী', 'রসতরঙ্গিণী', 'কুমারভার্গবীয়', 'অলংকারতিলক' ও 'শৃঙ্গারদীপিকা' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করেন বলিয়া জানা যায়। এইগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকাশিত হইয়াছে। ভানুকর যে নগণ্য কবি ছিলেন না, কোষকাব্যসমূহে তদ্রচিত শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতিই তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের লেখক।

ভারতের মুসলমান শাসকগণের মধ্যে সম্রাট আক্বরের রাজত্বকালেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক গ্রন্থ বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আক্বরের সাম্প্রদায়িকভাবমুক্ত উদার রাজনীতিই ইহার কারণ। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরে সংকলিত কোষ-কাব্য-সমূহে আকবরীয় কালিদাস নামক জনৈক কবির বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত নাম গোবিন্দভট্ট। সম্রাট্ আক্বর নাকি তাঁহাকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করেন। এই কবিরচিত 'রামচন্দ্রযশঃ-প্রশস্তি' নামক কাব্যগ্রন্থটি বিদ্যমান। রেওয়ার বঘেল রামচন্দ্রের স্তুতিকীর্তন এই গ্রন্থ-খানির বিষয়বস্তু। তাঁহারই উৎসাহে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'অথর্ববেদ',

'লীলাবতী', 'রাজতরঙ্গিণী' ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত্র হয়। এই সম্রাটের সভাস্থ শেখভবন 'অল্লোপনিষৎ' নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিয়াছেন আক্‌বর; সম্রাটের স্তুতি ও করুণাভিক্ষা ইহার বিষয়বস্তু। 'স্মৃতিসুধাকর' নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে সুরত্রাণপঞ্চকে লেখক শঙ্কর এই সম্রাটেরই স্তুতি-গান করিয়াছেন। আক্‌বরের সাহায্যপুষ্ট দামোদর-পুত্র গৌরীশ 'বিবাহ-প্রদীপ' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'জীবচ্ছ্রাদ্ধপ্রয়োগ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা নারায়ণ ভট্টকে আকবর 'জগদ্‌গুরু' উপাধিমণ্ডিত করেন।

'রাগমালা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল (খৃঃ ১৫৭৬ অব্দ) ফারুকী বংশের বুরহান খাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন।

মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে কয়জন হিন্দু পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জগন্নাথ অগ্রগণ্য। স্বরচিত 'আসফবিলাসে'র প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, দিল্লীশ্বর শাহ্‌জাহান তাঁহাকে 'পণ্ডিতরাজ' আখ্যা প্রদান করেন। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর প্রতি কবির শ্রদ্ধা ইহাতে প্রকট হইয়াছে। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—এই প্রসিদ্ধ পংক্তিটি শাহ্‌জাহানের উদ্দেশ্যে জগন্নাথ-রচিত বলিয়া কথিত আছে। জগন্নাথের রচিত 'রস-গঙ্গাধর' সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ। তৎপ্রণীত 'ভামিনী-বিলাস' বা 'পণ্ডিতরাজশতক' 'রসগঙ্গাধরে' আলোচিত অলঙ্কারসমূহের চমৎকার উদাহরণ শ্লোকে রচিত। 'ভামিনীবিলাসে'র বহু শ্লোক কোষ-কাব্যসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পণ্ডিতকুলতিলক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের আদি ও মধ্য ভাগে স্বীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন। জগন্নাথের পিতার নাম পেরুভট্ট বা পেরমভট্ট এবং মাতা ছিলেন লক্ষ্মী; ইঁহার বাস ছিল গোদাবরী জিলার একটি গ্রামে। ইনি ছিলেন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি ইস্‌লামধর্ম বিষয়ক এক বিতর্কে কোন কাজীকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন। লবঙ্গী নামক এক মুসলমান-কন্যার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তিনি নাকি তাহার পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ এই বিবাহের পরে তাঁহার একটি পুত্রলাভ হয় এবং এই পুত্রের মৃত্যুহেতুই তিনি 'রসগঙ্গাধরে'র এক শ্লোকে শোকপ্রকাশ করেন। জগন্নাথ-রচিত্র অন্যান্য গ্রন্থ নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

(১) অমৃতলহরী—যমুনা নদীর স্তব।

(২) চিত্রমীমাংসাখণ্ডন—অপ্যয়দীক্ষিতের 'চিত্রমীমাংসা' নামক গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) গঙ্গালহরী বা পীযূষলহরী ও গঙ্গামৃতলহরী।

(৪) জগদাভরণ—উদয়পুরের রাণা জগৎসিংহের প্রশস্তি।

(৫) বিষ্ণুলহরী বা করুণালহরী।
(৬) কাব্যপ্রকাশটীকা।
(৭) লক্ষ্মীলহরী।
(৮) মনোরমাকুচমর্দন বা প্রৌঢ়মনোরমা—ইহা 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপরে ভট্টোজি দীক্ষিতরচিত 'প্রৌঢ়মনোরমা' নামক টীকার তীব্র সমালোচনা।
(৯) সুধালহরী—সূর্যোদয়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা।
(১০) যমুনাবর্ণনা (গদ্যরচনা)।

'পদ্যবেণী' নামক গ্রন্থে হরিনারায়ণমিশ্ররচিত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। ইহাদের একটিতে কবি শাহ্‌জাহানের প্রশস্তিকীর্তন করিয়াছেন। 'পদ্যামৃততরঙ্গিণী'র ২০০—২০১ সংখ্যক শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বংশীধর মিশ্র শাহ্‌জাহানের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা শুকো খৃঃ ১৬৫৫ অব্দে 'সমুদ্রসঙ্গম' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বেদান্তদর্শন ও সুফীদর্শনের তুলনামূলক অলোচনা করা হইয়াছে। কাশীধামের নৃসিংহ বা ব্রহ্মেন্দ্র সরস্বতী নামে জনৈক পণ্ডিতের নিকট লিখিত এক পত্রে দারা শুকো সরস্বতীর একটি প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন; প্রশস্তিটি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত।

ঔরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তার মনস্তুষ্টির জন্য চতুর্ভুজ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে 'রসকল্পদ্রুম' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে চতুর্ভুজ শায়েস্তা খাঁ রচিত ছয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৭২১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীপতি 'লিপিমালিকা' রচনা করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অধিকাংশ ইহাতে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে আক্‌বর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান ও ঔরঙ্গজেবের অনেক উল্লেখ ও বহু আরবী, ফার্সী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'অবদুল্লাহ্‌চরিত' নামক কাব্যে লক্ষ্মীপতি মহম্মদ শাহ্-এর বিরুদ্ধে তদীয় মন্ত্রী আব্‌দুল্লাহ্‌র অভিযান এবং মহম্মদ শাহ্ কর্তৃক তাঁহার পুনর্নিয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটি একাধারে কাব্য ও ইতিহাস; এই হিসাবে ইহার মূল্য নগণ্য নহে।

উদয়রাজের 'রাজবিনোদ' গ্রন্থের বিষয়বস্তু গুজরাটের এক সুলতানের প্রশস্তি।

রসিক মুসলমানগণের অনুরাগ যে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যেই সীমায়িত ছিল, তাহা নহে। হিন্দুগণের দেবদেবীও তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। সংস্কৃত স্তোত্রসাহিত্যে দরাফ খাঁ রচিত গঙ্গাস্তব সুবিদিত। ইহা ছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতিও তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল। নবাব খাঁ খানান রচিত 'খেটকৌতুক' জ্যোতিষগ্রন্থ; মানবজীবনে গ্রহাদির

প্রভাব ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু ফারসী শব্দের প্রয়োগ আছে। 'সঙ্গীতমালিকা' নামক গ্রন্থ মহম্মদ শাহ্‌এর রচনা।

শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নহে, সংস্কৃত ভাষাও উদার মুসলমানগণের পোষকতা-প্রসাদে বঞ্চিত হয় নাই। মুসলমান শাসকগণের আমলে কাশ্মীরে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। বিশিষ্ট মুসলমানগণের স্মৃতিস্তম্ভে সংস্কৃত প্রশস্তিও এই ভাষার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন। কাশ্মীরের বাহাউদ্দিন সাহেবের (১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ) সমাধিতে এইরূপ একটি প্রশস্তি আছে।

মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় অপর অনেক কবি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অমৃতদত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন শাহাবুদ্দিনের সভাকবি। ইঁহার রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু, ইঁহার নামাঙ্কিত কতক শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিতাবলী' ও 'সূক্তিমুক্তাবলী' প্রভৃতি কোষকাব্যে সংগৃহীত আছে।

বহির্ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব[১]

সুপ্রসিদ্ধ ভারতবিজ্ঞানী Basham বলেন[২]—The sages who meditated in the jungles of the Ganges Valley six hundred years or more before Christ are still forces in the world. ভারতীয় মনীষিগণের অমূল্য জ্ঞানভান্ডার সংস্কৃত সাহিত্য যুগে যুগে ভারতের বাহিরে সুদূর প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বহন করিয়া নিয়াছিল। ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইয়াছিল এবং বহির্ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের প্রকৃতি ও রূপ কি ছিল, তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালের ভারতীয় হিন্দুগণ ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যপদেশে দেশ দেশান্তরে গিয়া সেই সকল স্থানে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিতেন। হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও আপেক্ষিক উৎকর্ষই বহির্ভারতে ইহার প্রসারের অনুকূল হইয়াছিল।

তিব্বত

উত্তরপূর্ব অঞ্চলে তিব্বত ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত ঠিক কখন হইয়াছিল, তাহা অনির্ণেয় হইলেও বাংলাদেশে পালরাজবংশের শাসনকালে এই দেশের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সংযোগের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বাংলাদেশ সেই যুগে তান্ত্রিকধর্মের প্রবাহে প্লাবিত। এই তান্ত্রিকতা, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্র, বাংলাদেশ তথা ভারত ও তিব্বতের সংযোগসাধক হইয়াছিল। তিব্বতে ভারতীয় প্রভাবেব প্রসঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহার বহুকাল পূর্ব হইতেই বাঙ্গালী পন্ডিতের তিব্বতে গমনাগমন ছিল। বাঙ্গালী পন্ডিতগণ তিব্বতে গিয়া যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ, রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই বাংলাদেশে তথা ভারতে লুপ্ত। তিব্বতীয় ঐতিহ্য, 'তেঞ্জুর' ও লামা তার-

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ—
   (ক) Hindu Colonies in the Far East—R. C. Majumdar, Calcutta, 1944.
   (খ) Ancient Indian Colonies in the Far East—R. C. Majumdar, Vols. I & II (Pts. 1, 2).
   (গ) The History and Culture of the Indian People (Bharatiya Vidya Bhavan)—Vols. II, III.
   (ঘ) Sanskrit in Indonesia—J. Gonda, Nagpur, 1952.
   (ঙ) Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe—V. Raghavan, Madras, 1956.

২. The Wonder that was India, p. 487.

নাথের সাক্ষ্য হইতে তদীয় গ্রন্থ সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়; তিব্বতীয় ভাষায় উহাদের কতক অনুবাদও সংরক্ষিত আছে। ভারতের নালন্দা বিহার তৎকালে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনাদি আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাহা ছাড়া, সমগ্র তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল সেই ধর্মের জন্মভূমি ভারত। এই সকল কারণে ভারতের প্রতি তিব্বতবাসীর সহজ শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং, ভারতীয় মনীষা শ্রদ্ধাশীল তিব্বতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনে অনায়াসেই স্বপ্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল। যে সকল বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতকেই স্বীয় কর্মকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শান্তরক্ষিত (খৃঃ অষ্টম শতক), শীলভদ্র (খৃঃ ষষ্ঠ—সপ্তম শতক), কুমারবজ্র (খৃঃ দশম শতক), জেতারি (খৃঃ দশম শতক), অতীশ দীপঙ্কর (খৃঃ দশম—একাদশ শতক), অভয়াকর গুপ্ত (খৃঃ একাদশ শতক)। এই সকল লেখক ছাড়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত অন্যান্য বহু লেখকের কীর্তি তিব্বতীয় অনুবাদে বা ঐতিহ্যে সংরক্ষিত আছে।

ব্রহ্মদেশ

খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে দশম শতকের মধ্যবর্তীকালে রচিত সংস্কৃত লেখমালা এই দেশের কতক প্রস্তরখণ্ডে ও স্বর্ণফলকে সংরক্ষিত আছে। ইহা হইতে ব্রহ্মদেশে সংস্কৃতের প্রভাব অনুমিত হইতে পারে। পালিভাষায় রচিত এই দেশের আইনসংক্রান্ত গ্রন্থাদি মনু ও নারদ প্রভৃতি সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবান্বিত। ব্রহ্মদেশের কতক আইনের গ্রন্থে মনুর ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে।[১]

সিংহল

ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সিংহল ভারতেরই একটি অংশ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্ হইতেও একই কথা বলা চলে। বাঙ্গালী বিজয়সিংহের সিংহলে গমন ও বসতিস্থাপন কিম্বদন্তীমাত্র হইলেও ভারতীয় আর্যগণের উত্তরাধিকারিগণ যে দলে দলে স্বীয় সংস্কৃতির বাহক হইয়া সিংহলে বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন ইহা অবিসংবাদিত। সম্ভবতঃ সম্রাট্ অশোকই (খৃঃ পূঃ ২৭৩—২৩৬) সর্বপ্রথম সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু, তাঁহার পূর্বে এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় সিংহলের 'মহাবংশ' ও 'চুলবংশ' নামক প্রধান দুইটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে। 'মহাবংশে'

১. দ্রঃ—K. Motwani-র Manu Dharmasastra, p. 313.

চন্দ্রগুপ্তের মুখ্যমন্ত্রী চাণক্য, চতুর্বর্ণ, ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং কামাদি চতুঃশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। 'চুলবংশে' মনুপ্রণীত রাজধর্মের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায়১।

সুদূর প্রাচ্য

বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের যে বিশাল ভূখণ্ড Far East নামে পরিচিত, তাহার অনেক অংশেই প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন। ভারতীয় সাহিত্যে এই ব্যাপারের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও বৈদেশিক ঐতিহাসিক রচনাবলী২ ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

'জাতক', 'মিলিন্দপঞ্হ', কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্র', 'বৃহৎকথা' প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু গ্রন্থসমূহে 'সুবর্ণভূমি' ও 'সুবর্ণদ্বীপ' এই দুইটি নামের উল্লেখ আছে। আধুনিক যুগের ইন্দোচীনকে তৎকালে বলা হইত সুবর্ণভূমি এবং ইষ্ট্ইণ্ডিজের নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। ক্যাম্বোডিয়া, চম্পা, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও মালয় ইন্দোচীনের অন্তর্গত। ইষ্ট ইণ্ডিজ বলিতে বুঝায় সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও এবং বলি দ্বীপকে।

উক্ত স্থানসমূহে খৃষ্টযুগের পূর্ব হইতেই ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল। ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তত্তদ্দেশীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে বিবাহাদিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিলেন। এইরূপে ঐ সমস্ত অঞ্চলে একটি ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিল। কালক্রমে ভারতীয় বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে নূতন স্থানগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইল।

ধীরে ধীরে হিন্দুসভ্যতা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া বৃহত্তর রাজ্যের সৃষ্টি হইল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে স্থাপিত ফুনান বা কম্বুজ রাজ্য ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে প্রতিষ্ঠিত সুমাত্রার শ্রীবিজয়রাজ, অষ্টম শতকে স্থাপিত সুবর্ণদ্বীপের বিশাল শৈলেন্দ্রসাম্রাজ্য প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপনিবেশগুলিতে হিন্দু সংস্কৃতির অসংখ্য নিদর্শন আজ পর্যন্ত মন্দিরে, দেবদেবীর মূর্তিতে, লেখমালায়, সাহিত্যে, স্থানসমূহের নামকরণে এমন কি তত্তদ্দেশীয় ভাষায় বিদ্যমান। এই সকল

১. সম্পত্তি, বিবাহ, দত্তকগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ক আইনকানুনে ক্যাণ্ডি (Kandy) ও ভারতের সাদৃশ্য এবং পূর্বোক্ত স্থানে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য J. D. Derrett: The Origins of the Laws of the Kandyans (University of Ceylon Review, October, 1956)।

২. যথা—Periplus, Pliny ও Ptolemy-র রচিত গ্রন্থ প্রভৃতি। চৈনিক ও আরবীয় পরিব্রাজকগণের সাক্ষ্যও এই বিষয়ে মূল্যবান্।

স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রভাবের প্রতি বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিব।

বর্তমানে যে অঞ্চল ইন্দোনেশিয়া নামে অভিহিত, সেই অঞ্চলে মনুর ধর্মশাস্ত্রের প্রগাঢ় প্রভাব লক্ষণীয়। বস্তুতঃ, ইন্দোনেশিয়ার আইনের গ্রন্থগুলি এই ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ইন্দোনেশীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম Kutara Manawa ; ইহার অধিকাংশই মনুর ধর্মশাস্ত্রানুবর্তী। ইন্দোনেশীয় অপর প্রধান দুইটি আইনের গ্রন্থ Dewagama এবং Swara-Jambu ; ইহাদের প্রথমটির সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয়টির অধিকাংশ 'মনুস্মৃতি' অবলম্বনে রচিত।১

কম্বুজ (Cambodia)

এই দেশে রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও, বহু সংস্কৃত উৎকীর্ণলিপি (inscriptions) এই দেশের নানাস্থানে রক্ষিত আছে। এই লিপিগুলির মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। এই লিপিগুলি হইতে জানা যায় যে, তৎকালে কম্বুজে বেদ, বেদান্ত ও সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রাদি নানাবিষয় অধীত হইত। একটি লিপিতে 'মনুস্মৃতি'র একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্রে'র শুধু যে পঠনপাঠন হইত, তাহা নহে; রাজ্য পরিচালনায় এই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করিবার প্রচেষ্টাও ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কোন কোন স্থানে নিত্য পঠিত হইত। উপহারস্বরূপ এই সকল গ্রন্থের দান পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। সংস্কৃত কাব্যরসপিপাসাও কম্বুজবাসীর ছিল। রাজেন্দ্র-বর্মার একটি লিপিতে চারিটি শ্লোক 'রঘুবংশে'র কয়েকটি শ্লোকের অনু-করণে রচিত বলিয়া মনে হয়। যশোবর্মার কোন কোন লিপিতে গুণাঢ্য, প্রবরসেন ও তদ্রচিত 'সেতুবন্ধের' উল্লেখ আছে। 'কথাসরিৎসাগরে'র সহিতও লিপিকারের পরিচয়ের প্রমাণ আছে। একটি লিপিতে 'সূর্যশতকে'র উল্লেখ আছে। 'অষ্টাধ্যায়ী', 'মহাভাষ্য' প্রভৃতি দুরূহ ব্যাকরণ গ্রন্থপাঠেও তাঁহারা বিমুখ ছিলেন না। যশোবর্মার এক লিপিতে দেখা যায়, তিনি স্বয়ং 'মহাভাষ্যে'র একখানি ব্যাখ্যা রচনা করেন। হোরাশাস্ত্র, 'কামসূত্র' প্রভৃতির উল্লেখ কোন কোন লিপিতে আছে। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতক কম্বুজে সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নতির যুগ।

চম্পা

শতাধিক সংস্কৃত উৎকর্ণ লিপিমালা এই স্থানে অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। এই লিপিমালা হইতে জানা যায়, চম্পাতে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ১০ম শতক

১. দ্রঃ—K. Motwani: Manu Dharmas'astra p.p. 317-18

পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলে সংস্কৃত এক সময়ে রাষ্ট্রভাষা ছিল। এখানে ভারত হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ আনীত হইয়াছিল এবং নূতন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচিতও হইয়াছিল। লিপিমালার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, রাজা ভদ্রবর্মা (খৃঃ ৫ম শতক) চতুর্বেদজ্ঞ ছিলেন। রাজা তৃতীয় ইন্দ্রবর্মা ভারতীয় ষড়্দর্শন, কাশিকাবৃত্তিসহ 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সপ্তম ইন্দ্রবর্মদেব নাকি ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। আরও জানা যায়, তৎকালে ঐ রাজ্যে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মনুস্মৃতি', 'নারদস্মৃতি' এবং শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মবিষয়ক সাহিত্য ব্যাপকভাবে অধীত হইত। ডাঃ মজুমদার বলিয়াছেন যে, একটি লিপিতে 'পুরাণার্থ' ও অপর একটিতে 'অর্থপুরাণশাস্ত্র' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি মনে করেন, ঐ দুই নামে এক গ্রন্থকেই বুঝান হইয়াছে; উহা ছিল সম্ভবতঃ ভারতীয় কোন পুরাণের ব্যাখ্যা অথবা স্থানীয় সংস্করণ। লিপিসমূহের রচনশৈলী হইতে ভারতীয় পদ্য ও গদ্য সাহিত্যের সহিত রচয়িতৃগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রতিভাত হয়।

মালয়

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতবাসিগণ মালয়েই সর্বপ্রথম আগমন করেন। এখান হইতে ধীরে ধীরে তাঁহারা নানাদিকে ছড়াইয়া পড়েন। বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া প্রথমেই বোধ হয় তাঁহারা মালয়ের তক্কোল (=আধুনিক তকুয়া পা) নামক স্থানে অবতরণ করেন। এই স্থানে এবং মালয়ের অপরাপর স্থানে মঠমন্দির, মূর্তি সংস্কৃত লিপিমালা প্রভৃতি আজ পর্যন্তও হিন্দু সংস্কৃতির সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছে। মালয়ের আইন কানুন 'মনুস্মৃতি'র প্রভাবান্বিত১।

সুমাত্রা

এই স্থানের সর্বপ্রথম হিন্দুরাজ্য খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কাছাকাছি কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সপ্তম শতকের শেষভাগে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। এই রাজ্যের নাম ছিল শ্রীবিজয়। চীনবাসীদের রচিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই রাজ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠনপাঠন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত লাইগর লিপিতে (Ligor Inscription) শ্রীবিজয় রাজ্যের বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। এই লিপি সংস্কৃতে রচিত।

১. দ্রঃ—K. Motwani: Manu Dharmas'astra, p. 315.

জাভা (যবদ্বীপ)১

এখানে বহু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। পশ্চিম জাভায় প্রাপ্ত চারিটি সংস্কৃত উৎকীর্ণ লিপি হইতে তদানীন্তন কালে ঐ অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, জাভার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হো-লিং নামক হিন্দুরাজ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের রীতিমত অনুশীলন হইত। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' তৎকালে জাভায় অতিশয় জনপ্রিয় কাব্য ছিল। ব্যাকরণ ও ছন্দ বিষয়ক কতক সংস্কৃত গ্রন্থ এবং সংস্কৃত অভিধানও জাভায় পাওয়া গিয়াছে। প্রধান ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'স্বরব্যঞ্জন'২। সম্ভবতঃ ১২০০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'বৃত্তসঞ্চয়'৩ ও 'বৃত্তায়ন' নামক দুইটি ছন্দশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ এখানে পাওয়া গিয়াছে। 'অমরমালা' নামক সংস্কৃত অভিধানের একটি রূপ প্রাচীন জাভা-ভাষায় আছে। জাভার ভাষায় 'মহাভারতে'র গদ্যানুবাদ একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। উদ্যোগপর্বের অশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত একখানি পুঁথি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'মহাভারতে'র একটি উপাখ্যান অবলম্বনে 'অর্জুন-বিবাহ' নামক একটি গ্রন্থ খৃষ্টীয় একাদশ শতকে জাভা-ভাষায় রচিত হইয়াছিল। 'সারসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থটি 'অনুশাসনপর্বের' বহু নীতিশ্লোকের জাভা-ভাষায় অনুবাদ; ইহাতে মহাভারতে'র শ্লোক ছাড়াও 'পঞ্চতন্ত্রা'দি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শ্লোকান্তর'৪ নামক গ্রন্থটিতেও বহু নীতিপূর্ণ শ্লোক আছে; নীতি-শ্লোকাত্মক সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহের দ্বারা ইহা প্রভাবিত। 'স্যাং সত্যবান (Sang Satyavan) নামীয় গ্রন্থ 'মহাভারতে'র সাবিত্রী-সত্যবান্ উপাখ্যানের জাভা-দেশীয় রূপ। 'কেরবাশ্রম' গ্রন্থটি 'মহাভারত' অবলম্বনে রচিত হইলেও ইহাতে মূল গ্রন্থের আখ্যানাংশে বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ভীমের কীর্তি-কলাপ বর্ণিত হইয়াছে 'নবরুচি' নামক গ্রন্থে।

প্রাচীন জাভা-ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'রামায়ণ' প্রধান। সংস্কৃত মূল রামায়ণের ভিত্তিতে রচিত হইলেও ইহাতে মূল হইতে অনেক পার্থক্য আছে। জাভার 'রামায়ণে' সীতার বনবাস বা লোকান্তরগমন নাই; ইহাতে অগ্নিপরীক্ষার পরে রামের সহিত সীতা পুনর্মিলিতা হইয়াছেন। 'রামায়ণে'র

---

১. সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত যবদ্বীপের সাহিত্য সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য R. C. Majumdar, Indo-Javanese Literature, Indian Culture, Vol. I.

২. সং Raghu Vira, Saraswati Vihara Series, International Academy of Indian Culture, 1956.

৩. সং H. Kern.

৪. সং Sharada Rani, International Academy of Indian Culture, ১৯৫৭ (শর্তপিটক সিরিজ)

উত্তরকাণ্ডের গদ্যানুবাদ এই ভাষায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; ইহাতেও মূলের সহিত পার্থক্য লক্ষণীয়।

প্রাচীন জাভা-ভাষায় রচিত কাব্যসমূহের[১] অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত। ইহাদের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার, সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সংস্কৃত শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই জাতীয় কাব্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'ভারত-যুদ্ধ'; ইহা Mpu Sedah কর্তৃক ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে রচিত। 'মহাভারতে' বর্ণিত যুদ্ধ ইহার উপজীব্য এবং ইহা এপিকের ভঙ্গীতে রচিত। এই গ্রন্থের প্রায় সমকালীন 'হরিবংশ' কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী হরণ ও জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'হরিবংশ'ই কবির আদর্শ। 'স্মরদহন' কাব্যটি সম্ভবতঃ 'কুমারসম্ভব' দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত। 'ভোমকাব্যে'র বর্ণিত বিষয় পৃথিবীর পুত্র ভোম বা নরক কর্তৃক ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের পরাজয় এবং কৃষ্ণের হস্তে তাহার নিধন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রপঞ্চ নামক এক কবির রচিত 'নাগর-কৃতাগম' একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ত্রিগুণ-রচিত 'কৃষ্ণায়নে'র বিষয়-বস্তু উক্ত 'হরিবংশ' কাব্যের অনুরূপ। 'কৃষ্ণান্তক' কাব্যের বিষয় কৃষ্ণের মৃত্যু ও তদীয় কুলের ধ্বংস। 'নীতিশাস্ত্রকবিন' (—kawin) নামক গ্রন্থটি কতকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ সূক্তি ও নীতি। মনে হয়, সংস্কৃত 'নীতিশতক', পঞ্চতন্ত্র', 'চাণক্যশ্লোক' প্রভৃতির আদর্শে ইহা প্রভাবিত; ইহার কতক শ্লোক স্পষ্টতঃই সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদমাত্র।

উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত জাভায় প্রাপ্ত সংস্কৃতে রচিত বা সংস্কৃত-প্রভাবিত দেবদেবীর স্তোত্র, ধর্মগ্রন্থ ও তন্ত্র ঐ দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার ও প্রগাঢ় প্রভাবের প্রমাণ। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'সূর্যসেবন', 'গারুড়েয়মন্ত্র'; ইহারা প্রাচীন জাভা-ভাষায় রচিত। সংস্কৃতে রচিত 'ভুবনকোষ' ও '‘ভুবনসংক্ষেপ' শৈবধর্মের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পুরাণ সাহিত্যে জাভার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'; ইহা প্রধানতঃ ভারতীয় পুরাণেব আদর্শে রচিত। 'অগস্ত্যপর্ব' নামক গ্রন্থে অগস্ত্য স্বীয় পুত্রের নিকট পুরাণের ভঙ্গীতে পৃথিবী সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। জাভার 'আদিপুরাণ' ও 'ভুবনপুরাণ' নামক গ্রন্থ দুইটিতে পুরাণের প্রসিদ্ধ কাহিনী বর্ণিত থাকিলেও ইহাদের উপজীব্য সংস্কৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

১. এই কাব্যসমূহকে জাভা ভাষায় বলা হয় 'ককবিন' (Kakawin); শব্দটি সংস্কৃত 'কবি' হইতে আগত। নব্য জাভা-ভাষায় 'কবি' শব্দে বুঝায় উচ্চশ্রেণীর মার্জিতভাষা।

'বৃহস্পতিতত্ত্ব'১ নামক একটি গ্রন্থ জাভায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে জাভালিপিতে লিখিত ৭৪টি সংস্কৃত শ্লোক ও উহাদের প্রাচীন জাভা-ভাষায় রচিত ব্যাখ্যা আছে। এই নামের কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাবধি ভারতে অনাবিষ্কৃত; এমন কি, ইহার শ্লোকগুলি ঠিক একই রূপে কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গ্রন্থটি শৈবদর্শনবিষয়ক। দর্শনবিষয়ক অপর একটি গ্রন্থের নাম 'গণপতিতত্ত্ব'২; এই নামের গ্রন্থও ভারতে অনাবিষ্কৃত।

বোর্ণিও

এই স্থানে প্রাপ্ত সাতটি সংস্কৃত উৎকীর্ণলিপি (৪০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ের) হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সূচিত করে।

বলিদ্বীপ

বলিদ্বীপের লোকসাহিত্য ও পশুপাখীর গল্প বহুলাংশে সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র আদর্শে রচিত।

এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ এই অঞ্চলে কোন সময়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইংগিত দেয়। 'কারকসংগ্রহ' নামক একটি গ্রন্থে কাতন্ত্রব্যাকরণ ও 'কবীন্দ্র' পাণিনির ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে। 'চারিত্র-রামায়ণ' বা 'কবি জানকী' এই দেশীয় ভাষায় রচিত; ইহা বাল্মীকির 'রামায়ণে'র সংক্ষিপ্তসার। জাভার পূর্বোক্ত 'নবরুচি' নামক 'মহাভারত' মূলক গ্রন্থটি এই দেশেও অতিশয় জনপ্রিয়। 'ভুবনকোষ' ও 'ভুবনসংক্ষেপ' নামক শৈবধর্মবিষয়ক দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থ জাভার ন্যায় বলিদ্বীপেও রক্ষিত হইয়াছে। এখানে মনুর ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ

এখানে ভারতীয় সভ্যতা প্রাক্-বুদ্ধ যুগেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই দ্বীপপুঞ্জের অনেক প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। শিব, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবমূর্তি ফিলিপাইনের কোন কোন স্থানে রক্ষিত আছে।

এ অঞ্চলে শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও সংস্কৃতিরই যে প্রভাব ছিল, তাহা নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদির প্রভাবও সুস্পষ্ট। ফিলিপাইনবাসিগণ যে বুদ্ধ-

---

১. ইংরাজীর অনুবাদ ও টিপ্পনীসহ সুদর্শনা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত, International Academy of Indian Culture, 1957.

২. সুদর্শনা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত, ঐ, ১৯৫৮।

পূর্ব যুগেই মনুর ধর্মশাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের দ্বারা মনুর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা১।

চীন২

চীনের সহিত ভারতের যোগাযোগ দুই সহস্র বৎসরব্যাপী। এই যোগসূত্রের কারণ শুধু বাণিজ্যই নহে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ ভারতকে পরম পবিত্র স্থান মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ধর্ম ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে এবং তীর্থযাত্রার অভিপ্রায়ে এদেশে আসিয়া দীর্ঘকাল বসবাস করিতেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইসিং প্রভৃতির স্মৃতি ভারতে অদ্যাবধি জাগরূক। চীনদেশীয় সাহিত্যের উপরেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব গভীর। বহু ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত যুগে যুগে চীনদেশকে স্বীয় কর্মক্ষেত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঐ দেশেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক ধর্মপ্রচারক ফা-হু (ধর্মরক্ষ) কতক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন। জানা যায়, ঐ শতাব্দীতে চৈনিক ভিক্ষু চুশেন হিং বহু সংস্কৃত পুঁথি খোটান হইতে চীনে প্রেরণ করেন। একই শতকে সেং হুই নামক জনৈক চৈনিক পণ্ডিত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন।

চতুর্থ শতকে চীন মধ্য এশিয়ার কুচিদেশ আক্রমণ করে। শত্রুর হস্তে পরাজিত কুচিবাসিগণের অনেকেই বন্দী হয়। এই বন্দিগণের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত কুমারজীবকে চীনে নেওয়া হইলে তিনি রাজপুরোহিত পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রাচীন চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ শতকেই গৌতম সঙ্ঘদেব নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত কাশ্মীর হইতে চীনে গিয়া কতক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন।

পঞ্চম শতকে কাশ্মীরী ভিক্ষু বুদ্ধজীব ফা-হিয়েন কর্তৃক আনীত কতক সংস্কৃত পুঁথির চীনা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐ শতাব্দীতেই কাশ্মীরের রাজা হরিভদ্রের পৌত্র ও সংঘানন্দের পুত্র ভিক্ষু গুণবর্মা জাভা

১. "This statue stands in the Art Gallery of the Senate Chamber of the Philippine Republic." *Manu Dharmaśastra* (K. Motwani), p. 322.

২. চীনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ঃ—
(ক) India and China, P. C. Bagchi.
(খ) Indian Literature in China (Journal of Oriental Research, Madras, 1956, Sep.—1957, Aug., p. 114).

ও অন্যান্য দেশ হইয়া চীনে উপস্থিত হন এবং এগারখানি সংস্কৃত গ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।

সপ্তম শতকে খোটানী পণ্ডিত শিক্ষানন্দ অধুনালুপ্ত 'বুদ্ধাবতংসক' নামক সংস্কৃত মহাযানী গ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই কার্যে ভারতীয় আচার্য বোধিরুচি তাঁহার সহায়তা করেন। এই বোধিরুচি ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি সপ্তম শতকে চৈনিক রাজদূতের আমন্ত্রণে চীনে গমন করেন। তিনি নিজে এবং কতক চৈনিক ও ভারতীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় ৫৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কীর্তি বিশাল মহাযানী গ্রন্থ 'রত্নকূটে'র অনুবাদ। মূল গ্রন্থের পুঁথি হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ হইতে চীনে লইয়া যান। ইহার অনুবাদ আরম্ভ করিবার অল্পকাল মধ্যেই তিনি পরলোক-গমন করেন।

এই প্রসঙ্গে শুভাকরসিংহের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম পাদে বহু সংস্কৃতগ্রন্থের পুঁথি সঙ্গে লইয়া চীনে গমন করেন এবং কতক গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন।

যে সকল ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ বজ্রবোধি ও তদীয় শিষ্য অমোঘবজ্র। মধ্যভারতীয় রাজা ঈশানবর্মার পুত্র বজ্রবোধি বাল্যকালেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং নালন্দায় ও পশ্চিমভারতে নানা বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাঞ্চীতে কিছুকাল বাস করেন। তৎপর সিংহলে গিয়া তথা হইতে সিংহল-রাজ কর্তৃক প্রেরিত এক প্রচারকসঙ্ঘের সহিত চীনে গমন করেন। ইঁহাদের সঙ্গে সিংহলরাজ চীন-সম্রাটের জন্য 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা' ও বৌদ্ধগণের পক্ষে মূল্যবান্ অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীনে অবস্থানকালে বজ্রবোধি বহু গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার আদেশে অমোঘবজ্র সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধশাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থ, চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদ-গুলি শুধু যে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারেই সহায়তা করিয়াছিল, তাহা নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহারা অমূল্য সম্পদ। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের এমন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল যেগুলি কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে; একমাত্র চীনা অনুবাদ হইতেই ইহাদের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি নামোল্লেখ করা যাইতেছে[১]।

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ পি. সি. বাগচীর India and China, p.p. 136-145.

হীনযানীদের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কাশ্মীরী সর্বাস্তিবাদী হরিবর্মার 'সত্যাসিদ্ধিশাস্ত্র' বা 'তত্ত্বসিদ্ধিশাস্ত্র'। ইহার সংস্কৃত মূল লুপ্ত; চীনা অনুবাদমাত্র আছে। মহাযানবিনয়ের 'ব্রহ্মজালসূত্রে'রও সংস্কৃত মূল সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। ইহারও চীনা অনুবাদ আছে। মহাযানী বৌদ্ধগণের 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র অধিকাংশ সংস্কৃত মূল গ্রন্থই লুপ্ত। শুধু চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদ ভিন্ন এই জাতীয় সকল মূল গ্রন্থের পরিচয় কুত্রাপি নাই। এই সম্প্রদায়ের একখানি বিশাল সংগ্রহগ্রন্থ 'রত্নকূট'। এই সংগ্রহের মূল গ্রন্থসমূহের সম্পূর্ণ পরিচয় একমাত্র চীনা অনুবাদেই আছে। 'মহাসন্নিপাতে'র সর্বপ্রধান ও বিস্তীর্ণ গ্রন্থ 'রত্নকূটসূত্রে'র সংস্কৃত মূল বিলুপ্ত; ইহার সম্বন্ধে জানিতে হইলে চীনা অনুবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আধুনিক যুগেও চীনদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব নিতান্ত নগণ্য নহে। সু টি শান (Hus Ti-shan) চীনদেশের খ্যাতনামা ছোটগল্পলেখক। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং চীনাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট কতক গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। 'মহাভারতে'র কতক অংশ মূল সংস্কৃত হইতে চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছে। চি-সিয়েন্ লিন্ (Chi-Hsien Lin) জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি কতক চৈনিক পণ্ডিত সম্পূর্ণ মূল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র অনুবাদকার্যে রত আছেন। উক্ত লিন মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে, পূর্বে 'শকুন্তলা' নাটকের আট কি নয়বার চীনা অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু কোন বারেই মূলের অনুবাদ করা হয় নাই। সম্প্রতি নাকি মূল 'শকুন্তলার পূর্ণ অনুবাদ হইয়াছে এবং এই নাটক চৈনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছে।

চীনদেশে প্রাপ্ত একটি পুঁথি সম্বন্ধে British Museum-এর Sir Wallis Budge বলেন, "In the manuscript, I find direct references to the Laws of Manu."১

জাপান২

আর্যগণের এক শাখা বুদ্ধযুগের বহুপূর্বে জাপানে উপনিবেশ স্থাপন

১. দ্রঃ—K. Motwani. Manu Dharmas'astra, p. 232.

২ জাপানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের জন্য দ্রষ্টব্য H. Kimura মহাশয়ের প্রবন্ধ Sanskrit Studies in Japan,—Journal of Oriental Research, Madras, 1956 (Sep.)—1957 (Aug.), পৃঃ১।

করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সংস্কৃত কতক শাস্ত্রাদি, বিশেষতঃ মনুর-ধর্মশাস্ত্র, নিজেদের উপনিবেশ প্রবর্তন করিয়াছিলেন১।

যে-যুগে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হইয়াছিল, সে-যুগেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত জাপানীগণের পরিচয় ঘটে। যতদূর জানা যায়, চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রবেশ লাভ করে। ভারতীয় গ্রন্থসমূহের চৈনিক অনুবাদ হইতেই জাপানীগণ সংস্কৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। জাপানীগণের কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া জাপানে গিয়াছিলেন এবং সেখানেই শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কোন কোন জাপানী পণ্ডিত মনে করেন যে, তাঁহার নিকট হইতেই কতক জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর, কুকই নামক জনৈক জাপানী ভিক্ষু চীনে গিয়া নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে জাপানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিয়মিতভাবে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 'সিদ্ধম্' নামক সংস্কৃত লিপি অধিগত করেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে জুইং সূর্য (Juin Surya) নামক জনৈক জাপানী ভিক্ষু একটি সংস্কৃত-জাপানী অভিধান সংকলনের অভিপ্রায়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া উহা শেষ করিতে পারেন নাই। জাপানে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক যে সকল সংস্কৃত পুঁথি ছিল, তিনি উহাদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং কতক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সুখাবতীব্যূহনাম মহাযানসূত্র' প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের অন্য পুঁথি আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে যে জাপানী পাণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বশিষে উল্লেখযোগ্য Nanjio Bunyan, Jyunjiro, Takakusu, Ryozaburo Sukaki ও Unrai Ogihara। Takakusu 'ভগবদ্গীতা' ও অন্যান্য কতক সংস্কৃত গ্রন্থের জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। Sukaki 'মহাব্যুৎপত্তি' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন; ইহা চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ সহ একখানি বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান। 'অভিধর্মকোষ-ব্যাখ্যা', 'অভিসময়ালঙ্কার' ও 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'—এই তিনটি গ্রন্থের তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের সাহায্যে Ogihara ইহাদের সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কতক বৎসর পূর্বে, জাপানে সংস্কৃত-চীনা-জাপানী একখানি অভিধান রচনার পরিকল্পনা করা হয়; ইহার প্রধান সম্পাদক Ogihara। ইহার

১. দ্রঃ—K. Motwani: Manu Dharmas'astra, p. 234.

কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক Ikeda 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে উপনিষদের একখানি জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। স্থিরমতি-রচিত 'মধ্যান্তবিভঙ্গটীকা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ টীকাটিপ্পনী সহ জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। . Kimura কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যের জাপানী গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, কালিদাসের সমস্ত কাব্য ও নাটকের জাপানী অনুবাদ প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও 'মনুস্মৃতি'র জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে অধ্যাপক Nakano কর্তৃক।

Kimuraমহাশয় জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত গ্রন্থ ও অনুবাদ ছাড়াও, বর্তমানে অনেক জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ, উপনিষদ, ভারতীয় দর্শন, জ্যোতিষ, পুরাণ প্রভৃতি নানাবিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা চলিতেছে।

পারস্য ও আরব

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বারজোই নামক জনৈক পারস্যদেশীয় চিকিৎসক পহ্লবীভাষায় সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদ করেন। 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটির ইতিহাস বিচিত্র। মূল 'পঞ্চতন্ত্র' ভারতে লুপ্ত; কিন্তু ইহা নানারূপে নানাদেশে অদ্যাবধি বর্তমান। J. Hertel বলেন যে, 'পঞ্চতন্ত্রে'র দুই শতাধিক রূপ পঞ্চাশটিরও অধিক ভাষায় জাভা হইতে আইস্ল্যান্ড পর্যন্ত নানাদেশে প্রচলিত আছে। অষ্টম শতাব্দীতে মুকুফা নামক ব্যক্তি এই পহ্লবী অনুবাদ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রায় একই কালে বোগ্-দাদের খলিফাগণ চরক ও সুশ্রুতের বিখ্যাত আয়ুর্বেদ গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। অষ্টম ও নবম শতকে আরব দেশবাসী হিন্দু-গণের জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের সহিত পরিচয় লাভ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, আরব ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু প্রাচীন কাল হইতে আছে। এমন কি, আর্যগণ ভারতে বসতি স্থাপনের পূর্বে পারস্যে বা ইরাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্যের ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'র সহিত ভারতীয় বৈদিক সংহিতার ভাষাগত ও ভাবগত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

ইরাণের দেবগোষ্ঠীর অন্যতম দেবতা বৈবস্বতমনু। ইরাণীয়গণের জীবনে মনুর ধর্মশাস্ত্রের বিস্তর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দরায়ুসের (Darius—খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ—পঞ্চম শতক) সাম্রাজ্যের পরিচালনার জন্য মনুর ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে আইন-প্রণয়ন করা হইয়াছিল। জরথুষ্ট্রের (Zoroaster)

অনুবর্তিগণের মাধ্যমে মনুর পূজা ও তদীয় ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন পশ্চিম এশিয়ায় ও প্রতীচ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল১।

মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়ার কুচি নামক স্থানের আধুনিক নাম কুচ। এখানে সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতির যে চর্চা হইত, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। স্থানীয় ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাবান্বিত। এই স্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত গ্রন্থাংশ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কুচিরাজ্যের প্রসিদ্ধ ভিক্ষু কুমারজীব কাশ্মীরে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মহাযান শাস্ত্রের চর্চা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মহাযানের প্রধন প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ আর্যদেবের 'শতশাস্ত্র', নগজর্নের 'মাধ্যমকশাস্ত্র' প্রভৃতিতে তিনি কুচিবাসিগণকে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু মূল সংস্কৃত গ্রন্থ কুচি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ডঃ প্রবোধ বাগচী বলেন যে, এই অনূদিত সাহিত্যই কুচীয় ভাষায় একমাত্র সাহিত্য২।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Col. Bower কুচিতে যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহাদের ভাষা সংস্কৃত ও বিষয় ভারতীয় আয়ুর্বেদ।

কুচি হইতে তুন-হেয়াং-এর পথের উপরে প্রাচীন 'অগ্নিদেশ' অবস্থিত ছিল। এই দেশবাসিগণের লিপি ছিল ভরতীয় ব্রাহ্মীলিপি। প্রমাণ আছে যে, তাহাদের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল। তুন-হোয়াং-এর পুস্তকাগারে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত বহুসংখক সংস্কৃত গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল।

বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থ 'উদানবর্গ' ভারতে লুপ্ত; ইহা মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রচীনতম অংশ কুষাণ রাজত্ব-কালে (খৃষ্টীয় প্রথম শতকে) রচিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রায় সমকালে রচিত 'শারিপুত্রপ্রকরণ' ও অপর দুইটি সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের কতক অংশ টারফান্ (Turfan) নামক স্থানে অবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'শারিপুত্রপ্রকরণ' অশ্বঘোষ-রচিত; অপর দুইটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

হিব্রুগণ বৈদিক দেবতা, সংস্কৃত ভাষা ও মনু-ধমশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে৩।

মধ্য এশিয়ার বামিয়েন নামক স্থানে বহু গুহামন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১. দ্রঃ—K. Motwani: Manu Dharmas'astra, p. 256.
২. দ্রঃ—ভারত ও মধ্য এশিয়া, পৃঃ ৫১।
৩. দ্রঃ—K. Motwani: Manu Dharmas'astra, p. 288.

এই সকল মন্দিরের অনেক সংস্কৃত পুঁথির অংশ পাওয়া গিয়াছে; গ্রন্থগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রবিষয়ক।

মধ্য এশিয়ার খোটানে মহাযান সম্প্রদায়ের 'সুবর্ণপ্রভাসসূত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের খোটানী অনুবাদের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, খোটানী ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। মহাযানী বৌদ্ধগণের অধুনালুপ্ত 'বৈপুল্যসূত্র' বা 'মহাসন্নিপাত' নামক দুইটি গ্রন্থের অংশবিশেষ খোটানের গোমতী-বিহারে সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এই বিহারে সংকলিত অপর একখানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাম 'জীর্ণমূর্খসূত্র'। এই মূল গ্রন্থটি লুপ্ত; যে সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কুচিভাষা অন্যতম।

বর্তমান শতাব্দীর আদিভগে জার্মান অধ্যাপক Gruenwedel মধ্য এশিয়ার নানাস্থান হইতে যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রায় সমকালে ফরাসী পণ্ডিত Paul Pelliot মধ্য এশিয়ায় অনেক সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই ত্রিপিটকের সংস্কৃতরূপের খণ্ডিতাংশ। পালিভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় ত্রিপিটক রচিত হইয়াছিল—এ কথা এই আবিষ্কারের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল।

প্রতীচী

পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহু শতাব্দীর। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত অভিযানের (৩২৬ খৃঃ পূঃ) পর হইতে গ্রীস্ দেশের সঙ্গে এই দেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীক্‌গণ এই অঞ্চলে শুধু রাজ্যস্থাপনই করেন নাই; তাঁহাদের সঙ্গে ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক আদান প্রদানও যথেষ্ট ছিল। মনু ও তদীয় ধর্মশাস্ত্রের সহিত গ্রীস্‌বাসীর পরিচয় ছিল; 'মনু' শব্দের গ্রীক্‌রূপ Menes বা Manes[১]। গ্রীসের মাধ্যমে রোম্ মনুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়[২]। কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের আদর্শই ছিল গ্রীক্ নাট্য। রামগড় পাহাড়ের গুহায় গ্রীক্ আদর্শে নির্মিত রঙ্গমঞ্চ নাকি ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রীক্ রাজা মিনান্দারকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বৌদ্ধ দার্শনিক নাগসেন যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে পালিতে

১. দ্রঃ—K. Motwani: Manu Dharmas'astra, p.p. 290-297.
২. ঐ, পৃঃ ৩০০-৩০১।

'মিলিন্দপঞ্হো' নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রীক্ রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস্ (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক) তাৎকালিক ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে ইতালীর Sassetti নামক এক ব্যক্তি গোয়া ও কালিকাট প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে বহু তথ্য জানাইয়াছিলেন[১]। ভারতীয় দেবভাষার সহিত প্রতীচীর পরিচয়ের এই বোধ হয় সূত্রপাত। প্রতীচীর সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে। তখন হইতে ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও ধর্মযাজকগণ ভারতে আসিয়া এই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে এব্রাহাম রোজার কর্তৃক ভর্তৃহরির কাব্যের পোর্তুগীজ অনুবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে Hanxleden ইউরোপীয় ভাষায় সর্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই; কিন্তু St. Bartholomew প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্-এর আমলে হিন্দু আইন সংক্রান্ত বিবাদ বিসম্বাদের সুষ্ঠু বিচারের উদ্দেশ্যে কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করান হইয়াছিল। ইহারই ইংরাজী অনুবাদ Halhed's Gentoo Law নামে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে Charles Wilkins 'ভগবদ্গীতা', 'হিতোপদেশ' ও 'মহাভারতে'র শকুন্তলা উপাখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী ইউরোপীয় মনীষিগণের অন্যতম Sir William Jones। ইনি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ও 'মনুস্মৃতি'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কালিদাসের 'ঋতুসংহারে'র প্রকাশনও তাঁহারই উৎসাহে হইয়াছিল। বর্তমানে কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ এসিয়াটিক্ সোসাইটি ইনিই স্থাপন করেন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এই শতকের শেষভাগে জার্মাণ পণ্ডিতগণের অবদানও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। Georg Forster জার্মান ভাষায় 'শকুন্তলা'র অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাঠেই মনীষী গ্যেটে (Goethe) মুগ্ধ হইয়া এই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার আদর্শেই তিনি স্বীয় Faust নাটকের প্রস্তাবনা রচনা করিয়াছিলেন। জার্মান পণ্ডিত Friedrich Schlegel 'On the language and wisdom of the Indians' নামক গ্রন্থে 'রামায়ণ'

১. দ্রঃ—A. M. Pizzagalli: The Discovery of Sanskrit and Italy in the 16th Century, Indian Culture, Vol. II.

'ভগবদ্‌গীতা' ও 'মনুস্মৃতি'র অংশবিশেষ অনুবাদ করেন। তাঁহার ভ্রাতা August Schlegelও কতক সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণ এবং অনুবাদ প্রকাশিত করেন। Friedrich Ruckert নামে অপর একজন জার্মান সাহিত্যরসিক পন্ডিত সংস্কৃত কাব্যে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

A. L. Chezy সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগী সর্বপ্রথম ফরাসী পন্ডিত। তাঁহারই কৃতী ছাত্র Franz Bopp ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) প্রতিষ্ঠা করেন। Conjugation System নামক গ্রন্থে তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র কতক অংশের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা জার্মান পন্ডিত Humboldt-এর মনীষায় সমধিক সমৃদ্ধ হয়।

এই যুগে Alexander Hamiltonএর নাম উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দেদীপ্যমান। তিনি ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তনকালে নেপোলিয়নের আদেশে অন্যান্য ইংরেজগণের সঙ্গে প্যারি নগরে কারারুদ্ধ হন। কারাবাস কালে তিনি একদল ইউরোপীয় ছাত্রকে সংস্কৃত সাহিত্যে দীক্ষিত করেন; ইঁহারা মহা উৎসাহে এই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই ঘটনাকে প্রতীচ্যে Discovey of Sanskrit বা সংস্কৃতের আবিষ্কার বলা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিতেন Colebrooke। সংস্কৃত পন্ডিতগণের একটি সংকলন গ্রন্থের ভিত্তিতে A Digest of Hindu Law on Contracts and Succession নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রণয়ন ছাড়াও Colebrooke 'অমরকোষ', 'অষ্টাধ্যায়ী', 'হিতোপদেশ' ও 'কিরাতার্জুনীয়' প্রভৃতি মূল গ্রন্থের সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতক যেমন বাংলাসাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনই ইউরোপীয়গণের উৎসাহ ও নৈপুণ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার যুগান্তর সূচনা করিয়াছিল। এই শতকের আদিভাগে ভারতের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার উপনিষদ ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞানপিপাসুগণের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল। ফরাসী পন্ডিত Perron কতৃক উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। শেলিং, ক্যান্ট্, শিলার ও শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক উপনিষদের আলোকে নূতন জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। Basham মনে করেন যে, Fichte ও হেগেলের চিন্তাধারায় অদ্বৈতবাদ যেরূপে দেখা দিয়াছে, তাহা Anquetil-Duperron কর্তৃক উপনিষদের অনুবাদের সাহায্য ব্যতীত

সম্ভবপর হইত না১। Emerson, Thoreau প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিতগণ ভারতীয় ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদপাঠে যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং সেই প্রভাব অপর পণ্ডিতগণের উপর বিস্তার করিয়াছিলেন২।

এই যুগে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার স্পর্শে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জীর্ণ কঙ্কালে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Friedrich Rosen সর্বপ্রথম বৈদিক সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় ঋগ্বেদের অধিকাংশ প্রকাশিত হয়। ফরাসী মনীষী Eugene Burnouf বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন গভীর ভাবে করিতে থাকেন। তাঁহার একদল ছাত্র গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই সাহিত্যচর্চার সাগরতীরে স্বীয় পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য Rudolf Roth ও MaxMuller। সায়ণভাষ্য সহ প্রকাশিত Max Mullerএর ঋগ্বেদের সংস্করণ অদ্যাবধি এই মনীষীর কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া বিরাজমান।

Roth এর ছাত্র Grassmann সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন। সায়ণভাষ্যের অনুসরণে Wilsonও এই বেদের ইংরাজী অনুবাদ করেন। Vedic Studies নামক গ্রন্থের যুগ্ম রচয়িতা Pischel ও Geldner। বৈদিক সাহিত্যের গবেষণায় Thedor Aufrechtএর নাম চিরস্মরণীয়। Indische Alterthumskunde নামক গ্রন্থে Lassen ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সমকালীন জ্ঞান-গবেষণার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা কারয়াছেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে St. Petersburg Dictionary (Sanskit Worterbuch) নামক অভিধানের প্রকাশন একটি উদ্দীপনাজনক ঘটনা। ইহা Bohtlingk ও Roth এর কীর্তি। প্রায় সমকালে Weber রচিত The History of Indian Literature সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম ইতিহাস। 'শতপথব্রহ্মণে'র সংস্করণ Weberএর অপর অক্ষয় কীর্তি।

১৮৯১, ১৮৯৬ ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত পণ্ডিত Theodor Aufrecht তাঁহার বিরাট গ্রন্থ Catalogus Catalogorum প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন পুঁথিশালায় সংরক্ষিত যে সকল সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, সেই পুঁথিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এই গ্রন্থে। বর্তমান যুগের গবেষকগণের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা Buhler পরিকল্পিত Gru ıdriss der indo-arischen Philologie and Altertumskunde (Encyclopœdia of Inlo-Aryan Philology and Archæology) ; ইহা ভারতীয় আর্য-

১. The Wonder that was India, p. 487
২. ঐ।

ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের মহাকোষ। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত— এই সকল স্থানের মনীষিগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিশাল গ্রন্থ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে অংশতঃ প্রকাশিত হইতেছিল।

আজও Edgerton, Barnett, Renou, Brough, Burrow প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা এই কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতের চর্চা কিরূপ হইতেছে এবং ঐ সকল দেশের পুঁথিশালায় কি ধরণের সংস্কৃত পুঁথি সংরক্ষিত আছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন V. Raghavan মহাশয় তদীয় Sanskrit and Allied Indological Stardies in Europe নামক গ্রন্থে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার ধারা[১]

বর্তমান যুগে শুধু বিজ্ঞানেই নহে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'গবেষণা' শব্দটির বহুল প্রচলন লক্ষণীয়। সাহিত্যে গবেষণা সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি মত প্রকাশিত হইয়া থাকে। কতক পণ্ডিত মনে করেন যে, গবেষণার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কোন বিষয়ে কিছু লিখিতে পারিলেই গবেষক—এই তাঁহাদের মত। ইঁহারা বিশ্বাস করেন যে, যাহারা গবেষণা করে তাহারা একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য সংগ্রহ করে মাত্র; এই ধরণের গবেষকগণের জ্ঞানের ব্যাপকতা মোটেই কিছু নাই। আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণায় যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা গবেষণা না হইলে জ্ঞানানুশীলনকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ মনে করিয়া থাকেন। যাহা কিছু এ পর্যন্ত জ্ঞাত, সেই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ শেষোক্ত পণ্ডিতগণ উচ্চশিক্ষার চরম আদর্শ বলিয়া মানেন না; অবশ্য শিক্ষার্থী একটা বিশেষ বয়স বা সময় পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকাদি পাঠ করিয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। তাঁহাদের মতে, গবেষণাকার্যের সার্থকতাই হইবে উচ্চশিক্ষার সফলতার পরিচায়ক। তাহা হইলে, গবেষণার অর্থ কি? গবেষণা বলিতে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন, কোন বিষয়ে জ্ঞানের পরিধির বিস্তার। উপলভ্যমান জ্ঞানভাণ্ডারকে নির্বিচারে মানিয়া লওয়া তাঁহাদের কাম্য নহে। এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিটি রত্নকে প্রকৃত জহুরীর ন্যায় যাচাই করিতে হইবে; প্রয়োজন হইলে মলিন রত্নকে পরিমার্জিত করিতে হইবে, এমন কি যে রত্ন বর্জনীয় তাহাকে বর্জন করিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করিবে না। শুধু উপলব্ধ জ্ঞানের শোধনেই গবেষকের কর্তব্য পর্যবসিত নহে। মৌলিক চিন্তাধারার প্রবাহে জীর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে সরস করিয়া তোলা তাঁহাদের একটি প্রধান কর্তব্য। এই চিন্তাধারা এমন হওয়া আবশ্যক যাহা অপরের চিন্তা উদ্রিক্ত করিতে পারে। ভারতবর্ষে যে গবেষণার ধারণা ছিলনা, এমন কথা বলা যায়না। মৌলিক চিন্তা যদি না-ই থাকিত তাহা হইলে এক বেদের বিভিন্ন প্রকার ভাষ্য রচিত হইত না, প্রাচীন স্মৃতির বিবিধরূপ ব্যাখ্যার উদ্ভব ভারতের নানা অঞ্চলে হইত না এবং এক বেদান্তসূত্রের শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচনা করিতেন

১. সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার ফল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। মোটামুটি ধারণার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) Progress of Indic Studies—R. N. Dandekar, Poona, 1942.

(২) Vedic Bibliography—R. N. Dandekar, Bombay, 1946.

(৩) Studies in Epics and Puranas—A. D. Pusalker, Bombay..

না। উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয়েই ভারতীয় পণ্ডিতগণের মৌলিক চিন্তার পরিচয় বিদ্যমান। গতানুগতিককে নির্বিচারে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা মানেন নাই। কিন্তু, কতক ব্যাপারকে সনাতনী হিন্দু স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন; যেমন, বেদের অপৌরুষেয়তা, ঋষি বাল্মীকি ও ব্যাস কর্তৃক রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা ইত্যাদি। কিন্তু, এক্ষেত্রেও বামমার্গী বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্শন ও লোকায়ত দর্শন বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করিয়া। মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর ভারতীয় মনীষী যুগে যুগেই রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু, বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে গবেষণার প্রবণতা ও পদ্ধতি আমরা লাভ করিয়াছি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের নিকট হইতে। বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক চিন্তার প্রবর্তক তাঁহারাই। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন অনভূত হয় এবং গবেষণা প্রবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক পদ্ধতি ছাড়াও, তুলনামূলক এবং বিচারবিশ্লেষণাত্মক কতক অভিনব পদ্ধতির জন্য আমরা প্রতীচ্যের নিকট ঋণী।

বিপুল ও বিচিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের বহুমুখী গবেষণার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া উপস্থিত ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিসরে সম্ভবপর নহে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে বিবিধরূপ গবেষণাধারার একটি রূপরেখা মাত্র চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সংস্কৃত সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারিঃ—

(ক) বৈদিক সাহিত্য,
(খ) এপিক ও পৌরাণিক সাহিত্য,
(গ) ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য।

(ক) বৈদিক সাহিত্য

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও বেদাঙ্গ—বৈদিক সাহিত্যের প্রধান এই চারিটি ভাগের অন্তর্গত গ্রন্থাদির ইংরেজী অনুবাদ ও সংস্করণ প্রভৃতি ছাড়াও, বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণাধারার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

ডি. সি. আচার্যের The Doctrine of Revelation in the Rg Veda, এ. কে. চক্রবর্তীর Samudra in the Rg Veda, অরবিন্দ ঘোষের Secret of the Veda (অঙ্গিরস-উপাখ্যান প্রভৃতির ব্যাখ্যা), ডি. আর. মানকড়ের The Arctic Regions in the Rg Veda, প্রাণনাথের Sumero-Egyptian

Origin of the Rg Veda, সৈম্ববনেকরের The Origin of Rg Veda প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির নামই ইহাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিচায়ক।

অথর্ববেদের উপর গবেষণায় এই বেদে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে প্রধান করম্বেলকার, প্রিয়রত্ন, বেঙ্কটেশ্বর শর্মা প্রভৃতি। বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদের স্থান ও আবেস্তা এবং অথর্ববেদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কাহারও কাহারও আলোচ্য বিষয়।

ক্যালান্ড (Caland) নামক পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত সামবেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন।

যজুর্বেদের নানা শাখা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন রঘুবীর।

কতক লুপ্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থের উদ্ধার করিয়াছেন বটকৃষ্ণ ঘোষ। ভি, ভি, দীক্ষিত ইতিহাস, ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে [illegible] হিতের সহিত এপিকের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছেন।

উপনিষদ্ সাহিত্যের সম্বন্ধে নানারূপ [illegible] চিন্তাধারা বিবিধ গ্রন্থে ও প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। প্রধান কয়েক [illegible] প্রবন্ধের পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতেছে। উমেশ ভট্টাচার্য উ[illegible] সমূহের উৎপত্তিস্থল ও ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উপনিষদে সাকার-উপাসনার সন্ধান দিয়াছেন বসন্ত চট্টোপাধ্যায়। [illegible] সাহিত্যে উপনিষদের প্রভাব Horrwitzএর আলোচ্য। এস· এম· কাত্রে প্রাচীনতম উপনিষদের সহিত প্রাচীন বৌদ্ধ গাথার সম্বন্ধ নির্দেশ করি[illegible]। উপনিষদে প্রতিফলিত সমাজ-ও ধর্ম-জীবনের চিত্র অঙ্কিত [illegible]ছেন স্বামী বিমুক্তানন্দ। উপনিষদের মূল তত্ত্ব ও ঈশ্বরবাদ, অথ[illegible] উপনিষদ্ প্রভৃতি বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন।

কতক কল্পসূত্রের আপেক্ষিক রচনা[illegible] সম্বন্ধে কালাণ্ড গবেষণা করিয়াছেন। বি· বি· দত্ত শুল্বসূত্র অ[illegible]ন প্রাচীন ভারতের জ্যামিতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। [illegible]সূত্র ও গৃহ্যসূত্রে হিন্দুর জীবনাদর্শ বটকৃষ্ণ ঘোষ বিশ্লেষণ করিতে চে[illegible] করিয়াছেন। ভি· এম্· আপ্তে গৃহ্যসূত্রের সমাজ-জীবনের চিত্র [illegible] অঙ্কিত করিয়াছেন।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' অবলম্বনে না[illegible] গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ভি· এস্· আগ্রওয়ালের (Agrawala) India as known to Panini গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহাতে গ্রন্থকার 'অষ্টাধ্যায়ী'তে প্রাপ্ত প্রাচীন ভারতের মুদ্রা, কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য, ভৌগোলিক তথ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। Panini and his place in Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে Goldstucker পাণিনি ও তদীয় গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ফ্যাডিগনের

(Faddegon) Studies in Panini's Grammar অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; ইহাতে তিনি 'অষ্টাধ্যায়ী'র বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া এই গ্রন্থের প্রতি স্বীয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম করা যায়ঃ—

Thiemeএর Panini and the Veda, Pacoateএর The Structure of the Astadhyayi, Liebichএর Panini.

বেদ, ঋক্প্রাতিশাখ্য ও চন্দ্রব্যাকরণের সহিত পাণিনির সম্বন্ধ কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন।

বেদ ও আবেস্তার ভাষা ও ভাবগত সম্বন্ধ গাইগার (Geiger), বটকৃষ্ণ ঘোষ, এন. এন. গুপ্ত প্রভৃতি অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।

কে. চট্টোপাধ্যায়, ভিণ্টারনিৎস্, কীথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদের কাল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন।

বৈদিক সাহিত্যের কাব্যগুণ এবং সঙ্গীতধর্মও পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বেদে প্রযুক্ত অলংকার সম্বন্ধে ভাণ্ডারকর, গোণ্ডা, য্যাকবি, ভেলাঙ্কার, বেঙ্কটসুব্বিয়া প্রভৃতির প্রবন্ধাবলী উল্লেখযোগ্য।

অথর্ববেদের রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে গোণ্ডা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

সামবেদের সঙ্গীত সম্বন্ধে আয়ার, আপ্তে, দ্রবিড় ও ভেলাঙ্কার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালের ভারতীয় সঙ্গীত ও ছন্দের মূল যে বেদে নিহিত তাহা দেখাইয়াছেন এম. রাজা রাও।

উপনিষদের ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন গোপালকৃষ্ণ আয়ার ও এন্. কে. মজুমদার। ওয়েলার ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ছন্দ সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণের ছন্দ সম্বন্ধে ধারণা বেশ উন্নতধরণের ছিল—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন পি. এস্. শাস্ত্রী।

বৈদিক স্বর (accent) ও অর্থের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন কুন্হান রাজা, এন. এস. শাস্ত্রী ও সিদ্ধেশ্বর বর্মা।

বৈদিক সাহিত্য অবলম্বনে একাধিক শব্দকোষ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে Macdonell ও Keith-এর Vedic Index এবং বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রীর 'বৈদিকপদানুক্রমকোষ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনার জন্য এই কোষগুলি অপরিহার্য।

বৈদিক সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক (linguistic) গবেষণা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য লুই রেণো (Louis Re'nou), সিদ্ধেশ্বর বর্মা ও এস্. এম্. কাত্রে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও, বৈদিকধর্ম, দর্শন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচিত

হইয়াছে। উপনিষদের দর্শনই সর্বাধিক আলোচ্য বিষয়। কোন কোন গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বা বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতির ইতিহাস আলোচনা-ক্রমে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনাও করা হইয়াছে।

(খ) এপিক ও পৌরাণিক সাহিত্য

মহাভারত

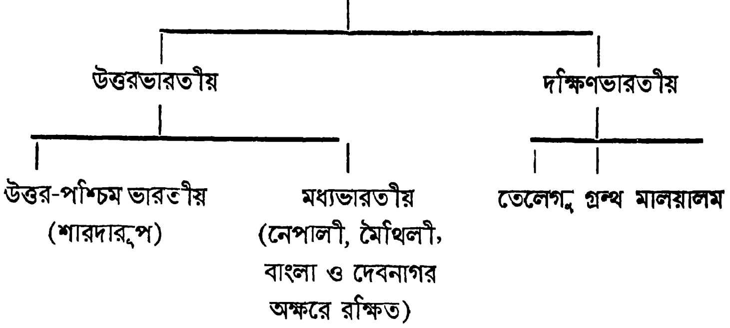
এপিকের মধ্যে 'মহাভারতে'র উপর গবেষণামূলক রচনা রামায়ণ অপেক্ষা বেশী।

'মহাভারতে'র ক্ষেত্রে যুগান্তকর গবেষণা হইয়াছে এই গ্রন্থের মূল নির্ধারণ ব্যাপারে। প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসিগণ 'রামায়ণ' 'মহাভারত'কে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছে, পূজা করিয়াছে এবং পাপক্ষয়কারী পবিত্র বস্তুরূপে গণ্য করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহাকেই মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাসের রচনা বলিয়া তাহারা নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগ প্রশ্নের যুগ, অন্ধ বিশ্বাস এই কালে অচল। এই যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সুদৃঢ় যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ-বলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই দুই মহাকাব্য এক সময়ের বা এক ব্যক্তির, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, এক অঞ্চলের রচনা নহে। গবেষক-সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার পরে, তাঁহাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগিল—তাহা হইলে ইহাদের কতটুকু খাঁটি, কতটুকুই বা প্রক্ষিপ্ত ?

'মহাভারতে'র ক্ষেত্রে, এই সমস্যা সমাধানের প্রথম চেষ্টা করিলেন International Association of the Academies of Europe and America। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু, প্রথম মহাসমর উহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং উহা পরিত্যক্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের পুনাস্থিত ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্ট্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এই গুরুভার গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত কয়েকজন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদকে লইয়া একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেন, সুপণ্ডিত উৎগীকর ছিলেন ইঁহাদের অগ্রণী। ১৯২৪ সালে তিনি পদত্যাগ করায় সুপ্রসিদ্ধ সুকঠঙ্কর মহাশয় তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্পাদনায় আজ পর্যন্ত 'মহাভারতে'র অধিকাংশ পর্বগুলির critical edition বা সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংস্করণগুলিতে মূল 'মহাভারতে'র শ্লোকসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে —সম্পাদকগণ এমন দাবী করেন নাই। তাঁহারা কতগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্যে মূলের কাছাকাছি পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি মোটামুটি এইরূপ। 'মহাভারতে'র মূল নির্ধারণ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দুই প্রকার উপাদানের সন্ধান পাইয়াছেন; যথা—মুখ্য

ও গৌণ। হস্তলিখিত পুঁথিগুলিই মুখ্য উপাদান। এই উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে ঃ—



কতক পুঁথিকে কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠীর মিশ্রিতরূপ দেখা যায়।

গৌণ উপাদান নানাবিধ, যথা ঃ—

(১) যবদ্বীপে রক্ষিত 'মহাভারত' (আঃ ১০ম শতক),

(২) তেলেগু কবি নন্নয়ভট্ট (১১শ শতক) ও তৎপরবর্তী কবিগণ কর্তৃক 'মহাভারতে'র adaptation,

(৩) কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'ভারতমঞ্জরী' (১১শ শতক),

(৪) আক্‌বরের রাজ্যকালে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ,

(৫) দেববোধ, অর্জুনমিশ্র, রত্নগর্ভ, নীলকণ্ঠ, বাদিরাজ ও চতুর্ভুজ প্রভৃতি টীকাকারের সাক্ষ্য।

'মহাভারতে'র মূল পাঠ উদ্ধার করিতে গিয়া সম্পাদকগণ সেই পাঠকে সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন, যাহা বিভিন্ন গোষ্ঠীর পুঁথিতে সম্পূর্ণ-রূপে একরকম। এইরূপ ঐক্যের অভাবে, উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় রূপে যে সমস্ত ঐক্য তাঁহারা দেখিয়াছেন, উহাদিগকে অধিকতর মূলানুগ বলিয়া ধরিয়াছেন। ঐ দুই রূপে বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁহারা কাশ্মীরীরূপের সাক্ষ্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছেন; কারণ, অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, কাশ্মীরী রূপ প্রাচীনতম, সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এবং সম্ভবতঃ অধিকতর মূলসদৃশ। কিন্তু, দাক্ষিণাত্য রূপ ও বাংলা-দেবনাগর রূপে ঐক্য থাকিলে উহা কাশ্মীরী রূপ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কয়েক পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পরে কোন কোন গবেষক এই সংস্করণের পাঠের নির্ভরযোগ্যতা সমর্থন করিয়াছেন। এই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াব ফলে যে সকল উপাখ্যান 'মহাভারতে' বর্ণিত বলিযা চির-

প্রসিদ্ধ, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে; যথা আদিপর্বে গণেশের উপাখ্যান, দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে নাটকীয় দৃশ্য; বিরাট ও ভীষ্মপর্বে দুর্গাস্তব, সভাপর্বে কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্র-সজ্জা; আরণ্যকপর্বে অর্জুনের প্রতি উর্বশীর কামাত্মক প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

'মহাভারতে'র মূল নির্ণয় ছাড়াও, ইহা অবলম্বনে নানরূপ গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। এজারটন (Edgerton) সভাপর্বের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, পদবিন্যাসপদ্ধতি, শব্দভাণ্ডার ও ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এস্. কে. দে উদ্যোগপর্ব অবলম্বনে কতকগুলি পদ এবং বাক্যাংশের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছেন, আর্. এন্. ডাণ্ডেকার এবং অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত 'মহাভারতে'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে, বৈদিক সংহিতা যুগেরও পূর্বে 'মহাভারতে'র উৎপত্তি হইয়াছিল। সি. এইচ্. শেখ (C. H. Shaikh) 'মহাভারতে'র আরবী ও ফার্সী অনুবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

উক্ত পুনা সংস্করণের ভিত্তিতে অনেক পণ্ডিত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাও করিয়াছেন। 'মহাভারতে' কারক, ধাতুরূপ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য, অপাণিনীয় প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কুল-কর্ণী, মেহেণ্ডেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'মহাভারতে'র আখ্যান উপাখ্যান সম্বন্ধেও নানারূপ গবেষণা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জনমেজয়ের সর্পসত্র প্রসঙ্গে ভিণ্টারনিৎস্ (Winternitz) এই উপাখ্যানের সঙ্গে অন্য কতক দেশের অনুরূপ উপাখ্যানের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়ত এই উপাখ্যানের মূলবস্তু প্রচলিত ছিল; উহা হইতে পরবর্তী কালে দেশে দেশে ইহা রূপান্তরিত হইয়াছিল। অথবা, ইহাও অসম্ভব নয় যে, সপ দমনের অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে ঐ সকল দেশে স্বাধীনভাবেই এই উপাখ্যান জন্মলাভ করিয়াছিল। 'মহাভারতে'র অণি মাণ্ডব্যের উপাখ্যানে উৎগীকর বাইবেলের যীশু খৃষ্টের উপাখ্যানেরই প্রতিফলন আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত 'মহাভারতে'র বিশ্ব-বর্ণনার (Cosmography) সহিত পুরাণোক্ত বিশ্ববর্ণনার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'মহাভারতে'র বর্ণনার মূল 'পদ্ম-পুরাণ'। জি. এইচ্. ভাট দ্রৌপদীহরণ আখ্যান যে প্রক্ষিপ্ত তাহার আলো-চনা করিয়াছেন।

'মহাভারতে'র পর্বসংগ্রহে লিখিত শ্লোকসংখ্যা অনেক গবেষকের আলোচ্য বিষয়; এই সম্বন্ধে নানামত প্রকাশিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয়ের চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত ধারণা, এই যুদ্ধ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। পি.

সি· সেনগুপ্ত 'মহাভারতে' প্রাপ্ত জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া অনুমান করেন যে, এই যুদ্ধের কাল খৃঃ পূঃ ২৪৪৯ অব্দ। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের ঐকমত্য দেখা যায় না। খৃঃ পূঃ ১৪০০, ১৯৩১, ৩০১৬ প্রভৃতি নানা অব্দই বিভিন্ন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন।

'মহাভারতো'ক্ত বিশ্ববর্ণনা ও ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য হপ্‌কিন্স (Hopkins), রন্নো (Ronnow) এবং এইচ্· সি· রায়চৌধুরী। 'মহাভারতে' যে সকল উপজাতির উল্লেখ আছে, তাহাদের সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।

'মহাভারতে'র রচয়িতা, কাব্যগুণ, দর্শন প্রভৃতি বিষয় কতক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'মহাভারতে'র বিবর্তন সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভিণ্টারনিৎস ও ওল্ডেনবার্গ এর নাম অগ্রগণ্য।

এই মহাকাব্যে প্রতিফলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিত্র বহু পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায়চৌধুরী, কে· জি· গোস্বামী, এন্ সি, ব্যানার্জি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লছমীধর প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সূর্যের ও কৌরবগণ অন্ধকারের প্রতীক। দ্রৌপদীর বিবাহ সূর্যের সহিত উষার বিবাহরূপ বৈদিক আখ্যানেরই রূপান্তর। অন্ধকারের রূপনাশ ও উষার জয়ই প্রতিফলিত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে।

'মহাভারতে'র 'কৃষ্ণতত্ত্ব' বিবিধ পণ্ডিতের আলোচ্য বিষয়। 'মহাভারতে'র কৃষ্ণকে কেহ কেহ পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত এই যে, 'মহাভারতী'য় কৃষ্ণকে সারতঃ মানবিক রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, কিন্তু পৌরাণিক কৃষ্ণ দিব্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বৈদিক ও এপিক কৃষ্ণ অভিন্ন, কিন্তু, অনেকের মতে, ইঁহারা ভিন্ন। কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য তদ্‌পত্রিকার, ওয়ালটার রুবেন (Walter Ruben), কিরফেল (Kirfel), দীক্ষিতর, ননীমাধব চৌধুরী, এস্· কে· দে প্রভৃতি।

সোরেন্‌সেন (Sorensen) 'মহাভারতে'র একটি নির্দেশক (Index) প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে পর্ব ও অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসারও দেওয়া হইয়াছে। Analysis and Index of the Mahabharata নামক গ্রন্থে রাইস্ (Rice) 'মহাভারতে'র সারাংশ, নামসূচী ও বিষয়সূচী দিয়াছেন।

ভগবদ্গীতা

'ভগবদ্গীতা'র বহু সংস্করণ এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য নানা ভাষায় অনুবাদ ছাড়াও, ইহার সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা হইতেছে। ইহার মূল সম্বন্ধে শ্রেডারের (Schrader) কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি গীতার কাশ্মীরী-রূপের প্রথম আবিষ্কারক। তাঁহার মতে, শঙ্করাচার্য অনুসৃত রূপ হইতে

কাশ্মীরী রূপ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। গীতার প্রচলিত মূল হইতে কাশ্মীরী রূপের প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত রূপে কতক শ্লোক আছে যেগুলি পূর্বোক্ত রূপে নাই। ইহা ছাড়া, কাশ্মীরী রূপে অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়।

স্ক্রেডারের বিপরীত মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য বেলভ্যালকার। অন্যান্য যুক্তির মধ্যে বেলভ্যালকারের একটি যুক্তি এই যে, গীতার প্রচলিতরূপের সহিত তুলনায় দেখা যায়, কাশ্মীরী রূপে মূলের ব্যাকরণগত ও পদবিন্যাসগত প্রমাদগুলিকে শুদ্ধ করিবার প্রবণতা রহিয়াছে। কিন্তু, মূল নির্ধারণের অন্যতম পদ্ধতি অনুসারে ব্যাকরণগত প্রমাদবহুল পাঠগুলি অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বেলভ্যলকারের সিদ্ধান্ত এই যে, অধুনা উপলভ্যমান পুঁথিসমূহের সাক্ষ্য অনুসারে শঙ্করভাষ্যে অনুসৃত রূপই গীতার প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রূপ।

গীতা আদি মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল অথবা ইহা পরবর্তীকালের সংযোজন—এই সমস্যা সম্বন্ধে অনেকের চিন্তা করা সত্ত্বেও ইহার চূড়ান্ত সমাধান এখনও হয় নাই।

Essays on the Gita নামক গ্রন্থে অরবিন্দ ঘোষের প্রতিপাদ্য এই যে, গ্রন্থটির উদ্দেশ্য দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নহে; ইহা আধ্যাত্মিক জীবনের একটি সহায়ক গ্রন্থ। অনিলবরণ রায় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' গ্রন্থে এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

আদি গীতার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে স্ক্রেডার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে গ্রন্থটি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থে ১৩৩টি মাত্র শ্লোক ছিল। দ্বিতীয় স্তরে নানা মতবাদ সংক্রান্ত শ্লোক সন্নিবেশিত হয়। তৃতীয় স্তরে ইহাতে ব্যাখ্যানাত্মক শ্লোক প্রভৃতি সংযোজিত হয়। বেলভ্যালকার মনে করেন, গীতা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়; ইহাতে পূর্বোক্ত স্তরভাগ কল্পনামাত্র।

গীতার নৈতিক শিক্ষা (ethical teaching) অনেকের গবেষণার বিষয়। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পি. এন্. শ্রীনিবাসাচারী গীতোক্ত নৈতিক শিক্ষার মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতার রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। কাপেন্টিয়ারের মতে, আদি গীতা (২য় হইতে ১১শ অধ্যায়) খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ের রচনা এবং পরবর্তী অংশ (১২শ হইতে ১৮শ) কয়েক শতাব্দী পরে রচিত। সুশীল দের মতে, ভক্তিতত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে গীতা প্রাচীনতম।

পরবর্তী গ্রন্থসমূহের উপর গীতার প্রভাব কোন কোন পণ্ডিতের আলোচ্য বিষয়। রাঘবন বলিয়াছেন যে, 'ভাগবতপুরাণে'র রচয়িতা গীতার কাশ্মীরী রূপের সহিত পরিচিত ছিলেন না, প্রচলিত রূপটিই তিনি জানিতেন। 'যোগবাসিষ্ঠ' ও 'গীতার' মধ্যে কতক স্থলে পদগত ও ভাবগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'যোগাবাসিষ্ঠ'কার গীতার প্রচলিত ও কাশ্মীরী রূপের মিশ্রিত রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাক্-শঙ্কর যুগের কতক গ্রন্থে গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের প্রতি পি. কে. গোড়ে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

Is Gita a Gospel of War নামক প্রবন্ধে টি. এম্. পি. মহাদেবন অহিংসাবাদের সাহায্যে গীতা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Two fold Path in the Gita নামক প্রবন্ধে তিনি, শঙ্করের মতানুসরণক্রমে, প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, গীতার জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ যুগপৎ এক ব্যক্তির জন্য নহে, বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য। কে. এম্. মুন্সীর মতে, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের দ্বারাই মানুষ জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই ত্রিবিধ মার্গের সমন্বয়ের ফলেই প্রাচ্যে শঙ্করাচার্য, চৈতন্য ও দয়ানন্দ এবং প্রতীচ্যে ক্যান্ট, ক্যালভিন ও সেন্ট্ অগাষ্টিন প্রভৃতি মহাপুরুষ উন্নত জীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তিনটির সমন্বয় ঘটে নাই বলিয়াই বেকন্, নেপোলিয়ান ও হিট্লার প্রভৃতি অসামান্য শক্তির অধিকারী হইলেও তাঁহাদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

'ভগবদ্গীতা' পাঠের সহায়ক কিছু গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। কির্ফেল্ (Kirfel) Verse-Index to the Bhagavadgita গ্রন্থে গীতার শ্লোকগুলির প্রতিটি পাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। Critical Word-index to the Bhagavadgita গ্রন্থে পি. সি. দিবান্জী গীতার শব্দকোষ প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতালঘুকোষ' নামক গ্রন্থে এল্. আর্. গোখেল্ গীতার পদসমূহের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, শঙ্করের অর্থ এবং মারাঠী, ইংরাজী ও হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়াছেন।

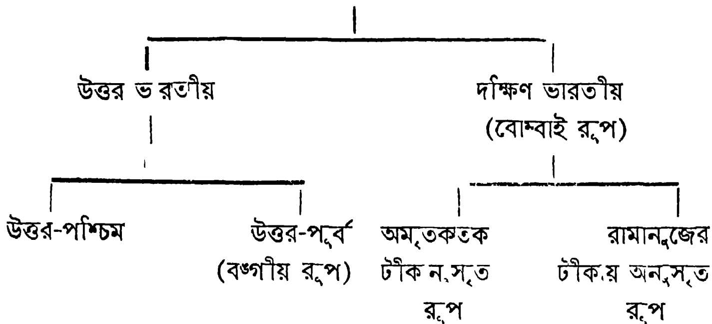
The Bhagavadgita and Modern Scholarship নামক গ্রন্থে এস্. সি. রায় সর্বপ্রথম ম্যাক্স্মুলার, হপ্কিন্স্, বার্থ্, হামবোল্ড, বেবর হল্জ্ম্যান্. স্রেডার, ভিন্টারনিৎস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ও ভাণ্ডারকর, বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক প্রভৃতি ভারতীয় মনীষিগণ কর্তৃক গীতা ও মহাভারতের উপর যে সকল গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে তাহাদের বিশদ সমালোচনার চেষ্টা করিয়াছেন।

এস্. এন্. এল্ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে, 'ভগবদ্গীতা'র রচয়িতা পতঞ্জলির যোগসূত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা

না হইলেও এই উভয় গ্রন্থের যোগপদ্ধতিতে ও যোগের উদ্দেশ্যে মৌল সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

রামায়ণ

যেমন 'মহাভারতে'র ক্ষেত্রে, তেমনই 'রামায়ণের'ও আদিম রূপ নির্ধারণের সমস্যা পণ্ডিতগণের মন আলোড়িত করিয়াছে। রুবেন Studien zur Text geschihte des Ramayana নামক গ্রন্থে 'রামায়ণে'র এই সমস্যা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে, 'রামায়ণের' পুঁথিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা 'মহাভারতে'র পুঁথিসমূহেরই ন্যায়। 'রামায়ণের' পুঁথিগুলিকে নিম্নলিখিত গোষ্ঠীভুক্ত করা চলেঃ—



লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজ হইতে 'রামায়ণে'র উত্তর-পশ্চিম রূপের একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ (critical edition) প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ হইতে বঙ্গীয় রূপ প্রকাশিত হইতেছে। আর. নারায়ণস্বামী আয়ার দক্ষিণ ভারতীয় রূপের সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারতে'র আঞ্চলিক রূপের সংস্করণকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যায় না—এ কথা সুকৃঠংকর স্পষ্টই বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, সমস্ত পুঁথিসমূহের সাক্ষ্যের তুলনামূলক বিচার না করা পর্যন্ত কোন্ অংশ মূল এবং কতটুকু প্রক্ষিপ্ত তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই রঘুবীর এবং চন্দেরকর (পুনার শ্রীরামায়ণ সংশোধন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা) ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউটের 'মহাভারতে'র সংস্করণের অনুসরণে 'রামায়ণে'র সংস্করণ প্রস্তুতিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বরোদার এম্. এস্. ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত ওরিয়েন্ট্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটও এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

'রামায়ণে'র কাব্যোৎকর্ষ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিত্র, চরিত্রসমালোচনা, ভৌগোলিক তথ্য, রচনাকাল প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিভিন্ন

গবেষক আলোচনা করিয়াছেন। এখানে এইরূপ প্রধান কতক গ্রন্থের উল্লেখ করা হইতেছে। 'মহারাষ্ট্রীয়ে'র 'রামায়ণ সমালোচনা' (মারাঠী ভাষায়) উল্লিখিত অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দীনেশ সেন বাংলা দেশের 'রামায়ণ'গুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দশরথজাতক, রাবণ সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনী ও মহবীর-পূজা সংক্রান্ত আখ্যান উপাখ্যান প্রভৃতির সংমিশ্রণে ইহারা রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিই মূল রামায়ণের অনুবাদ নহে। প্রত্যেক রচয়িতই নিজ নিজ চিন্তাধরা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে প্রচলিত কাহিনীর সাহায্যে বাংলা রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। এমন কি, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মতবাদ এবং ভক্তিতত্ত্বও কোন কোন বাংলা 'রামায়ণে' অনুপ্রবেশ করিয়াছে। Beowulf and the Ramayana গ্রন্থে আই. এস্. পিটার ভারতীয় ও অ্যাংগ্লো-সাক্সন (Anglo-Saxon) এপিকের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। পি. সি. ধর্মা The Ramayana Polity নামক গ্রন্থে 'রামায়ণে'র রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনাক্রমে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তদানীন্তন রাজনীতি একেবারে আদিম অবস্থায় ছিল না, পরবর্তী কালের অনেক কিছুর সূচনা 'রামায়ণে' রহিয়াছে। Ramayana and Lanka নামক গ্রন্থে পরমশিব আয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'রামায়ণের' লঙ্কা সিংহল হইতে পারে না; ইহা মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের নিকটবর্তী একটি স্থান১। তিনি মনে করেন, উবরকৃষ্ণমৃত্তিকাবিশিষ্ট, উচ্চভূমিস্থিত, সমতল ও জনবহুল জনস্থান জয়ের জন্য আর্যগণের সহিত গন্দ জাতির সংঘর্ষের কাহিনীই 'রামায়ণের মূল বিষয়বস্তু।

সি. বুল্কে কর্তৃক হিন্দীতে রচিত 'রামকথা' 'রামায়ণ' সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রথমতঃ তিনি প্রাচীন যুগের রামকথাসাহিত্য নিম্নলিখিত রূপে আলোচনা করিয়াছেনঃ—

(১) বৈদিক সাহিত্য ও রামায়ণ,
(২) বাল্মীকির রামায়ণ,
(৩) মহাভারতের রামকথা,
(৪) বৌদ্ধসাহিত্য,
(৫) জৈন সাহিত্য।

দ্বিতীয়তঃ, রামকথার উৎপত্তি নিম্নলিখিত ভাবে আলোচিত হইয়াছেঃ—

(১) দশরথ জাতক,

১. লঙ্কা যে মধ্যভারতের কোন স্থানেরই নাম ছিল—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন কিরে, (Locatin of Lanka নামক গ্রন্থে), হীরালাল (Jha Comm. Volume), জে. সি. ঘোষ (Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, XIX) প্রভৃতি।

(২) রামকথার উৎস,

(৩) বাল্মীকির 'রামায়ণে' প্রক্ষিপ্ত অংশ,

(৪) রামকথার প্রাথমিক ক্রমবিকাশ।

ইহার পরে, পরবর্তী কালের রামকথার নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা করা হইয়াছে ঃ—

(১) সংস্কৃত ধর্মসাহিত্যে রামকথা,

(২) সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে রামকথা,

(৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে রামকথা,

(৪) তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দো-চীন ও ইউরোপে রামকথা।

Bibliography of the Ramayana গ্রন্থে এন্. এ. গোরে 'রামায়ণে'র সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংস্করণ, অনুবাদ, সংক্ষিপ্তসার এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রামায়ণ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'রামায়ণত্রিবেণী' গ্রন্থে কে. চন্দ্রশেখরন বাল্মীকির 'রামায়ণ', কম্বনের তামিল 'রামায়ণ' ও তুলসীদাসের হিন্দী 'রামায়ণে'র কবিগণের অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, সীতাস্বয়ংবর, বিভীষণ চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত সংস্করণ এবং গ্রন্থ ছাড়াও অনেকে বিভিন্ন পত্রিকায় 'রামায়ণ' সম্বন্ধে গবেষণাত্মক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে উহাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। Journal of the Greater India Society-তে (৩।১) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এম্. ঘোষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন জাভা ভাষার 'রামায়ণ' অংশতঃ অনুবাদ ও অংশতঃ 'ভট্টিকাব্য' অবলম্বনে রচিত।

জৈন 'রামায়ণে'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছেন নরসিংহাচার Indian Historical Quarterly-তে (XV)।

'রামায়ণে'র ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছেন নীলমাধব সেন বহু প্রবন্ধে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাম করা যায় Journal of Oriental Institute, Baroda (১, পৃঃ ১১৮—১২৯), ঐ (পৃঃ ৩০১—৩০৭), Poona Orientalist (১৪, পৃঃ ৮৯—১০৬)।

জি. ডব্লিউ. গার্ণার (G. W. Gurner) অশ্বঘোষের উপর 'রামায়ণে'র প্রভাব আলোচনা করিয়াছেন (Journal of Asiatic Soc. of Bengal, XXIII. iii)। পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যের ঋতুবর্ণনার উপর 'রামায়ণে'র ঋতুবর্ণনার প্রভাব তিনি আলোচনা করিয়াছেন (উক্ত Journal, XXVI, i)।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'রামায়ণে'র শব্দালংকার যমক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (Journal of Oriental Institute, I, পৃঃ ৮০-৮৫, ১৩০-১৩৭)।

বাল্মীকির 'রামায়ণে'র সহিত কালিদাসের পরিচয় ছিল কিনা এই সম্বন্ধে অনেকে চিন্তা করিয়াছেন। জে. জে. পান্ড্য উক্ত রামায়ণের সহিত কালিদাসের পরিচয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (Journal of Oriental Institute, I, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৫)।

'রামায়ণের' বানর ও রাক্ষস সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন১ যে, ইহারা বস্তুতঃ ছিল মধ্যভারতের অমরকন্টক নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী অধিবাসী।

বেবর মনে করেন, 'রামায়ণে'র শম্বূককাহিনী করমণ্ডেল উপকূলে খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের বসতিস্থাপনকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। প্রিঞ্জ (Printz) এই মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং 'পদ্মপুরাণ', 'মহাভারত' প্রভৃতি নানাগ্রন্থে এই কাহিনীর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন২।

পি. সি. ধর্মা 'রামায়ণে'র সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন৩।

'রামায়ণে'র মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এস্. এল্. হোরা (Journal of Asiatic Society, L. XVIII. ii)। 'রামায়ণে' যে সকল জন্তুজানোয়ারের নাম পাওয়া যায়, সেগুলি শিবদাস চৌধুরী সংগ্রহ করিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, XXVIII, XXIX)।

পুরাণ

বিস্তৃত পুরাণসাহিত্যে গবেষণার ইতিহাসে পার্জিটারের (Pargiter) নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার যোগ্য। Ancient Indian Historical Tradition তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। গ্রন্থকার অসীম ধৈর্যসহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিযা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, হিমালয় অঞ্চলের মধ্যভাগে আর্যগণের আদিবাস ছিল এবং তাঁহারা খৃঃ পূঃ ২০৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পার্জিটার আরও বলেন যে, ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটি ঐতিহ্যধাবা বর্তমান ছিল। ব্রাহ্মণগণের ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ আছে বৈদিক সাহিত্যে এবং এপিক্ ও পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায় ক্ষত্রিয়-ঐতিহ্য। পার্জিটারের এই সমস্ত মত কে. এম্. মুন্সী, এন্. দত্ত, ঘুর্যে (Ghurye), দীক্ষিতর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানা যুক্তি বলে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৌরাণিক সাহিত্যের বর্তমান সংস্কৃত রূপ মূল

১. কিবে (Festcarift Thomas), হীরালাল (Jha Comm. Volume) ইত্যাদি।

২. Zeitchrift fur Indologic and Iranistik, Leipzig, V. iii.

৩. যথা, Social Life in the Ramayana (Quarterly Journal of Mythic Society, Bangalore, XXVIII), Some Customs and Beliefs from the Ramayana (Poona Orientalist, II).

প্রাকৃত রূপের পরবর্তী—পার্জিটারের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন পুসলকার।

Das Purana Pancalaksana নামক গ্রন্থে কির্‌ফেল (Kirfel পুরাণের চিরপ্রচলিত পাঁচটি লক্ষণের অন্তর্গত মূল শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়াছেন।

পুরাণ ও স্মৃতির পারস্পারিক সম্বন্ধ অনেক পণ্ডিতের গবেষণার বিষয়। মেয়ার (Meyer) Gesetzbuch und Purana গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাণের ধর্মশাস্ত্রসংক্রান্ত অংশগুলি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর্. সি. হাজরা Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs নামক গ্রন্থে পৌরাণিক সাহিত্যের ধর্মশাস্ত্রসংক্রান্ত অংশগুলির সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উক্ত অংশগুলির সংকলনে বা রচনায় দুইটি স্তর লক্ষণীয়। প্রথম স্তরে (খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতক) মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিসংহিতার বিষয়গুলি পুরাণে স্থান লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ ৬০০ খৃষ্টাব্দের পরে, দান, যজ্ঞ, হোম, তীর্থ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পুরাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই পর্যন্ত গ্রন্থটির পূর্বার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধে গ্রন্থকার প্রাক্-পুরাণ ও পুরাণোত্তর যুগের হিন্দুসমাজের একটি চিত্র অংকন করিয়াছেন।

‘পুরাণ-প্রবেশ’-এ গিরীন্দ্রশেখর বসু পুরাণোক্ত চরিত্রযুগের কালনিরূপণ ও কল্প প্রভৃতির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডি. আর্. মনকড়ের Puranic chronology-তে পুরাণোক্ত নানা ব্যাপারের কাল-নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভাগবতধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক উল্লেখগুলি বিচারবিশ্লেষণ করিয়াছেন এইচ্. সি. রায়চৌধুরী।

‘ভাগবতপুরাণ’ বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ ছাড়াও ইহার সমস্ত আখ্যানগুলির সূচী প্রস্তুত হইয়াছে। এই পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির নানারূপ আলোচনাও হইয়াছে।

কতগুলি পুরাণ অবলম্বনে জগদীশ শাস্ত্রী পুরাণোক্ত রাজনীতির আলোচনা করিয়াছেন Political Thought in the Puranas নামক গ্রন্থে। ‘বায়ুপুরাণের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ডি. আর্. পাতিলের Cultural History from the Vayu-Purana নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

দীক্ষিতের Purana Index বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য ও ভাগবত এই

পাঁচটি পুরাণ অবলম্বনে প্রস্তুত হইয়াছে; ইহাতে প্রধানতঃ নাম ও বিষয়-সূচী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ট্যাণ্ডনের Purana- visaya-samanukra-manika-তে পুরাণের বিভিন্ন বিষয়ের সূচী আছে।

আর্. সি. হাজ্‌রা Studies in Upapuranas গ্রন্থে উপপুরাণগুলির নাম, বিষয়বস্তু, বচনাকাল ও এই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পুরাণ সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রধান গবেষণা গ্রন্থগুলি ছাড়াও, পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য, প্লাবন-আখ্যান, দর্শন, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শৈব ধর্ম, ঐতিহাসিক মূল্য, ক্রমবিকাশের কাল, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভৌগোলিক বিবরণ, অবতারবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে।

(গ) ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য

সাধারণতঃ পাণিনির (আঃ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক) পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যকে ক্লাসিক্যাল আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই সাহিত্যের শাখা প্রশাখা অনন্ত। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত গবেষণামূলক চিন্তাধারা দেখা যায়, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে একখানি বিশাল গ্রন্থের পরিসরও যথেষ্ট নহে। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে কাব্য, নাটক, ও অলংকারশাস্ত্র—এই তিনটি বিষয়ে গবেষণার ধারা আমরা লক্ষ্য করিব।

পদ্য কাব্যের ক্ষেত্রে নানা স্থানে রক্ষিত পুঁথির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাকাব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

রুদ্র কবির 'রাষ্ট্রৌঢ়বংশ', বালচন্দ্র সূরির 'বসন্তবিলাস', অভিনন্দের 'রামচরিত, যজ্ঞনারায়ণ দীক্ষিতের 'সাহিত্যরত্নাকর', জয়াঙ্কের 'পৃথ্বীরাজ-বিজয় মহাকাব্য'।

মহাকবি কালিদাস, ভারবি, ভট্টি, কুমারদাস ও মাঘ প্রভৃতির জন্মস্থান ও জীবনকাল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। ভট্টি বৎসভট্টি বা ভর্তৃহরির সঙ্গে অভিন্ন কিনা এবং ভট্টি ভামহের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী —এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। মহিলা কবিগণের বহু অজ্ঞাতপূর্ব রচনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন প্রধানতঃ জে. বি. চৌধুরী। কাব্য সাহিত্যে মুসলমানের দানের প্রতিও তিনি বিদগ্ধসমাজের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সংস্কৃত দূতকাব্যসমূহের ধারা-বাহিক আলোচনা করিয়াছেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও জে. বি. চৌধুরী।

কোষকাব্যের ক্ষেত্রে 'সুভাষিতরত্নকোষ'-এর প্রকাশন একটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। F. W. Thomas যে গ্রন্থকে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পূর্ণাঙ্গ পুঁথির সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে,

তাহারই প্রকৃত নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ' এবং ইহা উত্তরবঙ্গের জগদ্দল-বিহারবাসী বিদ্যাকরের রচিত। বিদ্যাকরের জীবনকাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

গদ্য কাব্যে 'পঞ্চতন্ত্রে'র মূল, বিভিন্ন রূপ ও রচনাকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করিয়াছেন। 'দশমকুমারচরিতে'র প্রণেতা দণ্ডীই 'অবন্তি-সুন্দরীকথা'র রচয়িতা কিনা, এই সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে।

'বাসবদত্তা'-রচয়িতা সুবন্ধু ও আলঙ্কারিক ভামহের জীবনকালের পৌর্বাপর্য কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। আর্. ভি কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেন যে, বাণভট্ট সুবন্ধুর পূর্ববর্তী কবি; কিন্তু, এস্. পি. ভট্টাচার্য ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। মনোমোহন ঘোষের মতে সুবন্ধু ছিলেন বাঙ্গালী। এই কবির কাল ও পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ. রঙ্গস্বামী শাস্ত্রীও করিয়াছেন।

যে সকল নাট্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ঃ—

> প্রহ্লাদনের 'পার্থপরাক্রম', বৎসরাজের 'রূপকষট্ক', যশঃপালের 'মহাপরাজয়', জয়সিংহসূরির 'হম্মীরমর্দন', রামচন্দ্রসূরির 'নলবিলাস', রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'।

এম্. আর. কবি ও রামনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্জকানাম্নী নারী-কবি রচিত 'কৌমুদীমহোৎসব' নামক নাটকের কাল ও ইহাতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভাস-সমস্যা নাট্যসাহিত্যে গবেষণার একটি প্রধান বিষয়। গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দ্রামে (Trivandrum) অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত তেরখানি নাট্যগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া নানা যুক্তি প্রমাণবলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গ্রন্থগুলি একই ব্যক্তির রচনা এবং সেই ব্যক্তি ভাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন। পারঞ্জপে, কীথ্, টমাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। কানে, বার্নেট ও র্যাপ্ডি বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। সুক্‌ঠংকর ও ভিন্টারনিৎস্ প্রভৃতি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন; ইঁহাদের মতে, উপলভ্যমান তথ্যাবলী হইতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভাস-সমস্যা সম্বন্ধে পুসলকারের Bhasa : A study গ্রন্থ বিস্তৃত ও প্রামাণ্য।

কালিদাসের কাল, পরিচয়, কবিপ্রতিভা প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধাদি রচিত হইয়াছে।

এস্. কে. দে ও এস্. পি. ভট্টাচার্য হনূমৎকৃত 'মহানাটক'-সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় বিবিধ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অলঙ্কারশাস্ত্রের অনেক মূলগ্রন্থও প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস ও কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের ঐতিহাসিক ধারা আলোচনা করিয়াছেন এস্. কে. দে ও পি. ভি. কানে। এস্. কে দে একটি প্রবন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। পি. সি. লাহিড়ী অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতি ও গুণ সম্বন্ধে ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভি. রাঘবনের Number of Rasas ও Some Concepts of the Alankarasastra দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় এস্. পি. ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের নানা গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও টীকাকারগণের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন পি. কে. গোড়ে ও ভি. রাঘবন।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' প্রকাশিত হইবার পরে ইহার কাল, প্রাচীন রঙ্গা-লয়ের বর্ণনা, বিবিধপ্রকার নাট্যরচনা প্রভৃতি নানাবিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভরত ও আদিভরত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

শব্দকোষ[১]

অংশ (স)—কাহারও কাহারও মতে, বাদী স্বরের নাম। মতান্তরে, যে স্বরে রাগের পূর্ণরূপ অংশিত বা খণ্ডিত হয় তাহাই অংশ।

অকুল (অ)—লম্বকর্ণ ও জটাবিশিষ্ট অশ্ব।

অক্ষিমালা (অ)—মশকদংশাদি নিবারণকল্পে অশ্বনেত্রের চর্মা-বরণ।

অচ্ (ব্যা)—একটি প্রত্যাহার; সমস্ত স্বরবর্ণ এই প্রত্যাহারের অন্তর্গত।

অতিক্রান্ত (গ)—উত্তেজিত অবস্থায় দানবারিস্রবণকারী হস্তীর নাম।

অধিকার সূত্র (ব্যা)—Leading rule। যে সূত্র পরবর্তী সূত্র বা সূত্রসমূহকে পূর্ণাঙ্গ করিতে সহায়তা করে; যেমন, 'কারকে' (পাণিনি—১।৪।২৩) সূত্রটি একটি অধিকারসূত্র।

অনুবাদী (স)—যে স্বর সংবাদী স্বরকে স্ফুটতর করে, তাহার নাম 'অনুবাদী'। আধুনিক মতে, বাদী ও সংবাদী স্বর ভিন্ন রাগে প্রযোজ্য স্বরমাত্রই অনুবাদী।

অনুবৃত্তি (ব্যা)—কোন সূত্র বা তাহার কোন অংশকে পরবর্তী কোন সূত্রের সহিত যোগ করিয়া সম্পূর্ণ অর্থ করিতে হইলে পূর্ববর্তী সূত্র বা তদীয় অংশের অনুবৃত্তি আছে, বলা হয়। যথা—'অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম' (পাণিনি ১।৪।৪৬)—এই সূত্রের 'কর্ম' পদটির অনুবৃত্তি পরবর্তী 'অভিনিবিশশ্চ' সূত্রেও আছে।

অনূপ (উ)—জলপূর্ণ ভূমি।

অবগ্রহ (গ)—হস্তিমুখে 'বিন্দু'র ঠিক নিম্নভাগে স্থানবিশেষ।

আতোদ্য (স)—আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের নাম; যেমন, মৃদঙ্গ। Percussion instrument.

আপাত (গ)—হাতী ধরিবার অন্যতম পদ্ধতি।

আম্রেড়িত (ব্যা)—দ্বিরুক্ত শব্দের পরভাগের নাম; যথা, উপর্যু-পরি।

আবর্ত (কৃ)—একপ্রকার মেঘ।

---

১. বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত শাস্ত্রাদিতে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান শব্দগুলি, অর্থসহ, এখানে সংগৃহীত হইল। শব্দগুলির পার্শ্বে শাস্ত্রসমূহের নামের নিম্নলিখিতরূপ সঙ্কেত লিখিত হইল ঃ—

অ—অশ্বশাস্ত্র,	না—নাট্যশাস্ত্র,
উ—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা,	বা—বাস্তুবিদ্যা,
কা—কামশাস্ত্র,	ব্যা—ব্যাকরণ,
কৃ—কৃষিশাস্ত্র,	শ্যৈ—শ্যৈনিকশাস্ত্র,
গ—গজশাস্ত্র,	স—সঙ্গীতশাস্ত্র।

আলাপ (স)—"কথা ও তাল বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি নিরর্থক শব্দ উচ্চারণ পূর্বক রাগের রূপ দেখানোর পদ্ধতি।" (ইন্দিরা দেবী)

আশ্বীনা (শ্যৈ)—একপ্রকার মৃগয়ার নাম। ইহাতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মৃগয়া করা হয়।

ঈষা (কৃ)—লাঙগলের অংশবিশেষ।

উৎসগ (ব্যা)—সাধারণ বিধি (General rule)।

উপধা (ব্যা)—'অলোহন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা' (পাণিনি ১।১।৬৫) কোন পদের উপান্ত্যপদের নাম।

উপপদ (ব্যা)—তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্ (পা ৩।১।৯২) এই সূত্র হইতে অষ্টাধ্যায়ীর তৃতীয় পাদের সমাপ্তি পর্যন্ত সপ্তমী বিভক্তিদ্বারা সূচিত শব্দ। যেমন, কর্মণ্যন্ সূত্রে 'কর্মণি' এই সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা সূচিত শব্দ উপপদ।

'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী'—এখানে উপপদ বলিতে নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি অব্যয়পদকে বুঝায়।

উপসর্জন (ব্যা)—প্রথমানির্দিষ্টং সমাস উপসর্জনম্। (পা ১।২।৪৩)

সমাসসূত্রে প্রথমা বিভক্তিদ্বারা সূচিত পদের নাম। 'উপসর্জন' সংজ্ঞক পদ সমাসের পূর্বপদ হয়। একবিভক্তি চাপূর্বনিপাতে (পা ১।২।৪৪) সমাসের বিগ্রহবাক্যে যে পদ সর্বদা এক-বিভক্তিতে থাকে, তাহাকেও উপসর্জন বলা হয়; এই প্রকার উপসর্জন সমাসে পূর্বপদ হয় না।

উপসপ (গ)—জন্ম হইতে তৃতীয় বর্ষে হস্তীর নাম।

ওষধি (উ)—যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়।

ঔড়ব (স)—এক প্রকার রাগের নাম। পাঁচটি স্বরের দ্বারা রাগ এই নাম প্রাপ্ত হয়।

কঞ্চুকী (না)—সর্বকার্যে নিপুণ, নানা গুণসম্পন্ন ও অন্তঃপুর-চারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলা হয় কঞ্চুকী।

ঐ (অ)—যে অশ্বের স্কন্ধে, বক্ষে ও বাহুদ্বয়ে দেহ অপেক্ষা ভিন্ন বর্ণ থাকে।

কট্টন (কৃ)—বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর আগাছা উপড়াইয়া জমি সমতল করিবার প্রণালীর নাম।

কলভ (গ)—জন্ম হইতে পঞ্চম বর্ষে, কাহারও কাহারও মতে ত্রিংশ-বর্ষে, হস্তীর নাম। অল্পবয়স্ক হস্তী মাত্রকেও এই শব্দে বুঝান হয়।

কান্ডারণা (স)—নিপুণভাবে শোভিত ও বিবিধ গমকযুক্ত তারস্থানের দ্রুততার নাম।

কল্যাণ (গ)—জন্ম হইতে চতুর্থ দশকে হস্তীর নাম।

কাল্যা (শ্যৈ)—নানারূপ কৌশলে মৃগয়ার নাম।

কুম্ভ (গ)—হস্তীর ললাটোপরি উন্নত স্থান।

কূটতান (স)—যে সকল সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মূর্ছনাতে স্বরগুলি অপক্রমে উচ্চারিত হয়, উহারা কূটতান নামে অভিহিত।

কৃত্য (ব্যা)—তব্য, অনীয়র্‌, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্‌—এই পাঁচটি কৃৎপ্রত্যয়ের নাম।

কোকাহ (অ)—শ্বেতবর্ণ অশ্বের নাম।

ক্ষুপ (উ)—যে উদ্ভিদের মূল ও শাখা হ্রস্ব।

খুরত্র (অ)—ঘোড়ার খুরের নাল।

গর্ভগৃহ (বা)—ইষ্টকনির্মিত গৃহের কোঠাঘর। ইহা নানাবিধ; যথা —শিবিকাগর্ভ, নালিকাগর্ভ, হর্ম্যগর্ভ ইত্যাদি।

গিরিচর (গ)—এক প্রকার হস্তী। ইহা অত্যন্ত বলশালী, যুদ্ধ-নিপুণ ও অগম্যস্থানে গমন-পটু।

গীত (স)—চিত্তাকর্ষক স্বর সমা-বেশের নাম। সুতরাং, 'গীত' শব্দে কথাযুক্ত গান নাও হইতে পারে।

গুণ (ব্যা)—অদেঙ্‌ গুণঃ (পাণিনি—১।১।২)। ঋ, ৠ স্থানে অর্‌; ঌ স্থানে অল্‌, ই, ঈ স্থানে এ এবং উ, ঊ স্থানে ও হওয়াকে গুণ বলা হয়।

গোপুর (বা)—নগরের দ্বার। কাল-ক্রমে এই শব্দে মন্দিরের প্রবেশ-পথকে বুঝান হইতে থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় বাস্তুশিল্পের গ্রন্থে বিশিষ্ট এক প্রকার প্রবেশ-পথের নাম 'গোপুর'।

গ্রহ (স)—ভরতের মতে, ইহা অংশেরই নামান্তর। পরবর্তী লেখকগণের মতে, ইহা রাগের অপ্রধান স্বর।

গ্রাম (স)—একপ্রকার ঠাট (Scale)। শ্রুতি ও স্বরের সমাবেশের নাম গ্রাম। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট ব্যবধানে অবস্থিত সপ্তস্বরের নাম।

ঘি (ব্যা)—শেষো ঘ্যসখি (পাণিনি ১।৪।৭)। সখি ও পতি ভিন্ন অনদীসংজ্ঞক ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দ। সমাসের উত্তরপদে 'পতি' শব্দ থাকিলে ঐ সমাসবদ্ধ পদও ঘি-সংজ্ঞক।

চিক্কা (গ)—হস্তিগাত্রের মধ্যভাগে স্থানবিশেষ।

চূলিকা (গ)—গজের কর্ণমূল।

চৈত্য (বা)—প্রাচীন যুগে অগ্নিবেদী, পবিত্র বৃক্ষ এবং দেউল বা প্রাসাদাদি বুঝাইতে এই শব্দের প্রয়োগ হইত। পরে, চিতার উপরে নির্মিত মঠ এই শব্দ-দ্বারা অভিহিত হইত। তৎপর এই শব্দে মঠমাত্রকেই বুঝাইত।

জবন (গ)—জন্ম হইতে তৃতীয় দশকে হস্তীর নাম।

জাঙ্গল (উ)—উষর ভূমি।

জাতি (স)—ইহার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এইরূপঃ—

(১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর প্রভৃতি উপাদান নিয়া যে-স্বর-

সম্ভার প্রকাশিত হয়, তাহার নাম জাতি।

(২) যে স্বর সন্দর্ভের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের, স্বরগঠনের বা রাগরূপের প্রকৃত রসপ্রতীতি হয় তাহাকে জাতি বলে।

(৩) গান্ধর্ব ও দেশী রাগগুলি যে মূল রাগ হইতে জন্মলাভ করে, তাহাকে জাতি বলে।

টঙ্ক (শৈ্য)—একপ্রকার ওজন (১ টঙ্ক=৪ মাষ)

টি (ব্যা)—অচোঽন্ত্যাদি টি (পা ১।১।৬৪) পদের অন্ত, স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট অংশ।

তাজিক (অ)—যে অশ্বের গ্রীবা দীর্ঘ, কর্ণ হ্রস্ব এবং যে মহাবেগ, মহাকায় ও নির্ভয় তাহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

তাল (স)—গীতের পরিমাণ-নির্ণায়ক কাল বা সময়। কোহলের মতে, ত-কার শিবকে ও ল-কার শক্তিকে বুঝায়। সুতরাং, শিব-শক্তির সংযোগের নামই তাল। 'আবাপ', 'নিষ্ক্রাম' প্রভৃতি ভেদে তাল বহুবিধ।

দান (গ)—হস্তিদেহ হইতে নির্গত এক প্রকার তরলপদার্থ (ঘর্ম নহে)। Ichor বা মদবারি।

দেশী (স)—বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত।

দ্রাবিড় (বা)—স্থাপত্যশিল্পের যে রূপ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ছিল, তাহার নাম।

দ্রোণ (কৃ)—এক শ্রেণীর মেঘ।

ধীরপ্রশান্ত (না)—নাটকের নায়ক বিশেষ। নায়কের সাধারণ গুণ-সম্পন্ন দ্বিজাদি।

ধীরললিত (না)—নাটকের একপ্রকার নায়ক। ইনি কোমলস্বভাব ও নৃত্যগীতাসক্ত রাজা; ইনি মন্ত্রীর উপর কার্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

ধীরোদাত্ত না)—নাটকের আত্মশ্লাঘা-হীন, ক্ষমাগুণসম্পন্ন, স্থির-প্রকৃতি, দৃঢ়চিত্ত, গম্ভীর ও নিগূঢ়মান নায়ক।

ধীরোদ্ধত (না)—নাটকের একপ্রকার নায়ক; ইনি প্রতারক, উগ্র-স্বভাব, চঞ্চল, গর্বিত ও আত্ম-শ্লাঘাপরায়ণ।

ধ্রুবা (স)—একপ্রকার গীত। উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ইহা প্রধানতঃ ত্রিবিধ। ভরতের মতে, ইহা পঞ্চবিধ—প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রম, প্রাসাদিক ও আন্তর।

নদী (ব্যা)—যূস্ত্র্যাখ্যৌ নদী (পাণিনি ১।৪।৩)। ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গপদ। এই জাতীয় যে সকল পদের অন্ত্য-স্বর ইয়্ বা উব্ হয়, উহারা কিন্তু নদী-সংজ্ঞক নহে। আবার, 'স্ত্রী'র অন্ত্যস্বার যদিও ইয়্ হয় তথাপি ইহা নদী-সংজ্ঞক শব্দ।

নল (কৃ)—একপ্রকার বৃক্ষ। শস্যের মঙ্গলার্থে ইহাকে ক্ষেত্রপার্শ্বে রোপণ করিবার বিধি আছে।

নাগর (বা)—উত্তরভারতে প্রচলিত স্থাপত্য শিল্পের নাম।

নাট্য (স)—নৃত্য দ্রষ্টব্য।

নাদ (স)—দামোদরের মতে, ন-কার প্রাণকে ও দ-কার অনলকে বুঝায়। সুতরাং, নাদ প্রাণ ও অনলের সাহায্যে উৎপন্ন। ইহা গানে প্রধান ব্যাপার।

নান্দী (না)—(নাট্যবস্তুর আরম্ভের পূর্বে) যাহাদ্বারা (নটনটীর বা সামাজিকবর্গের প্রতি) আশীর্বাদ সহ দেব, দ্বিজ, ও রাজাদির স্তুতি করা হয় তাহার নাম নান্দী।

নিপাত (ব্যা)—চাদয়োহসত্ত্বে (পাণিনি ১।৪।৫৭)। অদ্রব্যবাচক 'চ' প্রভৃতিকে নিপাত বলা হয়। পূর্বনিপাত, পরনিপাত প্রভৃতি স্থলে 'নিপাত'-এর অর্থ শব্দের স্থান।

নিরালম্বা (অ)—অশ্বের গতিবিশেষ। তাড়িত হইলে অশ্ব এই গতিতে চলে।

নির্যাণ (গ)—হস্তিচক্ষুর বহিঃকোণ।

নির্বাণ (গ)—হস্তীর স্নান।

নিষ্ঠা (ব্যা)—ক্ত এবং ক্তবতু—এই দুইটি কৃৎপ্রত্যয়ের নাম।

নৃত্য, নৃত্ত, নাট্য (স)—ধনঞ্জয়ের মতে, নৃত্য ভাবাশ্রয়, নৃত্ত তাল লয়াশ্রয় এবং অবস্থাবিশেষের অনুকরণের নাম নাট্য।

নৈকারিক (গ)—জন্ম হইতে ষষ্ঠ বর্ষে হস্তীর নাম।

ন্যাস (স)—যে স্বরে গানের বা রাগের পরিসমাপ্তি হয়, তাহার নাম।

পদ (ব্যা)—সুপ্তিঙন্তং পদম্ (পাণিনি ১।৪।১৪)। সুবন্ত-প্রাতিপদিক ও তিঙন্ত ধাতুকে পদ বলা হয়।

পাকল (গ)—হস্তীর জ্বর।

পীঠমর্দ (না)—নাটকে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক প্রাসঙ্গিক বৃত্তে (episode) নায়কের সহায়কে এই নামে অভিহিত করা হয়। পীঠমর্দ নায়ক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণহীন এবং শৃঙ্গারেতর রসে নায়কের সহায়। কোন কোন নাট্যগ্রন্থে নায়িকারও পীঠমর্দিকা দেখা যায়।

পুচ্ছক (গ)—জন্মের দ্বিতীয় বর্ষে হস্তীকে এই আখ্যা দেওয়া হয়।

পুণ্ড্র (অ)—অশ্বের নাসিকার উপরে, কিন্তু কর্ণের নিম্নভাগে, যে সাদা চিহ্ন থাকে তাহার নাম।

পুষ্কর (কৃ)—একপ্রকার মেঘ।

পুষ্প (অ)—অশ্বদেহে কতক চিহ্ন কিছুদিন পর্যন্ত থাকিয়া বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ চিহ্নকে বলা হয় পুষ্প।

পুষ্যযাত্রা (কৃ)—পৌষমাসে ধান্যচ্ছেদের পূর্বে এই অনুষ্ঠান বিধেয়।

পূর্ণকণ্ঠী (অ)—অশ্বের গতি-বিশেষ; ইহাতে ঘোড়া মুখ সোজা রাখিয়া চলে।

পেচক (গ)—গজলাঙ্গুলের মূলের চতুষ্পার্শ্ব।

পোত (গ)—জন্ম হইতে দ্বিতীয় দশকে হস্তীর নাম।

প্রতান (উ)—বিস্তারিণী লতা।

প্রবেশক (না)—ইহা একটি 'অর্থো-পক্ষেপক' (যাহাদ্বারা নাট্য-বস্তুর অংশবিশেষ সূচিত হয়)। ইহাতে অসংস্কৃত-ভাষা-ভাষী নীচপাত্র থাকে এবং ইহা দুইটি অঙ্কের অন্তর্নিবিষ্ট হয়; ইহার অবশিষ্ট লক্ষণগুলি বিষ্কম্ভকের ন্যায়।

প্রস্তাবনা (না)—নাট্যবস্তুর আরম্ভের পূর্বে যে অংশে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক সূত্রধরের সহিত স্ব স্ব কার্য সম্বন্ধে বা নাট্যবস্তু সম্পর্কে বিচিত্র কথো-পকথন করে, তাহাকে 'প্রস্তাবনা' বা 'আমুখ' বলা হয়।

প্রাজন (কৃ)—পচ্চানিকা বা প্রাজনিকা; বৃষ-তাড়নার্থ যষ্টি।

প্রাতিপদিক (ব্যা)—অর্থবদধাতুর প্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ (পাণিনি ১।২।৪৫)।

যাহার অর্থ আছে, অথচ যাহা ধাতু বা প্রত্যয় নহে তাহার নাম প্রাতিপদিক।

কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ (পাণিনি ১।২।৪৬)।

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত এবং সমাসেরও প্রাতিপাদিক সংজ্ঞা হয়।

ফাল (কৃ)—লাঙ্গলের যে লৌহময় অংশের দ্বারা ভূমিকর্ষণ হয়; ইহা অর্কপত্রসদৃশ ও এক হাত নয় (বা পাঁচ) আঙ্গুল দীর্ঘ।

বনস্পতি (উ)—যে গাছে ফুল না হইয়া ফল হয়।

বর্বর (গ)—জন্মের চতুর্থ বর্ষে হস্তীর নাম।

বল্লী (উ)—যে লতা বৃক্ষ বা অপর কোন আশ্রয়কে বেষ্টন করিয়া থাকে।

বহুল (ব্যা)—কোন প্রক্রিয়া কোন কোন স্থানে হওয়া, কোথাও না হওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিকল্পে ও অন্যরূপ হওয়া—এই চারিপ্রকার অবস্থা বুঝাইতে এই শব্দটির ব্যবহার হইয়া থাকে।

বাদী (স)—যে স্বর রাগের স্বরূপকে বিকশিত করে তাহার নাম।

বাদ্য (স)—ভরতের মতে, বাদ্য চতুর্বিধ—তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির।

বারীকর্ম (গ)—হস্তী ধরিবার প্রণালীবিশেষ।

বিক্ক (গ)—জন্মের দশম বর্ষে হস্তীর নাম।

বিক্রমা (অ)—অশ্বের একপ্রকার গতি।

বিদু (গ)—হস্তীর মস্তকোপরি উন্নত অংশদ্বয়ের মধ্যবর্তী গভীর স্থান।

বিদূষক (না)—শৃঙ্গারঘটিত ব্যাপারে

নায়কের সহায়ক। ইনি কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গী ও ভাষাদ্বারা হাস্যোদ্রেক করেন।

বিবাদী (স)—যে স্বর রাগের সৌন্দর্যহানি ঘটায়।

বিমান (বা)—একপ্রকার ইষ্টকনির্মিত গৃহ।

বিষ্কম্ভক (না)—নাটকের অঙ্কের আদিতে সন্নিবিষ্ট অর্থোপ-ক্ষেপকবিশেষ (প্রবেশক দ্রষ্টব্য।) ইহা অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেয়।

বৃদ্ধি (ব্য)—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (পাণিনি ১।১।১)। অ স্থানে আ, ই ঈ ও এ স্থানে ঐ, উ ঊ এবং ও স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর্ এবং ঌ স্থানে আল্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

বেসর (বা)—স্থাপত্যশিল্পের প্রকার-ভেদ। কোন কোন মতে, উড়িষ্যার স্থাপত্য এই নামে অভিহিত হইত। আবার, কাহারও কাহারও মতে, 'আন্ধ্র' ও 'কলিঙ্গ' ভেদে ইহার দুইটি রূপ ছিল।

ভদ্র (গ)—হস্তীর প্রকারভেদ।

ভরতবাক্য (না)—নাট্যগ্রন্থের সর্ব-শেষে লিখিত এবং সম্ভবতঃ অভিনয়ের সমাপ্তি-সূচক বাক্য হিসাবে রঙ্গমঞ্চে 'ভরত' বা নট-গণকর্তৃক পঠিত। কেহ কেহ নাট্যশাস্ত্র-প্রবর্তক ভরতমুনির নামের সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহাকে ভরতবাক্য বলে। ইহাতে থাকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা অথবা সামাজিকবর্গের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী।

ভূগৃহ (বা)—মাটির তলার ঘর।

মজ্জন (গ)—জন্মের অষ্টম 'বর্ষে' হস্তীর নাম।

মদিকা বা ময়িকা (কৃ)—মই।

মার্গ (স)—সাধারণ অর্থে classical music। দামোদরের মতে, তাহাই মার্গ সঙ্গীত যাহাকে ব্রহ্মা অন্বেষণ করিয়া পাইয়া-ছিলেন (মৃগ্—অন্বেষণ করা) এবং যাহা ভরতমুনি মহাদেবের সমক্ষে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

মুষ্টিমোক (শ্যৈ)—শ্যেনপাতা মৃগয়ায় শ্যেনকে লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিবার একটি প্রণালী।

মূর্ছনা (স)—যাহাতে সাতটি স্বর থাকে তাহার নাম মূর্ছনা। ইহা স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ হইতে উদ্ভূত.

মৃগ (গ)—হস্তীর প্রকারভেদ।

মেধি (কৃ)—ন্যগ্রোধ, সপ্তপর্ণ বা অপর কোন 'ক্ষীরবান্' বৃক্ষ-দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ বা খুঁটি। প্রচুর পরিমাণে শস্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রমধ্যে মেধিরোপণ বিধেয়।

যাবশী (শ্যৈ)—ক্ষেত্রে শস্যের কম্পনাদি লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত পশুর মৃগয়া।

যুগ (কৃ)—লাঙ্গলের যে অংশে বৃষ বাঁধা থাকে; জোয়াল (yoke)।

যোগবিভাগ (ব্যা)—একটি সূত্রের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ অংশটুকুকে একটি পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ।

যোত্র (কৃ)—যে রজ্জুদ্বারা বৃষকে যুগের সহিত বাঁধা হয়।

যোধ (গ)—জন্ম হইতে পঞ্চম দশকে হস্তীর নাম।

রাগ, রাগিণী (স)—যাহা শ্রোতৃচিত্তের রঞ্জন করে তাহাই রাগ। মতঙ্গের মতে, রক্তি বা আনন্দ জনক স্বরসমূহের নাম রাগ। দামোদরের মতে, 'স্বরবর্ণ-বিভূষিত ধ্বনিবিশেষ'কে রাগ বলা হয়। সাধারণতঃ ছয়টি রাগের কথা বলা হয়। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের নানাগ্রন্থে ছয়টির অধিক নানা রাগের উল্লেখ আছে। ছয় রাগের নামকরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রত্যেক রাগের কয়েকটি রাগিণী কল্পিত হইয়াছে। রাগিণীর নামকরণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

লয় (স)—কাল বা সময়ের অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানের সমতার নাম। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে লয় ত্রিবিধ।

শিশু (গ)—জন্মের সপ্তম বর্ষে হস্তীর নাম।

শ্রুতি (স)—প্রতিধ্বনিহীন স্বররূপে শ্রুত নাদকে শ্রুতি বলা হয়। ভরত দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন।

ষাড়ব (স)—ছয়টি স্বরের দ্বারা রাগ এই নাম প্রাপ্ত হয়।

সংপ্রসারণ (ব্যা)—ইক্ যণঃ সংপ্রসারণম্ (পা ১।১।৪৫)
য, ব, র ও ল স্থলে যথাক্রমে ই, উ, ঋ ও ৯ হওয়ার নাম।

সংবর্ত (কৃ)—একপ্রকার মেঘ।

সংবাদী (স)—বাদী স্বরের দ্বারা বিকশিতরূপ রাগের পরিপোষক স্বর।

সংহিতা (ব্যা)—পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পা ১।৪।১০৯)
দুই বর্ণের চরম নৈকট্য বা মিলনকে সংহিতা বলা হয়। সংহিতাই সন্ধি নামে খ্যাত।

সবর্ণ (ব্যা)—তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (পা ১।১।৯)
যে সকল বর্ণের উচ্চারণের স্থান ও প্রযত্ন (effort) সমান, উহারা সবর্ণ। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন-বর্ণের সবর্ণ হয় না।

সর্বনামস্থান (ব্যা)—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ক্ষেত্রে সু, ঔ, জস্, অম্, ঔ—এই পাঁচটিকে সর্বনামস্থান বলা হয়। ক্লীব-লিঙ্গ শব্দের স্থলে জস্ ও শস্--এর এই নাম হয়।

সান্নাহ্য (গ)—যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তী।

সূত্রধার (না)—ইনি অনেক পরিমাণে আধুনিক কালের 'মঞ্চাধ্যক্ষ' বা Stage-manager-এর ন্যায়। ইনি নৃত্য, গীত ও বাদ্যে অভিজ্ঞ এবং নাট্যপ্রয়োগে অতিশয় নিপুণ।

সেরাহ (অ)—দুগ্ধবর্ণ অশ্বের নাম।

স্বর (স)—যাহা শ্রুতির অব্যবহিত পরে উৎপন্ন হয় এবং যাহার প্রতিধ্বনি আছে, যাহা স্নিগ্ধ ও আনন্দপ্রদ তাহাই স্বর।

হলপ্রসারণ (কৃ)—যথাকালে ক্ষেত্রে হলচালনা করিবার পূর্বে এই অনুষ্ঠান বিধেয়।

হস্তামোক (শ্যৈ)—শ্যেনপাতা মৃগয়ায় শ্যেনকে লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিবার প্রণালীবিশেষ।

হেতু (ব্যা)—কোন কার্যের কারণ বা উদ্দেশ্য। ইহার সহিত ক্রিয়ার কোন যোগ থাকে না। তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ (পাণিনি ১।৪।৫৪)—এই সূত্রে প্রযোজক কর্তা অর্থাৎ ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তাকে 'হেতু' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী

ব্যাকরণ

Belvalkar : Systems of Sanskrit Grammar.

Classical Age (History and Culture of the Indian People), Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1954.

Keith : History of Sanskrit Literature.

New Indian Antiquary, II, p.p. 108-110.

গুরুপদ হালদার ঃ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস।

পতঞ্জলি ঃ মহাভাষ্য (পস্পশা)।

পাণিনি ঃ অষ্টাধ্যায়ী।

নাট্যশাস্ত্র

ধনঞ্জয় ঃ দশরূপক।

ভরত ঃ নাট্যশাস্ত্র।

বিশ্বনাথ ঃ সাহিত্যদর্পণ।

Keith : Sanskrit Drama.

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

কালীপদ বিশ্বাস

ও

এককড়ি ঘোষ: ভারতীয় বনৌষধি, ১ম ও ২য় খণ্ড।

গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ঃ প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা।

নিরজা সেনগুপ্ত ঃ বনৌষধিদর্পণ (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯০৮।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা।

Mapumdar, G. P. : Upavana-vinoda, Calcutta.

" " : Vanaspati, Calcutta.

" " : Aspects of Indian Civilisation etc., Calcutta.

" " : Vedic Plants, B. C. Law Vol., Pt. I, Calcutta.

" " : Botany in India—Past and Present (Cultural Heritage of India, Vol. III).

Seal, B. N. : The Positive Sciences of the ancient Hindus, Varanasi, 1958.

কৃষিশাস্ত্র

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (সীতাধ্যক্ষ)।

Aiyar: Agriculture and allied arts in Vedic India.

Majumdar, G. P. & Banerji, S. C.: Krsi-Paraśara, Asiatic Society, Calcutta.

Roy, J. C.: Ancient Indian Life, Calcutta, 1948.

Roy Chaudhuri, S. P.: Agricultural Practices in Ancient India, I. C. A. R., New Delhi, Review Series, No. 4.

বাস্তুবিদ্যা

Acharya, P. K.: Hindu Architecture in India and Abroad, Manasara Series, Vol. VI.

Bhattacherji, T. P.: A Study on Vastu-vidya,

গজশাস্ত্র

নীলকণ্ঠ: মাতঙ্গলীলা, সং গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম্, ১৯১০।

[Keith-এর মতে, এই গ্রন্থের রচয়িতা নারায়ণ—দ্রঃ History of Sanskrit Literature, p. 465. এই গ্রন্থের জার্মাণ অনুবাদ করিয়াছেন Zimmer, (Berlin, 1929) ও ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন Edgerton, (Yale, 1931.)]

পালকাপ্য: হস্ত্যায়ুর্বেদ, আনন্দাশ্রম, পুনা, ১৮৯৪।

[তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরীতে ১২২৯৫ সংখ্যক পুঁথি গজশাস্ত্র সম্বন্ধে রচিত; গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম তালিকায় লিখিত নাই।]

অশ্বশাস্ত্র

অশ্বশাস্ত্র (নকুলকৃত), সং গোপালন্, সরস্বতী মহল লাইব্রেরী, তাঞ্জোর, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ।

অশ্ববৈদ্যক (জয়দত্তকৃত), বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্যৈনিকশাস্ত্র

শ্যৈনিকশাস্ত্র (রুদ্রদেবকৃত): সং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ইংরাজী অনুবাদসহ), এসিয়াটিক্ সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯১০।

কামশাস্ত্র

কামসূত্র (বাৎস্যায়ন-কৃত)

De, S. K.: Ancient Indian Erotics and Erotic Literature, Calcutta, 1959.

Meyer, J. J.: Sexual Life in Ancient India, Calcutta, 1952.

সঙ্গীতশাস্ত্র

(ক) মূলগ্রন্থ

অহোবল—সঙ্গীতপারিজাত, সং কালীবর বেদান্তবাগীশ, কলিকাতা, ১৯৩৬।
দত্তিলম্—সং শাম্বশিব শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম্ ১৯৩০।
নারদ—সঙ্গীতমকরন্দ, সং আর্. কে. তেলাঙ্গ্, বরোদা, ১৯২০।
পার্শ্বদেব—সঙ্গীতসময়সার, ত্রিবান্দ্রম্, ১৯২৫।
ভরত—নাট্যশাস্ত্র।
মতঙ্গ—বৃহদ্দেশী, সং শাম্বশিব শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম্, ১৯২৮।
শার্ঙ্গদেব—সঙ্গীতরত্নাকর, মাদ্রাজ ও পুনা সংস্করণ।
সোমনাথ পণ্ডিত—রাগবিবোধ, সং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মাদ্রাজ, ১৯৪৫।
স্বরমেলকলানিধি—অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২।

(খ) আধুনিক গ্রন্থ

বাংলা

অমিয় সান্যাল—প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।
প্রমথ চৌধুরী
ও
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—হিন্দুসংগীত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সঙ্গীত ও সংস্কৃতি।

ইংরাজী

Clements, E.: Introduction to the study of Indian Music, London, 1913.
Ganguli, O. C.: Ragas and Raginis, Baroda, 1948.
Garratt, G. T.: The Legacy of India, Oxford, 1938.
Pingle, B. A.: Indian Music, 1938.
Popley, H. A.: The Music of India, Calcutta, 1921.
Raja, C. K.: Sangita ratnakara, (Eng. tr.), Madras, 1945.
Rosenthal, E.: The Story of Indian Music, and its instruments, London, 1928.
Simon, R.: The Musical compositions of Somanatha, Leipzig, 1904.
Tagore S. N.: Six Principal Ragas of the Hindus, Calcutta, 1877.

(গ) প্রবন্ধ

Coomaraswamy, A. K.: Dipaka-raga. (Year Book of Oriental Art and Culture, London, 1925.
Ganguli, O. C.: (1) Non-Aryan contribution to Aryan Music, ABORI,
(2) Dhruva—a type of old Indian Stage-songs, Journal of Music Academy, Madras.

পত্রসাহিত্য

দলপতি: মাবনপরিপাটী অনুক্রম।
বররুচি: পত্রকৌমুদী, সং সুরেশ ব্যানার্জি, Bulletin of Deccan College Research Institute (S. K. De Presentation No.) Poona.

সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান

Chaudhuri, J. B.: (1) Sanskrit Poetesses, Calcutta, 1939.
(2) Dvaraka-pattala and Gangavakyavati, Calcutta. 1940.

Macnicol, M.: Poems by India Women.

সুশীলকুমার দে: নানানিবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৫৪।

সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধগণের দান

Ratnakirti-nibandhavali-ed. A. Thakur, Patna, 1957.

Winternitz, M.: History of Indian Literature, Vol. II.

মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য

Chaudhuri, J. B.: Muslim patronage to Sanskritic learning, Calcutta, 1945.
[Introducing India নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (Calcutta, 1949) Muslim Patronage ইত্যাদি শীর্ষক উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

বহির্ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তার ও প্রভাব

Bagchi, P. C.: India and China, Bombay, 1950.

Basham: The Wonder that was India.

Chatterji, B. R. & Chakravarti,
N. P.: India and Java, Pts. I, II, Calcutta, 1933.

Gonda, J.: Sanskrit in Indonesia, Nagpur, 1952.

Majumdar, R.C.: (1) Hindu Colonies in the Far East, Calcutta, 1944.
(2) Ancient Indian Colonies in the Far East, Vols. I, II.

Motwani, K.: Manu Dharmas'astra.

Journal of Oriental Research, Madras, 1956 (September), 1957 (August)
(চি-সিয়েন্‌লিন্‌ এর প্রবন্ধ Indian Literature in China.)
ঐ (H. Kimura-র প্রবন্ধ Sanskrit Studies in Japan.)

ভারত ও মধ্য এশিয়া—প্রবোধ বাগচী।

সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার ধারা

Dandekar, R. N.: Progress of Indic Studies.

Pusalkar, A. D.: Studies in Epics and Puranas of India, Bombay.

নির্ঘণ্ট

[যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সে সকল বিষয় সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে; উহাদের নাম এখানে দেওয়া হইল না। পাদটীকা তারকা-চিহ্নের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।]

গ্রন্থ

গ্রন্থকার